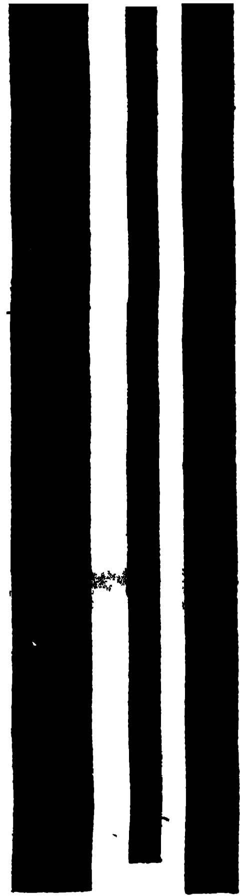
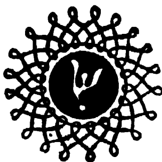


শেষ তিন দিন

মিহির সেন



নবপত্র প্রকাশন । ৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩২২

প্রকাশক । প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৯

মুদ্রক । যশোদা সাহা
নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ
সুবোধ দাশগুপ্ত

ছয় টাকা

মনিয়াদিকে—

SESH TIN DIN
BY MIHIR SEN

To abolish war is, of course, a very difficult problem........... I simply feel that this is a problem that man has got to solve ; otherwise man will drop out and the planet will perhaps be happier without us.

Bertrand Russell

এই লেখকের

উপন্যাস :

আলোক লগ্ন

কাগজের দেওয়াল

গল্পগ্রন্থ :

আরো একজন

নাটক :

প্রবেশ নিষেধ

কথামুখ

কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হল,
ঝকঝক করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারি তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামেব ছাপ
তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় দিয়ে।
খ্রীস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন ,
বুঝলেন শেষ হয় নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায,
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদির সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে,
বলছে 'মারো মারো।'
মানবপুত্র যন্ত্রণায বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে,
'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।

—রবীন্দ্রনাথ
(মানবপুত্র)



প্লেন ছাড়ার ঘণ্টা দুয়েক আগেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল গোপাল। বাড়ি এখান থেকে বিশ মিনিটের পথ, তবু একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছে। মুমূর্ষু সময়ে এসে দৌড় ঝাঁপ করার চেয়ে একটু হাতে সময় নিয়ে আসাই ভাল। বাঙ্গালীদের যে কটা চরিত্রদোষ পছন্দ করেনা গোপাল লেট-লতিফপনা তার ভেতর একটি। ইতু অবশ্য ঠাট্টা করেছিল, রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো? কিন্তু গায়ে মাখেনি ও। যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছে তার গুরুত্ব বই-পোকা কূপমণ্ডুক মেয়েটা বুঝবে কি করে! বাবা শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, টিকিটের দামটা ওরাই দিচ্ছে তো? এসব ইংগিতে বাবার ওপর আগে রাগ হত গোপালের, এখন শুধু অনুকম্পা বোধ করে।

দামী সিগারেটের একটা টিন কিনে নিল। চার্মিনারটা কি করে যেন ইন্টেলেকচ্যুয়াল ছাপ পেয়ে গিয়েছে কলকাতায়। কিন্তু ওখানে ওর সামাজিক মূল্য কতটা কে জানে। তাছাড়া যে মহলে গিয়ে মিশতে হবে, ডাঁট দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে, সেখানে অত সস্তা ধূম্রজাল সৃষ্টিতে কাজ হবে কিনা তাও জানা নেই।

সিগারেট ধরিয়ে পোর্টফোলিও থেকে একটা ইংরাজী বই বের করে বেশ গম্ভীর হয়ে বসে গোপাল। সমস্ত চেহারায় চরম গাম্ভীর্য এবং পরম নির্লিপ্তি জড়িয়ে নিয়ে বসে। কেউ যেন দেখে বুঝতে

না পারে গোপাল এই প্রথম উড়ছে। এর আগে যতবার এসেছে হয় কোন উড়ে আসা আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবকে রিসিভ্ করতে, নয়তো পত্রিকার তরফ থেকে সংবাদ সংগ্রহে। একটু যে উত্তেজনা বোধ না করছিল তা নয়। কিন্তু আরো বড় একটা উত্তেজনা কাল থেকেই ওকে নাস্তানাবুদ করে রাখায় এ অস্বস্তিটা ঠিক সে রকম টের পাচ্ছিল না।

ওর সাংবাদিক জীবনের একটা রক্তাক্ষর তারিখ আজ। কাগজ থেকে এই প্রথম একটা স্কুপ্ নিউজ্ প্রসঙ্গে বাইরে পাঠান হচ্ছে ওকে। সংবাদটা গুছিয়ে সংগ্রহ কবে আনতে পারলে আর পায় কে। বন্ধুরা ঠাট্টা করে স্কোয়ার জার্নালিস্ট বলে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার আর ডালহৌসী স্কোয়ারেব মিটিংগুলো পর্যন্তই নাকি ওর দৌড়। কিন্তু সুযোগ পেলে দৌড় যে কতদূর পর্যন্ত হতে পারে এবার সেটা প্রমাণ করবে গোপাল।

কি স্যার, এত সকালে? কোন ভি-আই-পি আসছে নাকি?

বইটা বন্ধ করে চোখ তুলে তাকায় গোপাল। অন্য কাগজের পরিচিত এক রিপোর্টার।

পরম নির্লিপ্তি নিয়ে বলে গোপাল, না, কাগজের তরফ থেকে বাইরে যেতে হচ্ছে একটা জরুরী কাজ নিয়ে। আপনি?

স্রেফ্ পায়জামা ও ঘাড় ফাটা পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক গোপালের পাশে বসে পড়লেন। নির্লিপ্তভাবে বিড়িব ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, মামাকে তুলে দিতে এসেছি।

এত কষ্টার্জিত এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিমণ্ডলটাকে ভদ্রলোক এভাবে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ায় গোপাল মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে। আবো ভয়, বিপক্ষ কাগজের ঘাগু সাংবাদিক বলে। ওদের কুকুরের নাক। কোনক্রমে কথায় কথায় গোপন সম্ভাব্য সংবাদটার গন্ধ পেলে হয়তো এই পোশাকেই প্লেনে চেপে বসবেন। অথবা, বিচিত্র নয়, এখানে বসেই সে সংবাদ তৈরী করে কালকের কাগজে ছেপে দিয়ে গোপালকে বেকুব বানিয়ে দেবেন।

গোপালের সৌভাগ্য, ভদ্রলোক মুখ খুলবার আগেই লাউডস্পীকার তার মুখ খুলল। এবং প্রস্তুত প্লেনের যাত্রীদের আহ্বান জানাল। গোপাল উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে নমস্কার করে দৃপ্ত পদক্ষেপে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডের দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু প্লেনে উঠতে উঠতে গোপালের কৌতুকপ্রবণ মনে চকিতের জন্য একবার একটা হালকা চিন্তা খেলে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত উদীয়মান সাংবাদিক গোপাল গুপ্তর একটা পূর্ণ জীবনী বাড়িতে লিখে রেখে আসতে পারলে মন্দ হত না। যা দিনকাল পড়েছে তাতে অনেক সময় একমাত্র ওঠাটাই পাইলটদের নিজেদের হাতে থাকে ; নামাটা নয়। এবং সংবাদ ওঠা না-ওঠার পুরো ভার নিউজ এডিটারের হাতে, যিনি আদৌ গোপালের হাতের নন।

যাত্রীরা যার যার আসনে বসেন। গোপাল বসে জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকায়। বিদায় দিতে আসা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবরা হাত নাড়ছে। গোপাল এর আগে মাঝে মাঝে যেখানে দাঁড়িয়ে যে ভাবে হাত নাড়ত।

হঠাৎ সামান্য শব্দে কক্‌পিটের দিকে ফিরে তাকায় গোপাল। ছোট্ট একটা ধাক্কা খায় যেন পাইলটের দিকে তাকিয়ে। শিলান লম্বা চওড়া চেহারা। সমস্ত দেহে একটা রুক্ষতার ছাপ। মুখের রেখায় চাপা বিরক্তি ও রূঢ়তার ছোপ। কপালের কোণ থেকে একটা কাটা দাগ গালের মাঝ বরাবর নেমে এসে বেপরোয়া করে তুলেছে গোটা চেহারাকে। গোপাল ভেবে পেল না, বোম্বের ছবিতে ভিলেনের রোল নিচ্ছে না কোন লোকটি। ওখানে ডাইরেক্টর নেই এমন ছবিও কল্পনা করা যায়, কিন্তু ভিলেনহীন ছবি অকল্পনীয়।

মেয়েলি কণ্ঠের মিষ্টি ঝঙ্কারে ঘুরে তাকায় গোপাল। পাশের সিটের সহযাত্রীনীর সঙ্গে কথা বলছে এয়ার হোস্টেস। এতক্ষণ কৌতুহল থাকলেও সঙ্কোচে ভাল করে লক্ষ্য করতে পারেনি, এবার আড়-চোখে ভাল করে দেখে নিল একবার সহযাত্রীনীকে। কালোর ভেতর

ভারী মিষ্টি চেহারাটি। দারুণ ফর্সার চেয়ে মিষ্টি কালো মেয়েই ভাল লাগে গোপালের। অবাঙ্গালী বোধ হয়।

সামান্য ঝাঁকি দিয়ে প্লেনটা নড়ে উঠল। প্রস্তুতি-পব শেষ। এবার যাত্রা শুরু। বেশ কিছুটা দৌড়ে গেল প্লেনটা। তারপর, যেন মাটিকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে শূন্যে উঠে গেল। আন্দাজেই বোঝে গোপাল চাকাগুলো পেটের ভেতর গুটিয়ে নিয়েছে যন্ত্রবিহঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক গোপালের মনে পড়ে, কিছুদিন আগে নামার সময় এ চাকা পেট থেকে না নামায় একটা বড় রকমের হুর্ঘটনা ঘটেছিল এখানে। নিজেদের সাংবাদিক মারা গেলে কাগজের কোন্ পৃষ্ঠায় সংবাদ দেয় কে জানে। বিজ্ঞাপনের ভিড় থাকলে হাপুর বাজারের নিচে পড়াও বিচিত্র নয়। একটা ভাল ফটো নেই গোপালের। একক ফটো। একটা মাত্র ভাল গ্রুপ্ ফটো আছে। দিদিমার মৃত্যুর পর কেওড়াতলায় তোলা। তাও হুঃখের অভিব্যক্তি দিয়ে তোলা।

প্লেনটা অনেক ওপরে উঠে গেছে। নিচের পরিচিত কলকাতা ক্রমেই খেলনা হয়ে আসছে। বেশ লাগছে। নতুন অভিজ্ঞতা।

শহর চোখের আড়ালে চলে গেল। এবার শুধু সবুজের বিস্তার। এলোমেলো হালকা ভারী কিছু সবুজ রং বুলানো একটা ক্যানভাস যেন। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে গোপাল। সহযাত্রীদের ওপর আলতো চোখ বুলিয়ে নেয়। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন বয়সের যাত্রী। কিন্তু আপাত গাম্ভীর্যে সবার মুখের চেহারাই এক। মাঝে মাঝে উঁচু মহলের এই সাজান সিরিয়াসনেস্ দেখে হাসি পায় ওর। আচমকা ছেলে মানুষের মত চীৎকার করে উঠে এই সাজান নৈঃস্তব্ধ ভেঙ্গে দিলে এদের মুখের চেহারা কেমন হয় দেখতে ইচ্ছে করে।

সামনের ভদ্রলোক হাতের দৈনিক পত্রিকাটা খুললেন। চার কলম ব্যাপী প্রথম সংবাদটির শিরোনামায় চোখ পড়ে গোপালের। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ভারতেও পরমাণু অস্ত্র নির্মানের দাবী। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কংগ্রেসী নেতার জোরালো বক্তৃতা।

সংবাদটির গা ঘেঁষেই চৈনিক আনবিক বোমা বিস্ফোরণের বিরাটাকৃতি ছবি। ব্যাঙের ছত্রাকৃতি কুণ্ডলীকৃত মেঘপুঞ্জ।

গোপালের মনে পড়ে, কিছুদিন আগে খ্রীষ্টমাস দ্বীপে আমেরিকা যে বোমাটা পরীক্ষা করেছিল তার ধাক্কায় কলকাতার বৃষ্টিতেও তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত! গোপাল কপালে আঙ্গুল বুলিয়ে মনে করার চেষ্টা করে, এতে মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক কি কি আইসোটোপ থাকে যেন? ষ্ট্রনশিয়াম-৯০, আইয়োডিন-১৩১, আর···আর···?

পোর্টফোলিও থেকে বইটা বের করে গোপাল। কিছুতেই শেষ করতে পারছেনা বইটা। অথচ নিজের প্রয়োজনেই, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, বইটা শেষ করা দরকার।

সিটে ভাল করে হেলান দিয়ে বসে বইটা খোলে গোপাল। এবং কিছুক্ষণের ভেতরই বইয়ের পাতায় ডুবে যায়। কালো কালো অক্ষরগুলো শুধু ছোট ছোট বিভীষিকার মত মাঝে মাঝে চমকে দিতে থাকে ওকে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পড়ার পরই বই থেকে চোখ তুলতে হল। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে। কাল অত ভোরে না উঠলেই হত। ভোর কোথায়, প্রায় তো শেষ রাত। রাত্রে ভাল ঘুমও হয়নি। ইতুও কি পড়ছে এখন? সিটে ভাল করে এলিয়ে বসে ও।

বাইরে মেঘ। শুধু মেঘ। ওপরে জ্বলন্ত সূর্য। একটানা একটা একঘেঁয়ে যান্ত্রিক শব্দ। সম্মোহনী শব্দ।

সত্যিই কি মাত্র আঠার লাখ টাকায় একটা এটম্ বোমা বানান যায়? তাহলে হয়তো বড় বড় ব্যবসায়ীরা একদিন প্রাইভেট-কার বা প্লেনের মত প্রাইভেট এটম্ বোমাও তৈরী কবে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে শুরু করবে। অবশ্য শাস্ত্রীজীর হিসেবে একটি এটম্ বোমের খরচ পড়বে চল্লিশ পঞ্চাশ কোটি টাকা। কার হিসেব ঠিক? ভাবা না শাস্ত্রীজীর? শাস্ত্রীজীর দৃঢ় মত ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামা চলবে না। চারদিকের চাপ এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত এই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারবে কি?

মেঘ থেকে বেরিয়ে এল প্লেনটা। চার পাশে উজ্জ্বল রোদ। কিন্তু সামনেই আর একটা বিরাট মেঘ। ওদের বরণ করবার জন্যই যেন নিঃশব্দে প্রস্তুত হয়ে আছে। পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ!

পাশের সহযাত্রীনী ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? চিবুকের ওপর ছোট্ট একটা তিল প্রোফাইলটাকে যেন নতুন রূপ দিয়েছে। মিলিরও চিবুকে একটা তিল আছে।

যাত্রীগুলো কি সব মরে গেল? একটা কথা বলতে পারে না? হাসি ঠাট্টা? ক্লান্তিকর নৈস্তব্ধ। যেন সম্মোহিত একঝাঁক মানুষকে পেটে পুরে একটা বিরাট দৈত্য অজানা এক রূপকথার রহস্যের পথে উড়ে চলেছে। নৈস্তব্ধ···রূপকথা···। কি যেন, কি যেন কবিতাটা?··· সেই রবীন্দ্রনাথের?···তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথার, পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ কথার।

আবার মেঘের ভেতর ঢুকে গেল প্লেনটা। চার পাশে জমাট মেঘ। অদ্ভুত ভাল লাগছে। মন মোর মেঘের সঙ্গী!

···মা বোধহয় এখনও পূজো করছেন? আমার নিরাপদ যাত্রার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন বিগ্রহের কাছে।···ফিরে এসে ইভুর চোখটা দেখানর ব্যবস্থা করতে হবে। রাত দিন অত পড়লে কারো চোখ ভাল থাকতে পারে?·· মেঘগুলো আবার হালকা হয়ে আসছে। মেঘগুলো হঠাৎ যদি এখন প্রাচীরের মত নিশ্ছিদ্র নিরেট হয়ে ওঠে?···যক্ষপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যা!···অমলেরও চিবুকে একটা তিল আছে, কিন্তু ওর মুখে সেটা অত বেমানান লাগে কেন? ··অন্ধকার আঙ্গিনায় একরাশ ঝিঁঝি পোকা ডাকলে কেমন শব্দ হয়? ··মেঘের আঙ্গিনায় ··।

ডিয়ার ফ্রেণ্ডস্!

সবার সঙ্গে গোপালও শব্দ লক্ষ্য করে সামনের দিকে চোখ তুলে

তাকায়। এবং বিস্ময়ে চমকে ওঠে। ককপিটের সামনে সেই পাইলট ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। হাতের মুঠোয় একটা রিভলভার।

একেবারে পেছনের সিট থেকে অত্যন্ত নিরীহ নিরাসক্ত চেহারার প্রায় বৃদ্ধ একজন বিদেশী ভদ্রলোক একটা বড় বাক্স হাতে নিয়ে উঠে এলেন। এবং পাইলটের পাশ কাটিয়ে কক্‌পিটের ভেতরে চলে গেলেন। ভদ্রলোকের চোখতুটি তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত। মাথায় বড় বড় সাদা চুল।

পাইলট একবার যাত্রীদের আতঙ্কিত মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করলেন, আপনাদের কাছে বন্ধু হিসেবে একটি চরম সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করতে চাই। যে কোন সূত্রেই হোক, এই প্লেনে আমরা এমন একটি নতুন আবিষ্কৃত পারমাণবিক অস্ত্র বহন করছি যা দিয়ে মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করা যায়। আজ থেকে ঠিক তুদিন পর বেলা বারোটার সময় সেটি পৃথিবীর ওপর নিক্ষেপ করব আমরা।

থার্মোনিউক্লিয়ার বোম্! মুহূর্তের জন্য মনে পড়ে যায় গোপালের, একটি থার্মোনিউক্লিয়ার বোমেরই বিস্ফোরণ শক্তি অতীতের সমস্ত যুদ্ধে, এমন কি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সহ, ব্যবহৃত বিস্ফোরকের যোগফলের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী। তারই নতুন কোন আবিষ্কার নয়তো ?

বিমূঢ় যাত্রীদের ভেতর থেকে অস্ফুট কয়েকটা স্বর শোনা গেল এবার।

কি বলছেন আপনি ?

এর পরিণতি ভাবতে পারছেন ?

অকম্পিত ঋজু ভঙ্গীতে উত্তর আসে, হ্যাঁ। পৃথিবীর ধ্বংস। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, বর্তমান যুদ্ধোন্মাদদের মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতার শেষ অধ্যায়ে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। এবং তার প্রস্তুতি হিসেবে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য মাথাপিছু আশি টনেরও বেশী বিস্ফোরক আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্রাগারে মজুত

হয়ে গেছে। গত মহাযুদ্ধে শান্তির স্বপ্নে জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু আমরা প্রতারিত হয়েছি। শান্তি আসেনি আমাদের জীবনে। কোনদিন আসবে না। যে স্বার্থবাদীদের হাতে সেদিন আমরা অন্ধ পুতুল ছিলাম আজো তাদের হাতের খেলনা হয়ে আছে পৃথিবী ধ্বংসকারী মারণাস্ত্রগুলো। আজ হোক, কাল হোক, এদের খেলায় আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু সেই তিল তিল আতঙ্কের বিভীষিকার চেয়ে এই মৃত্যু অনেক শ্রেয়।

উত্তেজনায় একজন যাত্রী চীৎকার করে ওঠেন, আই ডাউট হি হ্যাজ গন ম্যাড্!

সৌম্য একজন বৃদ্ধ যাত্রী শান্ত স্বরে আবেদন জানালেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ, ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন আপনারা।

পাইলট শান্ত স্বরে জানালেন, এ আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত। জীবনের শেষ তিন দিন আমরা এই মুক্ত আকাশের বুকে আকাঙ্খিত শান্তির ভেতর থাকতে চাই। আপনারা দশ মিনিটের ভেতর সিদ্ধান্তে আসুন, জীবনের শেষ তিন দিন আমাদের সঙ্গে এই শান্তির আশ্রয়ে থাকতে চান, না, নেমে যেতে চান।

গোপাল ভাল করে পুরো ব্যাপারটা উপলব্ধি করার আগেই আতঙ্কিত যাত্রীদের ভেতর নেমে যাবার জন্য তাড়াহুড়া পড়ে গেল। আবেদন নিবেদন, আর্ত চীৎকার আর অসহায় কান্নায় ভরে গেল ছোট্ট যানটা। পাইলট হাত তুলে ইশারায় যাত্রীদের যার যার সিটে বসে পড়ার ইংগিত করে কক্‌পিটে ফিরে গেলেন। তারপর, প্লেন তার পথ পরিবর্তন করে আস্তে আস্তে নিচে নামতে শুরু করল। এবং নিপুণ দক্ষ হাতের চালনায় একটা এবড়ো খেবড়ো মাঠের ওপর নেমে এল প্লেনটা। পাইলট বেরিয়ে এলেন।—আপনাদের অসুবিধার জন্য দুঃখিত। শহর এখান থেকে মাইল ত্রিশেক হবে। ভগবান আপনাদের শান্তি দিন।

কিন্তু সে শান্তির ললিত বাণী শুনবার মত তখন সময় নেই কারো। রীতিমত মারামারি শুরু হয়ে গেল আগে বেরুবার জন্য। কিন্তু এত

আতঙ্কের ভেতরও গোপালের সাংবাদিকসত্তা সজাগ হয়ে উঠল। এ যুগে কোন কিছুরই শেষ কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না। সাংবাদিকের চোখে ঘটনাটা খুঁটিয়ে দেখে রাখা ভাল।

সবাই নেমে গেলে আস্তে উঠে দাঁড়ায় গোপাল। পাইলটের দিকে তাকিয়ে সাজান সাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করে, আমাদের একজন যাত্রী যে কক্‌পিটে থেকে গেলেন?

সোজা চোখ তুলে তাকান পাইলট।

উনি থাকবেন বলেই এসেছেন।

ভদ্রলোক কোন্ দেশী? বৈজ্ঞানিক?

ভুরু কুঁচকে ওঠে পাইলটের।

আপনি সাংবাদিক?

ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে গোপালের। সত্যি সংবাদে পাইলট খুশী, না, অখুশী হবেন কে জানে। জীবনে একটি দিনের চেয়ে তিন দিন বেঁচে থাকা অনেক বাঞ্ছনীয়!

আমতা আমতা করে কি যেন একবার বলবার চেষ্টা করল গোপাল। তারপর দ্রুত পায়ে নেমে গেল প্লেন থেকে।

অসমতল মাঠের ওপর টাল খেতে খেতে কিছুটা দৌড়ে প্লেনটা আবার আকাশে ডানা মেলল। পকেট থেকে দ্রুত নোট বই বের করে লিখে নিল গোপাল, সমস্ত পৃথিবীর মৃত্যুকে ঠোঁটে করে বাজপাখীর মত আকাশে উঠে গেল প্লেনটা। লিখে খুশি হল। এই ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েও ওর সাংবাদিক সত্তা সজাগ আছে বলে।

মাঠটার এদিকে ওদিকে শুধু ধান ক্ষেত। চারদিকেই একবার চোখ বুলিয়ে নেয় গোপাল। সামনে বহুদূরে একটা গ্রামের মত কিছু চোখে পড়ছে। সমস্ত যাত্রী ক্ষেত ভেঙ্গে সেই গ্রামের দিকে দৌড়াচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়ে গোপালের, সহযাত্রীনী মেয়েটি একটু দূরে বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে গোপাল সামান্য ইতঃস্তত করে ওর দিকে এগিয়ে গেল

কিছু মনে করবেন না, আপনি গেলেন না ?

অসহায়ভাবে জবাব দিল মেয়েটি, কোথায় যাব ? কাউকে চিনি না ; পথঘাট কিচ্ছু জানি না। আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

সহানুভূতি অনুভব করে গোপাল। অভয় দেবার চেষ্টা করে, এখনই এত ঘাবরাচ্ছেন কেন ? বর্তমান পাগলাটে পৃথিবীতে রোজই তো কোন না কোন নাটকীয় ঘটনা ঘটছেই। এটাও দেখবেন সে রকমই কিছু। আপত্তি না থাকলে আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

কথা বলতে বলতেই এদিক ওদিক সন্ধানী দৃষ্টি বোলাচ্ছিল গোপাল। হঠাৎ গাছপালার ভেতর দিয়ে একটা টেলিগ্রাফের তার চোখে পড়ল। অনুমান করল, ওদিকে একটা বড় রাস্তা-টাস্তা থাকতেও পারে। হারা উদ্দেশ্যে গ্রামের দিকে না গিয়ে বরং ওদিকে একবার চেষ্টা করে দেখা ভাল।

মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল গোপাল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় 'পৌছান প্রয়োজন। সংবাদটা টগবগ করে ফুটছে মাথায়। যে সংবাদ শিকারে যাচ্ছিল তার চেয়ে হাজার গুণ বড় এক গোপন সংবাদ ওর মুঠে এখন স্বেচ্ছাবন্দী। কোন রকমে কলকাতায় পৌছে সংবাদটা খালাস করে দিতে পারলে আর পায় কে। ঘড়িতে সময় দেখে নিতে নিতে বললে ও, ওদিকে একটা রাস্তা পাওয়া যেতে পারে মনে হচ্ছে, চলুন দেখা যাক।

একান্ত অনুগতের মত গোপালকে অনুসরণ করে মেয়েটি। এবং গোপালের অনুমানই ঠিক হয়। একটা কাঁচা রাস্তা পাওয়া যায়। মটর-টায়ারের দাগ থেকে বোঝা যায় লরিব যাতায়াত আছে এ পথে। কিন্তু ধারে কাছে কোন লোকজন নেই জিজ্ঞেস করার মত। তাই আন্দাজে কোন দিকে এগোতে ভরসা পেল না ও। এ ক্ষেত্রেও অনুমানটা ঠিক না হলে দ্রুত পায়ে হয়তো কলকাতার বিপরীত দিকেই এগিয়ে যাওয়া হবে।

কিছুক্ষণের ভেতরই একজন স্থানীয় লোক পাওয়া গেল। এবং রাস্তাটা কোন্ দিকে গিয়ে পিচের রাস্তায় পড়েছে তারও হদিশ পাওয়া

গেল। দ্রুত পায়ে গোপাল সেদিকে হাঁটতে শুরু করে। মেয়েটি ওর গতির সমতা রাখতে প্রায় হাঁপিয়ে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতেই গোপাল জিজ্ঞেস করে, কলকাতায় কোথায় থাকেন আপনি ?

মেয়েটি করুণ কণ্ঠে জবাব দেয়, এখানে থাকি না। একটা ইণ্টারভিউ দিতে এসেছিলাম। জীবনে এই দ্বিতীয়বার কলকাতায় এলাম।

কোথায় উঠেছিলেন ?

মামা বাড়ি। নিউ আলিপুরে। মামা এরোড্রামে নিতে এসে-ছিলেন। ইণ্টারভিউয়ের ঘোরাফেরাও মামাই সঙ্গে করে করিয়েছেন। ওপাড়াটা ছাড়া কলকাতার কিছুই ভাল করে চিনি না আমি।

এখন তো সেখানে গিয়েই উঠবেন ?

মেয়েটি মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

গোপাল সামান্য ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করে বসল, কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা ?

আস্তে উত্তর দেয় ও, কৃষ্ণা। কৃষ্ণা বড়ুয়া।

উপাধিটা শুনে সামান্য কৌতূহলে কৃষ্ণার দিকে ফিরে তাকায় গোপাল। কৃষ্ণা ওর চোখে চোখ রেখে চাপা আতঙ্কে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, সত্যিই যদি তিন দিন পর ওরা বোমা ফেলে তাহলে কি হবে ?

চিন্তাটা আবার নতুন করে ধাক্কা দেয় গোপালকে। এটা সত্যিই নতুন আবিষ্কৃত কিছু, না, মানুষকে নিছক ভয় দেখানর জন্যই বলছে ওরা কে জানে। অবশ্য এসব প্রসঙ্গে ওর নিজের জ্ঞানও আর সবার মতই সীমাবদ্ধ। শুধু এটুকু জানে যে, হিরোসিমা নাগাসাকিতে যে দ বোমা দুটি বীভৎস মারণযজ্ঞের সৃষ্টি করেছিল, ইতিমধ্যে, এই দী বছরের অস্ত্র প্রতিযোগিতার দৌলতে, তার চেয়ে পাঁচ হ শক্তিশালী বোমাও আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। তার একটি বো: বর্গ মাইলের ভেতর সব কিছুকে মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে

আরো হাজার হাজাব মাইলের বাতাসে এমন মারণজাল বিছিয়ে দিতে পারে যার সীমায় এলে যে কোন মানুষ হয় মারা যাবে নয় বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে এসব কথা বলে মেয়েটিকে আরো আতঙ্কিত করে তুলতে চাইল না ও। তাছাড়া, গোপাল নিজেও ঘটনাটাকে অতদূর এগিয়ে নিয়ে ভাবতে পারছে না। ওর কেবলই মনে হচ্ছে আর পাঁচটা ঘটনাব মতই কিছুটা রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে শেষ অঙ্কে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াতেই এর সমাপ্তি ঘটবে। কৃষ্ণার প্রশ্নটা এড়াতে ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে তাই তাগাদা দেয় গোপাল, আর একটু পা চালিয়ে চলুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় পৌছাতেই হবে।

পিচের রাস্তায় পড়েই একটা লরি পাওয়া গেল। হাত তুলে থামাল সেটাকে গোপাল। প্রৌঢ় পাঞ্জাবী ড্রাইভার সামান্য বিরক্তির সঙ্গে মুখ বের করল।

কি বলছেন ?

গোপাল সামনে এগিয়ে গেল। আমাদের একটা লিপ্ট দেবে ? ভীষণ বিপদে পড়েছি ভাই।

বিরক্তির সঙ্গেই জিজ্ঞেস কবল পাঞ্জাবী ড্রাইভাব, কোথায় যাবেন ?

কলকাতা।

কিন্তু আমার গাড়িতো অতদূর যাবে না। আপনি ঠাবিয়ে যান, বাস মিলবে।

বাস পেলেও পৌছাতে অনেকক্ষণ লাগবে। বরং যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় তাই লাভ। ড্রাইভাবেব মতামতের অপেক্ষা না রেখেই দরজা খুলে উঠে পড়ে গোপাল। বিনয়েব সঙ্গে বলে, আমাদের ভীষণ জরুরী আছে ভাই। আপ যেতনা দূর যায়গা যায়গা, আমাদের পথে

া।

ত যাত্রী দু'জনের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ড্রাইভার।

ান একটা গোলমাল বাধিয়ে এসেছেন বাবুরা। তাই ঝটপট

চান। তবু, খুব খুশি না হলে... আপত্তি ... ড্রাইডার।



কৃষ্ণাকে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসে গোপাল। ঝরঝরে লরিটা সশব্দে যাত্রা শুরু করে। ভেতরে চাপা কিন্তু প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা বোধ করছিল গোপাল কলকাতায় পৌছানর জন্য। আর স্পিডোমিটারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আঁকপাক করছিল। কাঁটাটা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে পিছিয়েও কিছুতেই কুড়ি মাইল অঙ্কটা পেরোতে পারছিল না। রাস্তাটাও এবড়ো-খেবড়ো। মাঝে মাঝে চাকা গর্তে পড়ায় বিচিত্র শব্দতরঙ্গ উঠছিল গাড়িটার সর্বাঙ্গ থেকে। কৃষ্ণা শক্ত হাতে দরজাটা ধরে থেকেও মাঝে মাঝে টাল সামলাতে পারছিল না। গোপালের গায়ের ওপর টলে পড়ছিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সঙ্কুচিত করে দরজার সঙ্গে ঘেষে বসছিল আবার।

গোপাল একসময় ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলে, আউর থোড়া স্পীড দেনে সেকতা নেই ভাই ?

ড্রাইভার নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দেয়, সেকতা ; লেকিন গাড়ি বিগড় যায়গা তো আপকো হ্যাণ্ডেল মারতে হোবে।

এ প্রসঙ্গে আর কোন অনুরোধ করতে সাহস পায় না গোপাল। কিন্তু নির্লিপ্ত ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি অনুভব করে।

কী বিরাট অগ্নিমুখ সংবাদ বহন করছে ও জানে না লোকটা। জানে না বেচারা আর মাত্র তিন দিন ওর আয়ুষ্কাল। সংবাদটার গুরুত্ব আবার মনে মনে উত্তেজিত করে তোলে গোপালকে।

ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে এক সময় আবার অনুরোধ করে ও, আমাদের কলকাতা পর্যন্ত লে যায়গা ভাই ? প্রচুর বকশিস মিলে গা।

সন্দেহের চোখে ফিরে তাকায় ড্রাইভার। অস্বস্তি বোধ করে গোপাল। ইতস্ততঃ করে বলে, একটা ভীষণ জরুরী সংবাদ নিয়ে যাচ্ছি কিনা! হাম কাগজকা আদমী হ্যায়।

কেমন যেন বোকা বোকা চোখে লোকটা তাকাল ওর দিকে। বোঝে গোপাল, কিছুই বোঝেনি ও। হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলেই

ফেলল তাই, আপ বিশওয়াস করেগা ভাই, তামাম তুনিয়া আউর তিন রোজ মাত্র জিন্দা হ্যায় ? উসকে বাদ—

ড্রাইভারের চোখে আবার সন্দেহ ঘনায়। এক্সিলেটারে চাপ দেবার অছিলায় গোপালের মুখেব কাছ দিয়ে মুখটা নিয়ে যায় একবার। বেশ বোঝে গোপাল, সন্দেহজনক কোন গন্ধেব অনুসন্ধানেই।

গোপাল হতাশ ভাবে সিটে হেলান দিয়ে বসে আবার। আরো কিছুটা এগিয়ে আব একটা বাস্তাব মুখে এসে থামল লবিটা। ড্রাইভার আস্তে হাত তুলে দেখাল, হাম উধাব যায়গা।

বাধ্য হয়ে নেমে যেতে হল ওদেব। এবং বিত্যুৎ বেগে কলকাতা পৌছানর একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকে নিযে অপেক্ষা করতে হল পরবর্তী যানের।

এরপর তুটো প্রাইভেট গাড়ি ও শেষ পযন্ত একটা ট্যাক্সীর দৌলতে যখন কলকাতার সীমানায় পৌছাল ওবা .বেলা তখন প্রায় একটা। উত্তেজনায় ট্যাক্সী ড্রাইভাবকে সমানে তাগাদা দিতে লাগল গোপাল, স্পীড বাড়ান!

শহবে ঢুকেই মনে হল কোথায় যেন একটা ছন্দ পতন ঘটে গেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছোট ছোট ভীড়। ঈষৎ উত্তেজিত আলোচনা। একটা চাপা থমথমে ভাব। সন্দেহ হল গোপালের, কোন গোলমাল-টাল হয় নি তো ? আজ একটা ছাত্র ধর্মঘট ছিল না ?

কৃষ্ণার দিকে তাকায় গোপাল। আপনাকে আগে পৌঁছে দেব, না, আগে পত্রিকা অফিসটা হয়ে যাব ?

কৃষ্ণা আস্তে উত্তর দেয়, ঠিকানাটা সঙ্গে আছে। আমি একাই যেতে পারব। আপনার সংবাদটা বোধহয় অনেক বেশী জরুরী।

গোপাল অস্বীকার করে না। তা অবশ্য ঠিক, এটার ওপর আমার অনেক কিছু নির্ভর করছে।

ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় কৃষ্ণা। এই তিন দিনের উন্নতি ?

সামান্য থতমত খেয়ে যায় গোপাল। বলে, না, মানে, ঠিক চাকরির উন্নতির কথা নয়, একটা প্রেষ্টিজ, ডিগনিটি, মানে—

কিন্তু মানেটা ঠিক বুঝিয়ে ওঠার আগেই ট্যাক্সী মোড় ঘুরে পত্রিকা অফিসের সামনে এসে দাঁড়ায়। অফিসের সামনেও উত্তেজিত একটা ছোটখাট ভীড়। কারণটা কিছুতেই অনুমান করতে পারল না গোপাল।

দ্রুত ট্যাক্সী থেকে নেমেই পকেট থেকে মানি ব্যাগটা বের করে।

কিন্তু হাত তুলে বাধা দিল কৃষ্ণা। ওটা বাড়ি গিয়ে আমিই দিয়ে দেবখ'ন। আপনার উপকারের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

ফাঁকা ভদ্রতার প্রতিযোগিতায় নামবার মত মনের অবস্থা নেই তখন গোপালের। সম্পাদকের টেবিলটা চুম্বকের মত তীব্র আকর্ষণ করছে ওকে। তবু মানিব্যাগটা পকেটে রাখতে রাখতে নিরুত্তাপ স্বরে একবার জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণাকে, দেখুন, একা যেতে পারবেন তো ? কোন দরকার বোধ করলে আমাকে এখানেই খোঁজ করবেন।

কিন্তু বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। ভীড় এড়িয়ে অফিসের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর দুটো করে সিঁড়ি টপকে টপকে দ্রুত ওপরে উঠে যায় গোপাল।

অফিসেও কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। সবার মুখ গম্ভীর। টেবিলে টেবিলে ছোট ছোট আলোচনা চক্র। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না গোপাল। কিন্তু দাঁড়িয়ে বুঝবার মত মনের স্থৈর্য নেই তখন ওর। হন হন করে সম্পাদকের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ও।

কিন্তু যেতে যেতেই হঠাৎ একটা টেবিলের দিকে নজর পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভূত দেখার মত চমকে উঠল। কয়েকজন সহকর্মী সদ্য মেসিন থেকে বেরিয়ে আসা একটা টেলিগ্রাম গিলছে গোগ্রাসে। সেখাম থেকেই সমস্ত কাগজ জোড়া হেডিংটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে : পৃথিবীর আয়ুষ্কালের শেষ তিন দিন ঘোষিত।

টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে উত্তেজনায় প্রায় চীৎকার করে ওঠে গোপাল, কোন শালা এই নিউজ্ সাপ্লাই করল ?

কিছুক্ষণ ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে জনৈক সহকর্মী বন্ধু নিঃশব্দে আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালেন। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কারো মৃত্যু সংবাদ মুখে বলতে বাধছে বলে যেন ইংগিতে জানাচ্ছেন।

উত্তেজিত গোপাল প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে, সংবাদ দিয়েই মারা গেছে ? কে ?

সহকর্মী এবার মুখ খোলেন, কেউ মরেনি, একসঙ্গেই সবাই মরব, তিন দিন পর, আকাশ থেকে সেই সংবাদ নিচে এসেছে।

এতক্ষণে পরিষ্কার হয় ব্যাপারটা। এবং প্রচণ্ড রাগ হয় গোপালের পাইলটের ওপর। সংবাদটা এমন কিছু শুভ নয় যে তড়িঘড়ি পাচার না করলেই চলছিল না। জীবনে এতে তোদের কি উন্নতিটাই বা হবে। কিন্তু এ সংবাদ আজ আমি আনতে পারলে—।

অনুতাপ হয় গোপালের, তখন সত্যি পরিচয় দিয়ে হাতে পায়ে ধরলে বোধ হয় এ সুযোগটা দেবার মত উদারতা দেখাত পাইলটটা।

উত্তেজনায় প্রচলিত নিয়মকানুনের পরোয়া না করেই সরাসরি সম্পাদকের ঘরে এসে হাজির হয় গোপাল। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে চোখমুখ।

সম্পাদক, যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে এই পত্রিকার মালিকও, গম্ভীর মুখে নিজের চেম্বারে পায়চারী করছিলেন। এটি ওঁর আবাল্য অভ্যাস। গভীর কিছু চিন্তা করতে হলেই নাকি ভদ্রলোক ঘরময় পায়চারী করে বেড়ান। অবশ্য কর্মচারীদের অঘোষিত বিশ্বাস, চেষ্টা করেও কস্মিনকালে গভীর কিছু ভেবে উঠতে পারেন না বলেই ওর এই অস্থির পদচারণা।

গোপালকে দেখে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। সামান্য বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, সেকি, যাওনি তুমি ?

উত্তেজনা চাপতে চাপতে বলল গোপাল, গিয়েছিলাম।

গিয়েছিলাম মানে ?

গোপাল এবার গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, ঐ প্লেনেই ছিলাম আমি। পথে নামিয়ে দিল আমাদের। একটা ধান ক্ষেতের কাছে। তারপর, সমস্ত পৃথিবীর মৃত্যুকে ঠোঁটে করে একটা বাজপাখির মত আকাশে উঠে গেল প্লেনটা।

তখনকার গুছিয়ে ভাবা কথাগুলো এমন নিখুঁত ভাবে বলতে পারায় বেশ একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করে গোপাল।

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে গোপালের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন সম্পাদক। গোপালকে এসে জড়িয়ে ধরেন।

লিখে ফেল, এই মুহূর্তে, একটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখে ফেল তো। দেখি এবার ও শালাদের কাগজ কি করে আমাদের ওপর টেক্কা দেয়।

এই অপ্রত্যাশিত আলিঙ্গনের ব্যূহ থেকেই জিজ্ঞেস করে গোপাল, কয় কলম লিখব স্যার ?

সম্পাদক ওকে ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসতে বসতে বললেন, যে কয় কলম খুশি। এই ঘরে, ঐ টেবিলটায় বসেই লিখে ফেল।

গোপাল এগিয়ে যাচ্ছিল, সম্পাদক ডাকলেন আবার। আর শোন, স্লাইট রম্য রচনার ঢঙে লিখবে, বুঝলে ? হারী আপ্।

গোপাল কোণের টেবিলটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই শোনে সম্পাদক কাকে যেন ফোন করছেন ঃ হ্যাঁ, আমি চৌধুরী কথা বলছি। …হ্যাঁ…হ্যাঁ…ওটার জন্যই ফোন করছিলাম। আপনাদের বিজ্ঞাপনটা ফুল-পেজ করে দিন না। কিছুক্ষণের ভেতরই একটা স্পেশাল ইস্যু বের করছি আমরা। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে।…হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের একজন রিপোর্টার ছিলেন ঐ প্লেনে।…আরে না না মশায়, এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? পৃথিবীতো আজকাল সপ্তাহে একবার করে ধ্বংসের কিনারে যাচ্ছে আবার বাধ্য ছেলের মত ফিরেও আসছে সুড়সুড় করে।

…ও ‥হ্যাঁ, হ্যাঁ,…আচ্ছা তাহলে হাফ-পেজই দিন…আচ্ছা ঠিক আছে আমি স্পেস্ রাখছি।

ঝড়ের বেগে লিখে যেতে যেতেও গোপালের কানে এল· সম্পাদক, যিনি জন্মসূত্রে এ পত্রিকার মালিকও, সমানে এদিক ওদিক ফোন করে যাচ্ছেন। কাউকে অভয় দিয়ে, কোথাও কাগজ চেয়ে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনের জন্য। গোপালের মুহূর্তের জন্য মনে হল এঁরা বোধহয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময়ও শেষ ফোন করে যাবেন. আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি। কাল বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করার ব্যবস্থা করে গেলাম আমার জীবনী দিয়ে। একটা বিজ্ঞাপন দিন না।

একটু বাদেই নিজেদের ভেতর উত্তেজিত আলোচনা করতে করতে ঘরে ঢুকলেন পত্রিকার শীর্ষস্থানীয় দু তিনজন সাংবাদিক। সম্পাদক ওঁদের বসতে বললেন। আলোচনা শুনে বোঝে গোপাল, এই আচমকা ঘটনা প্রসঙ্গে বিশদ পর্যালোচনা ও কাগজের সম্ভাব্য পলিসি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

প্রথমেই অবশ্য প্রশ্ন উঠল এ ধরণের একটি অস্ত্রের বাস্তবতা নিয়ে। এ রকম কোন মারণাস্ত্র সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন তুললেন একজন। এবং দৃঢ় অভিমত জানালেন, এটা পাইলটদের একটা হোক্স বা ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। আটাব ফ্র্যাস্ট্রেশন থেকে এটা করছে ওরা।

উত্তরে একজন ব্যঙ্গের সুরে বললেন, দেয়ার আর মোর থিংক্স ইন সাইন্সসেস্ হেভেন এ্যাণ্ড আর্থ! বিজ্ঞানে আজ অবিশ্বাস্য বলে কিছু নেই। তাছাড়া, অনেক সময় বোতল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগে পর্যন্ত স্রষ্টারা নিজেরাও বুঝতে পারেন না তারা কি সৃষ্টি করলেন। লস আলমোসের সিক্রেট-সিটিতে প্রথম এ্যাটম বোম ক'টা তৈরী করার পরও বৈজ্ঞানিকরা সঠিক বুঝছিলেন না এই নবজাতকটি, তাঁদের সাংকেতিক ভাষায় 'ছেলে' না 'মেয়ে' হল। প্রথম পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত বোমটার সম্ভাব্য ধ্বংস-ক্ষমতা নিয়ে নিজেদের ভেতর বাজী

রাখা হত। কিন্তু পরীক্ষার পর দেখা গেল এঁদের নিজেদের কল্পনাকে বহুগুণ ছাড়িয়ে গিয়েছে বোমটার কার্য-ক্ষমতা।

বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, কিন্তু বিজ্ঞান ভোজবাজী নয় বলেই তার একটা ধারাবাহিকতা আছে; সম্ভাব্যতার প্রশ্ন আছে। প্রথম বোমটা আমেরিকা তৈরী করলেও পৃথিবীর বহু দেশের বহু বৈজ্ঞানিকই তখন জানতেন যে ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। এমনকি জাপানও জানত। তাই হিরোশিমায় এ্যাটম বোম পড়ার সংবাদ পেয়েই জাপানের বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী নিশিনাকে মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে ডেকে এনে তাঁকে এ্যাটম বোম বাস্তবে সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন করা হয়নি, তাকে প্রথম প্রশ্ন করা হয়েছিল, ছ' মাসের ভেতর এ্যাটম-বোম তৈরী করে দিতে পারবেন?

নিশিনা গম্ভীরভাবে জবাব দিয়েছিলেন, বর্তমান অবস্থায় ছ' বছরেও সম্ভব নয়। আমাদের ইউরেনিয়াম নেই।

সম্পাদক গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলো। গোপাল বুঝল, এর অনেক তথ্যই গোপালের মতই ওঁরও অজানা। তবু, নিজের পদমর্যাদা প্রসঙ্গে সচেতন হয়েই বোধহয়, গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, ব্যাপারটা খুব অসম্ভব নাও হতে পারে। কোন্ রাষ্ট্র গোপনে কিসের গবেষণা চালাচ্ছে তাতো বাইরের কারো বোঝার উপায় নেই। এইতো সেদিন মার্কিন বৈজ্ঞানিক লিনাস পলিং-এর একটা লেখা পড়ছিলাম। ওঁর হিসেবে সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং এ থেকেই সহজ হিসেবে আসা যায়, এখন পর্যন্ত যে শক্তির পারমাণবিক অস্ত্র আছে তার চেয়ে মাত্র তিনগুণ শক্তিশালী অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারলেই প্রথম ধাক্কাতেই গোটা পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

বোধহয় ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি এড়ানোর জন্যই চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে একজন বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ঠিক ওভাবে হিসেবটা মিলবে না। লিনাস পলিং ঠিক একটা বোমায় এক-তৃতীয়াংশ লোক

নিশ্চিহ্ন হবে বলেন নি। যুদ্ধে উভয় পক্ষ তাদের হাতে মজুদ যে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, সেই হিসেব ধরেছেন। পাইলটদের কাছে আর ক'টা বোমা থাকতে পারে। তাছাড়া, মুস্কিল হয়েছে ঠিক ডিটেল্‌সটা জানা যাচ্ছে না বলে।

সম্পাদকের হঠাৎ গোপালের কথা মনে পড়ে। উৎসাহের সঙ্গে গোপালকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন তিনি, আমাদের ঐ রিপোর্টারটি কিন্তু ঐ প্লেনেই ছিল। ওকে দিয়ে একটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখিয়ে নিচ্ছি। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে।

কৌতূহলে সবাই গোপালের দিকে ফিরে তাকান। গোপাল একই সঙ্গে আত্মতৃপ্তি এবং সঙ্কোচ বোধ করে।

ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে গোপালকে কাছে ডাকলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্নে ওর কাছ থেকে সব জেনে নেবার চেষ্টা করলেন। সেই অজ্ঞাত পরিচয় বিদেশী লোকটি প্রসঙ্গে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হল গোপালের। ভদ্রলোকের বড় বড় চুলের কথা শুনে একজন বললেন, হঠাৎ মনে পড়ল, লস আলমোসের বৈজ্ঞানিকরাও সব বড় বড় চুল রাখতেন কিন্তু। গোটা অঞ্চলের লোক ওঁদের লং হেয়ার্ড সাইন্টিস্ট বলত। ওঁদের ভেতর যে সব ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিক ছিলেন এটা তাঁদেরই কারো আবিষ্কার নয় তো?

বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক গভীরভাবে কি যেন ভাবছিলেন। গোপালের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, আচ্ছা, পাইলট অস্ত্রটা সম্বন্ধে ঠিক কি বলেছিল আপনার মনে আছে?

গোপাল আস্তে মাথা নেড়ে বলল, হুবহু কথাটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু বলেছিল যে, নতুন আবিষ্কৃত এমন একটা পারমাণবিক অস্ত্র সঙ্গে আছে যা দিয়ে মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করা যায়। আমি থার্মোনিউ ক্লিয়ার বোম-টোম কিছু ভাবছিলাম।

ভদ্রলোক ঠোঁটে আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে গভীরভাবে কি যেন চিন্তা

করে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, দাঁড়ান, আমি একটু লাইব্রেরী থেকে আসছি

দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। এবং কিছুক্ষণ বাদেই উত্তেজিতভাবে পেঙ্গুইনের একটা চটি বই হাতে ফিরে এলেন আবার। বার্ট্রাণ্ড রাশেলের একটি বই। আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করে আনা পাতাটা খুলে টেবিলের ওপর বইটা রাখলেন। তারপর উত্তেজনায় থমথমে গলায় জোরে জোরে একটা জায়গা পড়তে শুরু করলেন ঃ

So far, the H-bomb is the worst weapon of mass destruction that has been invented, but it is obvious that, if international anarchy and scientific skill both continue, even more dangerous weapons will be invented, probably quite soon. There has been talk of what is called 'The Doomsday Machine'. This would be a machine which could, in a moment, destroy the whole population of the world. Herman Kahn has stated that, if he thought it worth while, he could almost certainly invent such a machine......

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন বইটার ওপর। সম্পাদক হঠাৎ মুখ তুলে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, এই ভদ্রলোকের কোন ছবি-টবি আছে আমাদের এখানে? গোপালকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নেওয়া যেত ইনিই প্লেনের সেই বিদেশী ভদ্রলোক কিনা।

কিন্তু এঁর কোন ছবি কেউ কোন দিন দেখেছেন বলে স্মরণ করতে পারলেন না। গোপালকে গিয়ে লেখাটা শেষ করতে বলা হল।

গোপাল ফিরে গিয়ে লিখতে লিখতেই শুনতে পেল, পত্রিকার পলিসি ঠিক হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হল, বর্তমানে এমন কিছু প্রকাশ করা হবে না যাতে মানুষ অতিরিক্ত আতঙ্কিত হয়ে

ওঠে। কোন রকম ফ্র্যান্টিক স্পেকুলেশনের ভেতর না গিয়ে যথাযথ সংবাদটুকু পরিবেশন করে যাওয়াই উচিত হবে এ অবস্থায়।

আরো কী সব যেন জরুরী আলোচনার পর সম্পাদক বাদে সবাই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আধ ঘণ্টার ভেতরই গোপালের লেখা শেষ হয়ে গেল। তীব্র উত্তেজনা সত্বেও যতদূর সম্ভব রমণীয় করে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণটা লিখল ও। অবশ্য সবটা সূতো ছাড়ল না, কায়দা করে কিছু সূতো নাটাইয়ে রেখে দিল। এ তিনটা দিন ভালোয় ভালোয় কাটলে পরে কাজে লাগান যাবে ভেবে। বহুদিন পর একটা জুতসই মুরগী হাতে পেয়েছে, অন্তত বার-দশেক জবাই না করে ছাড়ছে না বাবা!

গোপাল লেখা শেষ করে পাতাগুলো ঠিক মত গুছিয়ে সম্পাদকের সামনে এসে দাঁড়াল। সম্পাদক পাতাগুলোর ওপর সামান্য একটু-আধটু চোখ বুলিয়ে বেল টিপলেন। বেয়ারা এলে লেখাটা তার হাতে দিয়ে বললেন, বোস বাবুকে দিয়ে বলবে এক্ষণি প্রেসে যাবে। সঙ্গে ইলাষ্ট্রেশন যায় যেন।

বেয়ারার সঙ্গে সঙ্গে গোপালও বেরিয়ে যাচ্ছিল, সম্পাদক ডাকলেন ওকে। নিঃশব্দে ওর হাতে একটা চেক্ তুলে দিলেন।

চেকের ওপর চোখ বুলিয়ে সামান্য বিস্মিত হয় গোপাল। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করে বসে, এ মাসের মাইনেটা কি এ্যাডভান্স দিচ্ছেন স্যার?

গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন সম্পাদক, এই লেখাটার রেমুনারেশন। সেকেণ্ড ফ্লোরে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর। আমি আসছি। আমি সমস্ত স্টাফের সঙ্গে একটু মিট্ করতে চাই। সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে।

গোপাল চেক্‌টা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এবং নিচে এসে দেখল ইতিমধ্যেই সব পত্রিকার কর্মীরা এসে জড়ো

হয়েছে। সবারই চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ; চাপা উত্তেজনা। মালিকের ডাকার কারণটাও ঠিক অনুমান করতে পারছে না কেউ।

কিছুক্ষণের ভেতরই সম্পাদক গম্ভীর মুখে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কর্মচারীদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর গম্ভীরস্বরে বলতে শুরু করলেন, আপনাদের কাছে আমার একটি আবেদন আছে। পত্রিকার মালিক হিসেবে নয়, সম্পাদক হিসেবে নয়, একজন সাংবাদিক হিসেবে।

গোপালকে পাশের সহকর্মী বন্ধু একটা ইঙ্গিতপূর্ণ খোঁচা দিল।

সাংবাদিক হিসেবে আপনাদের মহান দায়িত্বের কথা স্মরণ করে এই জাতীয় সংকটের দিনে আপনারা শেষ পর্যন্ত কর্তব্যে অবিচলিত থাকবেন বলেই আমি আশা করি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, জাতির স্বার্থে, জনতার স্বার্থে (একজনকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে হাসতে দেখল গোপাল) প্রতি চার ঘন্টা অন্তর আমরা এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ সংবাদ দিয়ে একটি করে টেলিগ্রাম শেষ করব। আশা করি আপনাদের সহায়তা থেকে এ বিষয়ে পত্রিকা বঞ্চিত হবে না। অবশ্য বোর্ড এই তিন দিনের জন্য আপনাদের তিন মাসের বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সম্পাদক থামলেন। গোপাল বোনাসের প্রশ্নে একটু অবাক হল। এক মাসের বোনাস নিয়েও সেবার কী কাণ্ডটাই না ঘটে গেল!

সম্পাদক আর একবার সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আস্তে বললেন, আচ্ছা, আপনারা এখন যেতে পারেন। আপনাদের আর সময় নষ্ট করব না।

সম্পাদক রুমালে ঘাম মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নানা রকম আলোচনার গুঞ্জনে ঘর ভরে গেল। গোপাল নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাড়িতে নিশ্চয়ই সবাই চিন্তা করছে। একবার বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন।

সিঁড়ির মুখে এসে পকেটে হাত দেয় গোপাল। চেক্‌টা ঠিক

আছে তো ? পকেট থেকে চেক্‌টা বেব করে আব একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। বিস্ময়েব চেয়েও ব্যাপারটায় কৌতুক বোধ করছে বেশী।

বেশ বড় এ্যামাউন্ট দেখছি !

ফিরে তাকায় গোপাল। অশোক। চেক্‌টা পকেটে বাখতে রাখতে একটু হেসে বলে, মৃত্যু মানুষকে কত মহৎ কবে তাবই দলিল।

অশোকও হাসল। কিন্তু সে হাসিতে শ্লেষ ও ঈষৎ ঈর্ষা। মৃত্যুকে মূলধন কবে যে বেশ ট্-পাইস্ ইন্‌কাম কবা যায় তাবও নিদর্শন।

বলে আব দাঁড়াল না অশোক। তড়তড় কবে নিচে নেমে গেল।

ইঙ্গিতটা ক্ষুব্ধ কবে গোপালকে। চাকবিব প্রথম দিন থেকেই অশোক যে কেন ওকে এত ঈর্ষা কবে ঠিক বোঝে না ও। অথচ গোপাল তো অশোভনভাবে কাউকে ডিঙিয়ে ওপরে ওঠবাব চেষ্টা কবেনি কোনদিন।

নামতে নামতেই চোখে পড়ল নিচেব ভীড় অনেক বেড়েছে। সামান্য ফাঁক বেখে কোলাপ্‌সেব্‌ল গেটটা বন্ধ কবে দবজায় পাহাবা দিচ্ছে নেপালী দবোযান।

দবজাব মুখে এসে হঠাৎ ভীড়েব পেছনে সেই ট্যাক্সীতেই কৃষ্ণাকে দেখে অবাক হয় গোপাল। তাহলে কি যাননি ও ? কৃষ্ণা বোধহয় নামতে যাচ্ছিল, গোপাল ভীড় ঠেলে ওর সামনে এসে দাড়াল।

কি ব্যাপাব, আপনি যাননি ?

কৃষ্ণা অসহায়ভাবে বলল, গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িব সব তালা বন্ধ কবে কোথায় যেন চলে গেছে।

কাউকে কিছু বলে যাননি ?

না। তবে সঙ্গে কিছু জিনিষপত্রও নিয়ে গেছেন শুনলাম।

চিন্তিত হয গোপাল। একটু ভেবে বলে, ভয়ে দেশে চলে যাবাব চেষ্টা কবছেন নাতো ?

কৃষ্ণা বলল, সেকথা আমাবও একবার মনে হয়েছিল। বলতে বলতেই বৃদ্ধ পাঞ্জাবী ড্রাইভাবেব দিকে ফিবে তাকায কৃষ্ণা। ইনি

আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। আমার অবস্থা বুঝে ষ্টেশনেও নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেও ক্রমশঃ ভীড় বাড়ছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম; পেলাম না। মাইকে এ্যানাউন্স করালাম, কিন্তু কোন কাজ হল না।

গোপাল নতুন এক সমস্যায় পড়ে।

আপনার আর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই এখানে?

কৃষ্ণা আস্তে মাথা নাড়ে। ওর বিপদের গুরুত্বটা উপলব্ধি করে গোপাল। একটু ভেবে বলে, আচ্ছা দাঁড়ান তো, এয়ার পোর্টে একটা ফোন করে দেখি।

কিন্তু চেষ্টা করেও নিরাশ হয়ে ফিরে এল গোপাল। এয়ার পোর্টের কানেকশনই পেল না। ট্র্যান্সপোর্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে জানল এখন আর কোন প্লেন নেই ওদিকে। তাছাড়া আগামী দুদিনের সিটও বুক হয়ে আছে গত দুদিন আগেই।

কৃষ্ণা আতঙ্কে প্রায় ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে কি হবে?

গোপাল কৃষ্ণার দিকে তাকায়। এই নিরাশ্রয় মেয়েটির অসহায়ত্ব, আতঙ্ক ওকে পীড়িত করে। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে নেয় ও। তারপর ওর চোখে চোখ রেখে বলে, ঠিক এই মুহূর্তে আমিও কিছু ভেবে পাচ্ছি না। তবে আপনার কোন আপত্তি না থাকলে আপনি আপাততঃ আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি আসতে পারেন। আমি ইতিমধ্যে চারদিকে খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারি আপনার ফেরার কোন—

কিন্তু কৃষ্ণা একটু ইতস্ততঃ করে।

এভাবে হঠাৎ আপনার সঙ্গে—

গোপাল সঙ্গে সঙ্গে বলল, অবশ্য আপনি সেটা ভেবে দেখুন। এতটুকু পরিচয়ের ওপর আমাকে বিশ্বাস করে—

কৃষ্ণা সঙ্কোচে মিইয়ে যায়।

ছি-ছি, আমি তা ভেবে বলিনি। এভাবে আমাকে নিয়ে গেলে আপনার কোন অসুবিধে—

গোপাল হাসল। আমাব নিজের বাড়ি প্রসঙ্গে সেটুকু আস্থা না থাকলে আমি আপনাকে বলতাম না। আর পাড়াপড়শীর কথা যদি বলেন, এখনও এ সব উৎসাহ তাদের থাকবে বলে তো মনে হয় না। থাকলেও মাত্র তিন দিনের নিন্দা বহন করার মত শক্তি আমার আছে।

এত আতঙ্কের ভেতরও ওর বলার ভঙ্গী দেখে একটু হাসে কৃষ্ণা। বলল, তাহলে চলুন।

সেই ট্যাক্সীতেই কৃষ্ণাব পাশে উঠে বসল গোপাল। গলি পেরিয়ে ট্যাক্সী বড় রাস্তায় পড়ল।

পথের ভীড় আগের চেয়ে আরো বেড়েছে। মোড়ে মোড়ে জটলা। দোকানের বেডিওর সামনে উৎকণ্ঠিত জমায়েত। সকাল থেকে এ পর্যন্ত ঘটা অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলোকে ক্রমানুসাবে সাজিয়ে আব একবার উপলব্ধি করার চেষ্টা কবছিল গোপাল। কিন্তু কিছুতেই ঘটনাটাকে সত্যি বলে ভেবে উঠতে পারছিল না। চবম গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে ভাবতে পারছিল না। নিজেকে আব একবাব খুঁটিয়ে বিচার কবে দেখে ও। না, প্রচণ্ড ধরনের কোন উত্তেজনা বা আতঙ্ক বোধ করছে না। এ কি ওর সহজাত নিরাসক্তি বা নির্লিপ্তির জন্যই? লঘু গুরু সব ঘটনাকেই কিছুটা নির্বিকাব মুক্ত-দর্শকসুলভ দৃষ্টিতে বিচাবেব, ইদানিং যা আরো ব্যাপৃত, অনুভূতি থেকেই? না কি, মা যে মাঝে মাঝে বকেন, তুই নির্বোধ নয়, কিন্তু স্বাভাবিক অনেক ব্যাপাবেই তোব বোধশক্তিটাই ভোঁতা, সেটাই ঠিক?

হঠাৎ বেডিওর প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেল। একটি নতুন ঘোষণা শোনা গেল রেডিওতে:

একটি জরুবী ঘোষণা। আকাশবাণীর প্রতিটি কেন্দ্রের পূর্ব-নির্ধারিত সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে দেওয়া হল। এখন থেকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর কেবলমাত্র বর্তমান বিশ্ব-সংকট প্রসঙ্গেই সংবাদ পরিবেশন করা হবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি দেশবাসীকে মনোবল না হারানর জন্য অনুবোধ জানিয়েছেন। সরকার

থেকে ঘটনা প্রসঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষিত হচ্ছে।

গলির মুখে ও রকের ওপর ছোট ছোট ভীড় জমেছে। গোটা পাড়া জুড়ে কেমন একটা থমথমে ভাব। গোপালের ট্যাক্সীর দিকে দু' একজন সামান্য কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু সেটুকু নিছক কৌতূহলই, তার বেশী কিছু নয়।

গোপাল কৃষ্ণাকে নিচের বৈঠকখানায় বসিয়ে মাকে ডাকবার জন্য ওপরে গেল। সিঁড়ির মুখেই বাবার ঘর। জানলা দিয়ে ভেতরে বাবাকে দেখে জানলার কাছে থেমে গেল গোপাল।

বাবা সন্তর্পণে নিজের আলমারিটায় আর একটা তালা লাগাচ্ছেন। পেছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মা। পরনে পট্টবস্ত্র। বোধহয় পূজোর ঘর থেকে এলেন। গোপালের মনে হল, বাবা টের পাননি মার উপস্থিতি। বাবা তালাটা লাগিয়ে পেছন ফিরতেই মা'র সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে গেল। সামান্য বিব্রত বোধ করলেন বোধহয় বাবা।

মা অনুশোচনার স্বরে বললেন, আশ্চর্য, এখনও তোমার টাকার মায়া গেল না ?

বাবা কেমন যেন সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, মায়ার কি দেখলে ? চারদিকের অবস্থা দেখে একটু সাবধান হলাম মাত্র। দেখি, একটু বাইরে গিয়ে অবস্থাটা দেখে আসি।

গোপাল চৌকাঠের কাছ থেকেই ডাকল, মা, একটু শুনবে ?

বাবা গোপালকে দেখে অবাক হলেন। সেকি, তুই যাসনি ?

গোপাল আস্তে বলল, রওয়ানা হয়েও ফিরে এলাম। ঘটনাটা আমাদের প্লেনেই ঘটেছে।

বাবার চোখে সামান্য আতঙ্ক ফুটল। তাহলে যা শুনছি সব সত্যি ?

বাবার এ আতঙ্কে ব্যথিত হয় না গোপাল। ও জানে, বাবার এই আতঙ্কের সঙ্গে, এই মুহূর্তে, ওঁর বৈষয়িক চিন্তা যতটা জড়িত, পরিবারের

চিন্তা ততটা নয়। শৈশবের কথা সঠিক মনে নেই ওর, কিন্তু পরবর্তী সময়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, পরিবার ও বাবার মধ্যবর্তী আলমারির প্রতিবন্ধকটা যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে অনেকদিন থেকেই প্রায় আড়াল করে ফেলেছে বাবাকে তা বোঝে ও।

গোপাল বলল, হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত ঘটনাটা সত্যি। অবশ্য এখন থেকে .রটনাটাও ক্রমশঃই ফেঁপে উঠতে থাকবে।

মাকে নিয়ে নিচে নামতে নামতে কৃষ্ণার কথা মাকে খুলে বলল সব। মা খুব সহজভাবেই নিলেন ঘটনাটা। বললেন, ভালই করেছিস। না.হলে মেয়েটার আরো কত বিপদে পড়তে হত কে জানে।

কৃষ্ণা মাথা নিচু করে বসেছিল। কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টি চোখে। পায়ের শব্দে দরজার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

গোপাল মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কৃষ্ণার।

আমার মা। আপনার কথা মা'কে সব বলেছি।

কৃষ্ণা এগিয়ে এসে প্রণাম করল মাকে। ওর চিবুকে আঙ্গুল ছুঁইয়ে চুমু খেলেন মা। মা'র চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিল কৃষ্ণা ঘটনাটাকে সহজভাবেই নিয়েছেন উনি। এবার মা'র স্পর্শে নিশ্চিত হল, ভুল আশ্রয়ে আসেনি ও। সামান্য অভিভূত হল কৃষ্ণা।

মা কৃষ্ণাকে নিয়ে বসতে বসতে বললেন, ইতুকে ডেকে নিয়ে আয়।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, ইতু কোথায় ?

মা সস্নেহ অনুযোগের সঙ্গে বললেন, আর কোথায় ? ছাদের ঘরে।

ব্যাপারটা জানে না ও ?

মা বললেন, ঘর থেকে বেরুলে তো জানবে। আমিও ইচ্ছে করেই কিছু জানাইনি। যেটুকু সময় শান্তিতে আছে থাক না।

ইতুর কথা ভাবতে ভাবতেই ওকে ডাকতে যায় গোপাল। আর সবাই শান্তি ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে কিন্তু গোপাল বোঝে এ আরাধ্য শান্তি নয়। ইতুর এসব শান্তির অন্য পিঠে এক অঘোষিত আত্মবঞ্চনার বেদনা দেখতে পায় ও। অবশ্য ইতুর চেতনাতেও এ

বেদনা আদৌ অনুভূত কিনা সন্দেহ আছে ওর। এবং সেজন্যই একে স্বাভাবিক বলে ভাবতে পাবে না। ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

শৈশব থেকেই যেন যোগিনী ইতু। না খেলাধুলা, না পোষাক আশাক, না বেড়ান-টেড়ান—কোন কিছুতেই আকর্ষণ ছিল না ওর। শুধু মাত্র একটি ব্যতিক্রম ছিল—বই। বাতদিন ঘরেব কোণে, আনাচে-কানাচে বইয়ে ঘাড় গুঁজে বসে থাকত। সবাই অবাক হত, ভোগে এ নির্লিপ্তি পেল কোত্থেকে এতটুকু মেয়ে?

অবশ্য সবাই ভেবেছিল, বয়সেব ধর্মে কিছুটা আকর্ষণ হয়তো আসবে সময় মত। অথচ সে বয়স এসে ওকে যেন আরো নির্লিপ্ত কবল। সঙ্কুচিত কবল ঘবেব কোণে। ওর জীবনে বই ছাড়া কোন বন্ধু নেই। বন্ধুবা নাকি বড় আজেবাজে কথা বলে। বড় হালকা। আমোদ-আহ্লাদে কোন আকষণ নেই। আনন্দ পায় না নাকি। ক্লান্ত লাগে! বাইবেব ছেলে তো দূবেব কথা পুরুষ আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও মুখ তুলে কথা বলতে পাবে না ও। সুতবাং একুশ বছরের ইতুর গোটা পৃথিবীটা আজ গুটিয়ে এসে ছাদেব ছোট্ট ঘরের চার দেয়ালে স্বেচ্ছাবন্দীত্ব ববণ কবেছে।

আব পাঁচটা যুবতী মেয়েব মত ইতুকে নিয়ে পরিবারের ভয ছিল না তাই; ভাবনাও ছিল না। যেটুকু ছিল সেটুকু অস্বস্তি। তারও মেয়াদ খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এমনকি এমন স্নেহপ্রবণ মা'র ক্ষেত্রেও। গোপাল এ নিয়ে বেশী হৈ চৈ করলে বরং বকত মা, তুই এত বাড়িয়ে দেখিস কেন ব্যাপারটাকে। সব মানুষই কি সমান হয়। মেয়েরা একটু ঘরকুনো হলেই বা ক্ষতি কী?

শুধু ঘরকুনো হলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বয়সের ধর্মেই মানুষের যে স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোব স্ফুবণ প্রত্যাশিত, ইতুর ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতিকে ওর অস্বাভাবিকতা বলেই মনে হয়।

গোপালের তাই চেষ্টার অন্ত ছিল না বোনটাকে বাইরে টেনে এনে

পৃথিবীর রূপ রস গন্ধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ওকে স্বাভাবিক করে তোলার। জীবন প্রসঙ্গে ওর আকর্ষণ বাড়ানর। কিন্তু আজো তা পারেনি গোপাল।

মাঝে মাঝে তর্কের মুখে চটে যায় গোপাল। স্পষ্ট বলে বসে, তুই জানিস না ইতু এটা তোর রোগ। কম্‌প্লেক্স। জীবনটাকে কেন তুই এভাবে বঞ্চিত করছিস ?

ইতু হাসে, ভোগ করলেই বুঝি জীবনটা সার্থক হয় ?

—হয় বৈ কি। পরিচ্ছন্ন উপভোগই জীবন। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সব দিকে সামাঞ্জস্য রেখে জীবনকে ভরাট না করে তুললে তার আলগা দিক দিয়ে অলক্ষ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়। তুই কি নিজেকে অসাধারণ বলতে চাস ?

ইতু রাগে না। এটা ওর গুণ। মিটি মিটি হেসে বলে, চাইলেই বা মানবে কেন ? জীবনকে ভোগ করছি না, এটাকে বঞ্চনা বলে ভাবছ কেন ? ত্যাগ বলেও তো ভাবতে পার।

কোন কিছুর অপ্রাপ্তিকে কেউ যদি বঞ্চনা না ভেবে ত্যাগ বলে ভাবতে শুরু করে, তখন সেটা প্রায় তপস্যার পর্যায়ে উন্নীত হয়। সুতরাং তার উদ্ধারে এগিয়ে যাওয়া তখন নিষ্প্রয়োজন। নিরর্থক। তাছাড়া তর্কে মানুষকে পরাজিত পর্যন্ত করা যায় কিন্তু বশীভূত করা যায় না। ইদানিং, একেবারে হাল না ছাড়লেও, তর্ক করা তাই ছেড়ে দিয়েছে গোপাল। নিজের কাজের উত্তেজনায় উদ্দামেরও ভাঁটা পড়ছে। তবু মাঝে মাঝে ইতুর কথা ভেবে ওর দুঃখ হয়। রাগ হয়।

দরজাটা ভেজান ছিল। একটু চাপ দিতেই সামান্য ফাঁক হয়ে খুলে গেল। একেই চিলেকোঠার এই ঘরটা ছোট, দরজা জানলা সংখ্যায় গোটা তিনেক। তার ভেতরও উল্টো দিকের জানলাটা বন্ধ থাকায় ঘরটাকে আরো অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল। ইতু যথারীতি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে।

দাদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসল ইতু। সামান্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, সে কি, তুমি যাওনি ?

গোপাল আলগা স্বরে বলল, যেতে যেতেও ফিরে এসেছি, সে অনেক কথা। পরে বলছি। কিন্তু জানালাগুলো শুদ্ধ এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ রেখেছিস কেন বলত। ঘরের সব রন্ধ্রগুলো বন্ধ রাখাও কি তোর সাধনার অঙ্গ।

বলতে বলতেই উল্টো দিকের জানলাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল গোপাল। ইতু চাপা আতঙ্কের সঙ্গে অনুরোধ জানাল, দাদা, ওটা খুল না।

জানালাটা খুলতে গিয়েও থামে গোপাল, কেন?

আমতা আমতা করে ইতু, কারণ আছে।

সেটাই তো জানতে চাচ্ছি।

চোখ নামিয়ে ঢোক গিলে কারণ জানায় ইতু, পাশের বাড়ি নতুন বিয়ে হল যে ভদ্রলোকের...কেমন যেন...বড় বেহায়া।

এ কারণটা অবশ্য যুক্তিগ্রাহ্য। ফিরে আসে তাই গোপাল। ইতুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বইটা বন্ধ করে দিয়ে বলে, একটু নিচে চলতো, এক ভদ্রমহিলা এসেছেন।

ইতু গোপালের দিকে তাকায়, কেন, মা নেই?

গোপাল সামান্য বিরক্ত হয়। বলে, থাকলেই বা, তোর যেতে বাধা কি? কোন ভদ্রলোক তো নয় যে সামনে যেতে আতঙ্কে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। নির্ভেজাল শান্তশিষ্ট এক ভদ্রমহিলা।

ইতু হাসল। এই শুরু হল তো তোমার আমাকে জোর করে সামাজিক করার চেষ্টা!

গোপাল গম্ভীর হয়ে বলল, না, সে প্রয়োজন বোধহয় এ কাঠামর জন্য শেষ হয়ে এল।

মানে?

আর মাত্র তুদিন পর শুধু সমাজ নয়, গোটা পৃথিবীটাই বোধহয় থাকছে না। সুতরাং ভয় নেই, এ তিন দিন স্বচ্ছন্দে নিজের খোলসের ভেতর থাকতে পারিস তুই।

ইতু সন্দেহের চোখে তাকায়। বলে, রসিকতাটা ঠিক বুঝলাম না।

গোপাল যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, সময় মত বুঝবি। এখন নিচে আয় তো। দেরী করিসনা কিন্তু।

নিচে বৈঠকখানায় এসে হকচকিয়ে গেল গোপাল। পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বণিতা এসে জড়ো হয়েছে ঘরে। তাদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। উত্তেজনা।

মাকে ও কৃষ্ণাকে উপর্যুপরি প্রশ্নে ছেঁকে ধরেছে সবাই। গোপালকে দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, এই তো গোপাল এসেছে। বাবা গোপাল, যা শুনছি তা সত্যি...গোপালদা আপনি নিজের চোখে দেখলেন বোমাগুলো?

এলোপাথারি প্রশ্নের শরবিদ্ধ গোপাল হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল উত্তর দিতে গিয়ে। হৈচৈয়ে উত্তরগুলোও হাবুডুবু খাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পাড়ার দু'চারজন যুবক হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল, আপনারা থামুন, বরং গোপালদাকেই বলতে দিন। থামুন থামুন সব। একে একে প্রশ্ন করুন।

গোলমালটা সত্যিই থামল এতে। একটি ছেলে একটা চেয়ার টেনে এনে গোপালের সামনে দিয়ে বলল, গোপালদা, আপনি বরং এই চেয়ারটার ওপর দাঁড়িয়ে নিন, তাহলে সবাই শুনতে পাবে।

এরকম এক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও বিরাট একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করল গোপাল। এতদিনে ওর সাংবাদিক পরিচয় সবার কাছে স্বীকৃতি পেল। চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল গোপাল। ভীড়ের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর নায়কোচিত গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করল, হ্যাঁ, আমিও সেই প্লেনে ছিলাম।

আমিও সেই প্লেনে ছিলাম

প্রত্যক্ষদর্শীর চাঞ্চল্যকর বিবরণ

গোগ্রাসে টেলিগ্রামটা পড়ছিল মিলি। প্রথম পাতাতেই পৃষ্ঠাব্যাপী শিরোনামায় গোপালের লেখাটা বিশেষ মর্যাদা দিয়ে ছাপা হয়েছে।

লেখাটা শেষ করে গভীরভাবে কিছুক্ষণ ভাবল মিলি। গোপাল এই প্লেনে ছিল! তাহলে তো ওর কাছ থেকেই পুরো ঘটনাটা জানা যায়। ফোনটার দিকে তাকাল একবার। কিন্তু গোপাল যদি উত্তর না দেয়? অপমান? গোপালেরও তো অপমানিত বোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু গোপাল কি বুঝবে না এজন্য আমি অপরাধী নই। আমার একমাত্র অপরাধ হতে পারে আমি ভীরু, আত্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে দুর্বল। যে জন্য বড় জোর অনুকম্পা বোধ করতে পারে আমার ওপর, কিন্তু ঘৃণা করা তো উচিত নয়।

এতদিন সঙ্কোচে কুণ্ঠায় যা পারেনি মিলি আজ এই উপলক্ষে সেটা একবার যাচাই করে নেবার ইচ্ছে করল। গোপালের সর্বশেষ মনোভাব। হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে টেলিফোনটা তুলে নিল ও।

ঃ দৈনিক প্রতিনিধি অফিস? গোপাল গুপ্ত কি অফিসে আছেন?...দেখছেন না?...না না, কষ্ট করে খোঁজ করতে হবে না, ওকে দেখলে একটু দয়া করে বলে দেবেন যে করঞ্জিয়া লজ্ থেকে ফোন এসেছিল।...আচ্ছা, আচ্ছা, নমস্কার।

ফোনটা রেখে দিয়ে আবার কি যেন ভাবল মিলি। কি যেন একটা সিদ্ধান্তে এল ও। উঠে দাঁড়াল। পোষাক প্রসাধন ঠিকই ছিল, তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেটুকু যাচাই করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সিঁড়ির মুখে হরিহরের সঙ্গে দেখা। মিলিকে কোলে পিঠে করে মানুষ করা বৃদ্ধ হরিহর পরিচয়ের দিক থেকে এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্য হলেও অধিকারের দিক থেকে স্বীকৃত স্বজন। ওর চোখ দেখেই বুঝল মিলি হরিহর আতঙ্কিত।



সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল হরিহর, বেরুচ্ছ নাকি ?

মিলি একটু হাসার চেষ্টা করল, হ্যাঁ। একটা কাজ আছে।

কি কাজ ? আর কেউ গেলে হয় না ?

কেন বলতো ?

হরিহব আমতা আমতা করে। না, কি সব খবব-টবব শুনছি। এর ভেতর মেয়েদের পথে না বেরুনই উচিত।

মিলি হাসল এবাব। খুব ভয় পেয়ে গেছ বুঝি ? তুমি তো এক পা বাড়িয়েই আছ, তোমার আবাব এত ভয় কিসেব ? আমার তো বেশ মজা মজা লাগছে।

তারপর অভয় দেয় ওকে, কিচ্ছু ভয় নেই। আমি যাব আর আসব।

বলতে বলতেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় মিলি।

নিচের ড্রইংরুমে গম্ভীর মুখে পায়চারী করছিলেন মিঃ করঞ্জিয়া। মিলি জানে সূত্র হারান সমস্যার মুখে এভাবে পায়চারী করা বাবার অভ্যেস। আস্তে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় ও। মিঃ করঞ্জিয়া চোখ তুলে তাকান। মিলিকে দেখে এগিয়ে আসেন।

এই যে মিলি, আমি তোমাকেই ডেকে পাঠাতে যাচ্ছিলাম।

কোন কথা ছিল বাবা ?

হ্যাঁ। শোন, এ কদিন একেবারে বাড়িব বাইরে বেরুবেনা কিন্তু। চুপচাপ বাড়ি বসে থাকবে।

মিলি হাল্‌কা সুরে হাসল, তুমিও ভয় পেয়ে গেলে বাবা ?

করঞ্জিয়া সস্নেহে মেয়ের দিকে তাকালেন। ভয় কি নিজের জন্য মা, আমার আর কদিন !

মিলি সামান্য ইতঃস্তত করে। তারপর বলে ফেলে, কিন্তু আমি যে একটু বেরুচ্ছিলাম বাবা।

করঞ্জিয়া সামান্য অবাক হলেন। এর ভেতর ? কোথায় ?

মিলি আস্তে বলল, গোপালদের ওখানে। সংবাদটা যাচাই করে আসতে।

করঞ্জিয়া গম্ভীর হলেন। স্বরেও বিরক্তিটা চাপা থাকল না। কিন্তু সেজন্য ওর মত চুনোপুঁটি সাংবাদিকের কাছে গিয়ে কোন লাভ আছে? অনেক বড় সোর্সে আমিই চেষ্টা করছি সেটা।

গোপাল প্রসঙ্গে বাবার মন্তব্যে মনে মনে আহত হল মিলি। একটু জোর দিয়েই বলল, না হয় একটু খোঁজ খবর নিয়েই এলাম ওদের। তোমার কোন আপত্তি আছে এতে?

এই সরাসরি প্রশ্নে সামান্য বিব্রত বোধ করেন করঞ্জিয়া। না, তা ঠিক নয়, তবে কিনা, এই গোলমালের ভেতর—।

সহজ সুরে বলল মিলি, গোলমাল কোথায় দেখলে? সবাই একটু হকচকিয়ে গেছে মাত্র।

করঞ্জিয়া মিলির চোখে চোখ রাখলেন। ওর সিদ্ধান্তের দৃঢ়তাকে মেপে নিলেন বোধহয়। তারপর বললেন, বেশ, যাও তাহলে। কিন্তু ড্রাইভারকে সঙ্গে নিও। বেশী দেরী কর না।

মিলি ফিরতেই ডাকলেন আবার। গম্ভীর স্বরে বললেন, আর একটা কথা। এই ঘটনাটাকে একটা সাময়িক অধ্যায় বলেই মনে কর মিলি। মিথ্যে আতঙ্কে জীবনের কোন সিদ্ধান্তই এতে দ্রুত গ্রহণ বর্জন করতে যেও না। তাতে পরে—

মিলির দৃষ্টি দৃঢ় হল। বাবার চোখে চোখ রেখে গম্ভীর স্বরেই জবাব দিল, আমি এমন কিছু করতে পারি বলে কি তুমি আশঙ্কা করছ যা ভবিষ্যতে আমার অনুতাপের কারণ হতে পারে?

করঞ্জিয়া বাধা দিলেন, না, ঠিক তা নয়—।

মিলি একটু হেসে বলল; তোমার কোন ভয় নেই বাবা। তবে এ তিন দিন কোন প্রসঙ্গেই আমি নিজের সঙ্গে আর প্রতারণা করতে চাইনা। এ স্বাধীনতাটুকু তোমার কাছ থেকে আমি আবদার করেই চেয়ে নিচ্ছি।

বলে আর দাঁড়ালনা মিলি। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিঃ করঞ্জিয়া বেশ বুঝলেন, এ আবদারের প্রার্থনা নয়, আত্মপ্রত্যয়ের

ঘোষণা। মিলির কথা ভেবে সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেন তিনি।

পথে নেমে মিলি অবাক হল। গোটা শহরময় কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। পথে পথে মানুষের জটলা। রেডিওর সামনে সামনে উত্তেজিত ভীড়। ফুটপাথের ভীর মাঝে মাঝে পথে উপচে পড়ে গাড়ির পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। ড্রাইভাররা হর্ণের ওপর থেকে হাত সরানর অবকাশ পাচ্ছে না। বিচিত্র শব্দের ঐকতানে মাঝে মাঝে মুখর হয়ে উঠছে পথটা।

কিন্তু গোপালকে এসে পেলনা মিলি। একটু আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে ও। পাড়াপরশীর ভীড় হালকা করে ইতুরাও ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মিলিকে দেখে একটু অবাক হল ওরা।

মা বললেন, এস মিলি। এর ভেতরও সাহস করে বেরিয়েছ তো দেখছি।

একটু হাসল মিলি, অবশ্য চোখ ওর অপরিচিত কৃষ্ণাব ওপর। বলল, তবু একটা বৈচিত্র্য তো, বেশ মজা লাগছে।

মা সস্নেহে বললেন, তোমাদের আজকালকার মেয়েদের কিসে যে মজা আর কিসে মজা না, ঠিক বুঝিনা মা। আমি তো ঠিক মত গুছিয়ে কিছু ভাবতেই পারছিনা। শেষ পর্যন্ত ভেবে রেখেছি ভগবান যা করবেন তাই হবে।

কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বুঝলেন মা মেয়েটার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। চাপা বলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু চিন্তায় ভাবনায় আতঙ্কে মানসিক ভাবেও বিপর্যস্ত ও। মা কৃষ্ণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিলির। তারপর বললেন, চল, ওপরে যাই।

মিলি সুডোল মণিবন্ধ বাঁকিয়ে সময় দেখল একবার। বলল, না মাসীমা, আমি বসবনা। গোপালদার কাছ থেকে সংবাদটা জানতে এসেছিলাম, জেনে গেলাম। আপনারা যান, আমি ইতুর সঙ্গে একটু কথা বলে ফিরি। বাবা আবার চিন্তা করবেন।

কথার ফাঁকে ফাঁকে কৃষ্ণাকে বারে বারে দেখছিল মিলি। চোখে

চোখও পড়েছিল বার কয়েক। কৃষ্ণাও দেখছিল মিলিকে। সূক্ষ্ম গোপন একটা বোঝাপড়া চলছিল যেন চার চোখে। মেয়েরা সহজাত বোধ থেকে এসব দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারে। মা কি বুঝতে পেরেছেন ? ঠিক বুঝল না মিলি। কিন্তু এসব সহজাত বোধ থেকে কিছুটা দূরে বলে ইতুকে নির্ভয়ে আগলে রাখল ও। প্লেনের ঘটনাটার খুঁটিনাটি বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে কৃষ্ণা প্রসঙ্গে কিছুটা প্রাঞ্জল হবার চেষ্টা করল। কিন্তু ইতু ঠিক না বুঝে প্রসঙ্গান্তরে সরে সরে যেতে থাকায় শেষ পর্যন্ত স্পষ্টই জিজ্ঞেস করে বসল ও, ভদ্রমহিলার এখানে কোন আত্মীয় স্বজন নেই বুঝি ?

ইতু মাথা নেড়ে জানাল, না।

গোপালদার সঙ্গে প্লেনেই পরিচয়, না, আগেরই পরিচয় ? এক প্লেনেই যাচ্ছিল ?

ইতু এই প্রশ্নের জটিলতায় সামান্য ইতঃস্তত করে বলল, তা ঠিক বলতে পারছি না। তবে দাদা না থাকলে ভদ্রমহিলা ভীষণ বিপদে পড়তেন।

মিলির ভুরুতে টান পড়ল। আর একবার মণিবন্ধে সময় দেখতে দেখতে বলল, নাও পড়তে পারতেন। ভদ্রমহিলাকে বেশ চটপটে বলেই মনে হয়। আচ্ছা আমি চলি। দাদা এলে বল যে আমি এসেছিলাম।

রাস্তার ভীড় কি আরো বেড়েছে ? অবশ্য চোখ ভীড়ে থাকলেও মন ছিল ওর কৃষ্ণায় আবৃত। মেয়েটি বেশ সুঠাম। আমার মত ক্ষিণাঙ্গী নয়। আত্মীয় স্বজনরাও দুঃখ করে বলে, এত খাস-দাস সব যায় কোথায় ? গোপাল একবার এক হালকা মুহূর্তে বলেছিল না, তুমি কি ক্রমে বিদেহী হবার তপস্যায় রত ? পুরুষ কিন্তু বিমনা মেয়ে তবু সহ্য করতে পারে, কিন্তু বিদেহী মেয়ে নয়। অবশ্য ওটা ঠাট্টাই গোপালের। গোপাল আসলে আকর্ষিত হয়েছিল আমার মনের জন্যই। দুর্বলতম কোন মুহূর্তেও দেহের প্রতি ওর কোন আকর্ষণের

প্রমাণ নেই। বরং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক মুহূর্তে ও একদিন একটা 'আশ্চর্য সুন্দর কথা বলেছিল, তোমার দেহটাকে নিছক তোমার মনের মলাট বলে মনে হয় আমার। তার বেশী কিছু নয়। মলাটের প্রতি আকর্ষণ স্থূলতার পরিচয় মিলি, সুরুচির নয়।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রুচির কি দান দিতে পেরেছি আমি? বাবার অনিচ্ছাই কি সব, আমার নিজের কোন দয়িত্ব নেই এতে। গোপালের শেষ চিঠিটার উত্তর পর্যন্ত দেইনি আমি। কিন্তু কতগুলো বানান মিথ্যে ছাড়া, আমার নিরুপায় অসহায়ত্বের প্যানপ্যানানি ছাড়া, কিছু মূল্যহীন স্তোকবাক্য ছাড়া আর কী বা দিতে পারতাম ওর উত্তরে।

বড় রাস্তার ভীড় এড়ানর জন্য ড্রাইভার একটা ছোট গলিতে ঢুকে পড়ল। গলির ভেতর বড় রাস্তার মত ভীড় নেই। কিন্তু বাড়ীর সামনে, রকে বারান্দায় দল বেঁধে আলোচনা চলছে। গোপালকে আর একবার ফোন করবে? খবরটা পেলে কি নিজে থেকে আসত না ও?

সংবাদের নেশায় ততক্ষণে ভীড়ের স্রোতে ভেসে পড়েছে গোপাল। সাংবাদিক মনকে সজাগ রেখে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কৌতুকে, কৌতূহলে মাঝে মাঝে ভীড়ের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ছিল ও। প্রয়োজনবোধে এটা ওটা নোট করে নিচ্ছিল। কিন্তু গোটা দেশটাই যেন সংবাদ হয়ে উঠেছে! সংবাদ নির্বাচনে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল গোপাল।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ওর গোটা শহরটাই পথে নেমে এসেছে। অবশ্য আইন ও শৃঙ্খলা এখনও ভেঙ্গে পড়েনি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলছিল জনতা। আতঙ্কের সঙ্গে একটা রোমাঞ্চও অনুভব করছিল। বিরাট একটা উত্তেজক নাটকের দর্শক যেন সবাই। পুরো চেতনা দিয়ে একথা কেউই অনুভব করতে পারছিল না, অথবা বিশ্বাস করতে চাইছিল না যে, সত্যিই আর মাত্র দু' তিন দিন পৃথিবীর আয়ুস্কাল। মৃত্যুর এই বিকট ভয়ঙ্কর মুখটাকে সকলেই মুখোশ ভেবে নিয়ে তৃপ্তি পেতে চাচ্ছিল।

হাঁটতে হাঁটতেই হঠাং কিছুটা দূরে কয়েকটা কাগজ নিয়ে প্রচণ্ড

হুরোহুরি চোখে পড়ল গোপালের। দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে বুঝল, ওদের বিপক্ষ দৈনিকের একটা টেলিগ্রাম বেরিয়েছে। কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে কাগজ নিয়ে। হকারটা কোনক্রমে ভীড়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে সাইকেলটা নিয়ে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু ভীড়ের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ হল গোপালের, শেষ পর্যন্ত কাগজের পূর্ণাংশ কারো ভাগ্যেই জুটবে না বোধহয়। অথচ এ মুহূর্তে প্রতিটি সংবাদের অপরিসীম মূল্য। বিশেষ করে প্রতিপক্ষের কাগজ বলে কৌতূহলটা বেশী ওর। তাই অগ্রণী হয়ে গোপাল ভীড়ের ভেতর ঢুকে গেল। এলোপাথারি লোকগুলোকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

কি হচ্ছে দাদা, আপনারা কি পাগল হয়ে গেলেন না কি? বরং একজন জোরে জোরে পড়ে দিন না তাহলেই তো খবরটা জানা যায়।

শেষ পর্যন্ত গোপালের প্রস্তাবটাই কার্যকরী হল। জনৈক ভদ্রলোক সামান্য ছেঁড়া টেলিগ্রামটা নিয়ে সামনের দোকানের সিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলেনঃ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে পাইলটদের কাছে ঈশ্বরের নামে অনুরোধ জানান হয়েছিল ওদের বিরত হবার জন্য। কিন্তু পাইলটরা জানিয়েছেন যে, ঈশ্বরে তাঁদের বিশ্বাস থাকলেও কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর তাঁদের আর কোন আস্থা নেই। তাঁরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মূল সংবাদটা পড়ে ভদ্রলোক বাকী অংশে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, আর সব মোটামুটি পুরোন সংবাদই এদিক ওদিক করে বলা।

ভদ্রলোক নেমে আসতেই নিস্তব্ধ ভীড় আবার সরব হয়ে উঠল। বিভিন্ন মন্তব্যে টীকা টিপ্পুনিতে মুখর হয়ে উঠল।

সামনে একটা পোষ্টঅফিস দেখে গোপাল সেদিকে এগিয়ে গেল। সেখান থেকে সরাসরি সম্পাদকের কাছে ফোন করলঃ আমি গোপাল ফোন করছি স্যার। এইমাত্র ওদের একটা টেলিগ্রাম বেরিয়েছে দেখলাম পাইলটদের কাছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিউজ দিয়ে। ওটা কি

কনফার্মড্ নিউজ না ম্যানুপুলেটেড্ ?···কনফার্মড্ ?···ও, আমাদেরও নেক্সট্ ইস্যুটা কিছুক্ষণের ভেতরই বেরিয়ে যাচ্ছে ?···হ্যাঁ···হ্যাঁ···আমিও নিউজ্ পিক্আপ-এর আপ্রাণ চেষ্টা করছি।···ফোন ?···কোত্থেকে ?··· ও করঞ্জিয়া লজ ?···আচ্ছা···হ্যাঁ, ঠিক আছে কিছুক্ষণের ভেতরই অফিসে যাচ্ছি একবার।

করঞ্জিয়া লজের ফোন! ঠিক বুঝতে পারেনা গোপাল কে ফোন করতে পারে। মিঃ করঞ্জিয়া ? কোন সংবাদের জন্য, না, কোন কাজের জন্য ? কিন্তু এর ভেতরই কি ভদ্রলোক এতটা আতঙ্কিত হবেন যে নিজে আগ বাড়িয়ে গোপালকে ফোন করবেন ? ওঁর ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ, করঞ্জিয়া পরিবারের মর্যাদা, আরো যেন কি কি শব্দ আছে, সেগুলো কিছুটা নিস্তেজ হয়ে যায় না তাতে ? তবে কি মিলি ? গোপালের চোখে মুখে সামান্য দৃঢ়তা ফোটে। কি যেন ভাবে ও গভীরভাবে। তারপর সিদ্ধান্তে আসে, যাবে। এবার তো কোন প্রার্থনা নিয়ে যাচ্ছে না ; সাংবাদিকের পূর্ণ মর্যাদা বহন করে নিয়ে যাবে ও। বর্তমান সংবাদ ছাড়া ব্যক্তিগত কোন প্রশ্নকে প্রশ্রয় দেবে না। না মিলি, না করঞ্জিয়া, কাউকে না। কিন্তু এই চরম আতঙ্কের দর্পণে ঐ আভিজাত্যমণ্ডিত মুখগুলোর চেহারা প্রত্যক্ষ দর্শনের এই সুযোগও ছাড়বে না।

খালি ট্যাক্সী পেলনা গোপাল। কিন্তু অল্পায়াসেই একটা প্রাইভেট কারে লিফ্ট পেয়ে গেল। কলকাতার জীবনে এত সহজ লিফ্ট-এর কথা স্মরণ করতে পারল না ও।

গেটের দরোয়ান চিনত গোপালকে। স্যালুট করে উঠে দাঁড়াল। আগন্তুককে প্রবেশ পথেই তাঁর গুরুত্ব অনুযায়ী নিঃশব্দ যান্ত্রিক অভ্যর্থনা জানান ওর নির্দৃষ্ট কর্মসূচী। আগ বাড়িয়ে কোন কথা বলার অধিকার ওর এক্তিয়ার বহির্ভূত। কিন্তু আতঙ্কিত লোকটি আজ ওর অধিকারের সীমা পেরিয়ে জিজ্ঞেস করে বসল, বাবু, নতুন কুছ্ খবর আছে ?

মাথা নাড়ল গোপাল, না।

এবার হাত জোর করে অনুরোধ জানাল ও, বাবুকে একটু বলিয়ে

দিন না তিন রোজকো লিয়ে ছুটি মঞ্জুর করতে। বালবাচ্চা সব দেশে পড়িয়ে আছে, এক দফে—।

গোপালের এখানে সময় নষ্ট কবার মত ধৈর্য ছিল না। মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে গেল তাই, আচ্ছা, বলব।

বিরাট লন্‌টা বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়েই পার হল গোপাল। কিন্তু বারান্দায় উঠে একটু ইতঃস্তত করল। মিঃ করঞ্জিয়াই ফোন করেছিলেন কিনা কে জানে? আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে গেলে আবার রেগে যাবেন নাতো? হয়তো ষ্টেনোর সামনেই অপমানকর কোন মন্তব্য করে বসবেন। আজ অবশ্য উত্তর দেবার মত সাহস আছে গোপালের, কিন্তু তাতেও অপমানটা তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। স্টেনোর কাজ শেষ করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করল গোপাল।

সিঁড়ির মুখে নিজের চেয়ারে বসে স্টেনোকে ডিক্‌টেশন্ দিচ্ছিলেন মিঃ করঞ্জিয়া। এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা কাগজপত্র সই করছিলেন। বাইরে থেকে আসা ফোন রিসিভ করছিলেন।

সামনে দাঁড়িয়ে নোট নিচ্ছে বাড়ির স্টেনো মিঃ দত্ত। বয়স বছর চল্লিশেক হবে। কিন্তু রুগ্নতার জন্য অনেক বেশী মনে হয়। ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যেই কেমন যেন ভীরু অসহায়-এর একটা ছাপ আছে। মৃত্যুর পূর্বেই যাবা পরিবেশের বিরূপতায়, বিভিন্ন আতঙ্কে হাজার মবণে মরে থাকে ভদ্রলোককে তাদেরই একজন বলে মনে হয়। এবং, নিজের কিছু অভিজ্ঞতায় জানে গোপাল, মিঃ করঞ্জিয়াও ওর এই দুর্বলতাকে সুদে আসলে কাজে লাগান। জীবিকার পরিচয়ে দত্ত স্টেনো, কিন্তু এ বাড়ীর ভিন্নতর বহু কাজ ওর করতে হয়। জীবিকার ভয়েই। ওর কেমন যেন একটা ধারণা আছে, মিঃ করঞ্জিয়া ওর চরম দারিদ্রের সময় ওকে চাকরিটা দিয়েছিলেন বলে, নাহলে ওর সপরিবারে না খেয়ে মরতে হত। এবং এ চাকরিটা গেলেও নতুন জীবিকা সংগ্রহের সামর্থ নেই ওর। মিঃ করঞ্জিয়াও সুচতুরভাবে ওর এই ভয়টাকে লালিত হবাব সুযোগ দিয়েছেন বলেই সন্দেহ গোপালের।

করঞ্জিয়া ডিক্টেশন শেষ করে চিঠিগুলো সই করে দত্তর হাতে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, পরের চিঠি দুটো টাইপ হয়েছে?

স্তিমিত স্বরে জানাল দত্ত, একটা হয়েছে, আর একটা—

করঞ্জিয়া বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ইউ আর ট্যু স্লো, ট্যু স্লো।

মিন মিন করে বলল দত্ত, হাত খালি পাচ্ছি না, তাই—

এবার চাপা ধমক দিলেন করঞ্জিয়া, লেম্ এক্সকিউজ দেবে না।

আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন করঞ্জিয়া, হাতের পাশে ফোনটা বেজে উঠতে সেটা তুলে নিলেন তিনি।

ঃ হ্যাঁলো···ও ম্যানেজার বাবু?···না না, কোন রকম প্রশ্রয় দেবেন না। ষ্ট্রাইকাররা যদি ভেবে থাকে বর্তমান ঘটনায় আমি আন-নার্ভড্ হয়ে গেছি তাহলে খুব ভুল করবে। ওদের মনে করিয়ে দিন, ওবকম দু তিনটে করঞ্জিয়া ষ্টিল ওয়ার্কস ষ্ট্রাইকে বন্ধ হয়ে গেলেও আমার বিশেষ কিছু এসে যায় না···না না···অসম্ভব। আনকণ্ডিশনাল সারেণ্ডার ছাড়া আমি কিছু বিবেচনা করতে রাজী নই।

ফোনটা সশব্দে রেখে দিলেন তিনি। তারপর দত্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কিন্তু আজ বাড়ি যেতে পারছো না। এখানেই সব ব্যবস্থা করে দিতে বলেছি। অনেক জরুরী কাজ আছে। আমি ড্রাইভারকে দিয়ে তোমার বাড়ি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।

সামান্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল দত্ত, কিন্তু আমার—

মিঃ করঞ্জিয়া ধমকে উঠলেন, ডোন্ট আরগু।

আমার মা খুব অসুস্থ স্যার।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে গম্ভীর স্বরে বললেন মিঃ করঞ্জিয়া, লেট অল গো টু হেল্। ইউ মাস্ট স্টে, ইট্স মাই অর্ডার।

দত্তর চোখদুটো হঠাৎ যেন একবার জ্বলে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল আবার। তারপর নত নমস্কারে ঘর থেকে আস্তে বেরিয়ে গেল। মিঃ করঞ্জিয়া আবার ফোন তুলে নিলেন। বিখ্যাত একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মকে রিং করলেন ওঁদের একজন রিপ্রেজেনটেটিভকে

পাঠানর জন্য। সামনা সামনি কিছু জরুরী আলোচনা আছে।

গোপাল এবার ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবতে ভাবতেই পেছনে গাড়ির শব্দে ফিরে তাকাল। সিঁড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামল। ভেতর থেকে গম্ভীর মুখে নেমে আসে মিলি। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওর দিকে এগিয়ে গেল গোপাল।

তোমাদের বাড়ি থেকে কে নাকি আমাকে ফোন করেছিল?

মিলি বারান্দায় উঠতে উঠতে বলল, আমি।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ?

সংবাদটা যাচাই করতে। অফিসে তোমাকে না পেয়ে তাই তোমাদের বাড়িতেই গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই ফিরছি।

গোপাল তরল স্বরে বলল, তোমার সময়ের অপচয়ের জন্য দুঃখিত।

মিলি ওর দিকে তাকাল একবার। বলল, না, অপচয় হয়নি। তোমাকে না পেলেও সংবাদটা যাচাই করে এসেছি তোমার আকাশ-সঙ্গিনীর কাছ থেকে।

গোপাল এ ইংগিতে সামান্য আহত হয়। কিন্তু কোন মন্তব্য করে না। কথা বলতে বলতে ওরা মিলির ঘরে আসে। সামনের চেয়ারটায় বসে বলল গোপাল, ও, আলাপ হয়ে গেছে?

মিলি ভ্যানিটি ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, হ্যাঁ, আলাপ করে এলাম। ভারী সুন্দর মেয়েটি। তোমার সংগ্রহের তারিফ করতে হয়।

এতক্ষণ যে ইংগিতটা আভাসে আবৃত ছিল, এবার সেটা স্পষ্টো-চ্চারিত হল। মনে মনে বিরক্ত হয় গোপাল। ওর সব অধিকার অস্বীকার করে নিজের অধিকারটুকু অক্ষুণ্ণ রাখার মিলির এই স্বার্থপর এবং অশোভন প্রচেষ্টার কোন অর্থ খুঁজে পায় না ও।

একটু শ্লেষের সঙ্গে বলে তাই, এ প্রশংসাটুকু অবশ্য আমার প্রাপ্য নয়। ও স্বয়ং সংগৃহীতা।

একটু বাঁকা হাসল মিলি। স্বয়ং সংগৃহীতা হলেও তোমার অনুগ্রহ

বঞ্চিতা নয় নিশ্চয়ই।

এটা কি তোমার অভিযোগ? গোপাল গম্ভীর হল।

মিলি গম্ভীর স্বরে বলল, না, বন্ধু হিসেবে সামান্য--সচেতন করে দেবার চেষ্টা মাত্র।

এখনও এই বন্ধুত্বের দাবীতে বিস্মিত হয় গোপাল। না কি অভিজাত মন দেওয়া নেওয়া খেলার এই-ই নিয়ম। কোন কিছুকেই শাশ্বত বলে স্বীকার না করার, সব কিছুকেই টেক-ইট-ইজি পদ্ধতিতে গ্রহণ করার নমনীয়তা।

গোপাল শ্লেষ মিশিয়ে বলল, আমি তো ভেবেছিলাম এ দাবীটা দীর্ঘ দিন প্রশ্নের মুখে তুলতে তুলতে আজ বাতিল হয়ে গেছে। তাহলে বন্ধু হিসেবেই বলতে হচ্ছে, এ তোমার অনধিকার চর্চা! বিপদগ্রস্থা কোন মহিলাকে আমি সাহায্য করব কিনা—

হঠাৎ ওর কথার মাঝখানেই অধৈর্যভাবে বলে ওঠে মিলি, কিন্তু সাহায্যেরও প্রকার ভেদ আছে। তুমি ইচ্ছে হলেই ওকে কোন মেয়েদের হোস্টেলে তুলে দিতে পারতে। অথবা কোন—

এবার গোপালও ধৈর্য রাখতে পারল না। টেনে টেনে বেশ জোর দিয়েই বলল, কিন্তু আমার আশ্রিতা কোন মহিলা প্রসঙ্গে আমার কি কর্তব্য সে নির্দেশ আমি আর কারো কাছে নিতে প্রস্তুত নই মিলি। যাকগে, দুজনেই ক্রমে একটা অপ্রীতিকর আলোচনায় জড়িয়ে পড়ছি। তুমি আমার চোখে বড় থাক সেটাই আমার কাম্য। তোমার আর কিছু বলার ছিল?

মিলি শ্লেষের সঙ্গে বলল, থাকলেও তোমার আর সময় হবেনা সেটুকু মুখ ফুটে বলতে এত সঙ্কোচ বোধ করছ কেন?

গোপাল উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তুমি যে কোন অর্থেই বলনা কেন, সত্যিই এখন আমার সময় সংক্ষেপ।

মিলি গোপালকে বাধা দিল না। একটা নিরুদ্ধ ক্ষোভ, অভিমান আর জেদে ওর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একবার। গোপালের এই

অপরিচিত দৃঢ়তায় বিস্মিত হয়েছে ও।

অফিসের সামনের ভীড় আরো অনেক বেড়েছে। সর্বশেষ সংবাদের জন্য উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত ভীড়। শেষ টেলিগ্রামটা বোর্ডের ওপর পেস্ট করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে গেটের সামনে। সেটা স্বচক্ষে দেখবার জন্য, দাড়ি কমা সহ পড়বার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে সবার ভেতর। গোপাল কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করল ভীড়ের ভেতর চাওয়ালা, বাদামওয়ালারা ঘুরে ঘুরে ফেরি করে বেড়াচ্ছে। গোপাল ভীড় সরিয়ে অফিসের ভেতর ঢুকে গেল।

অফিসের হল ঘরে বেশ কয়েকটা চেয়ার ফাঁকা। এ শিফ্টএর বেশ কিছু লোক আসেনি বোধহয়। আদৌ আসবে কিনা কে জানে। যারা টেবিলে বসে কাজ করে যাচ্ছে তাদেরও মুখ গম্ভীর। আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। টেলিপ্রিন্টারের ওপর ঝুঁকে আছে কয়েকজন। এখানে ওখানে নিজেদের ভেতর চাপা আলোচনা চলছে, গোটা অফিসটায় কেমন একটা থমথমে ভাব। গোপাল চারদিকে চোখ বুলিয়ে সম্পাদকের ঘরের দিকে এগোয়।

গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে সম্পাদক। বারে বারে ডায়াল করেও ফোনের কানেকশন্ না পেয়ে বিরক্ত। গোপালকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন।

কোন নতুন সংবাদ আছে ?

সেরকম কিছু নয়। বাইরের কিছু খুচরো খবর আর রিএ্যাকসন্ মাত্র।

সম্পাদক আর একবার ডায়াল করতে করতে বললেন, ঠিক আছে, দিয়ে যাও।

তারপর একটু থেমে বললেন, তোমাকে আরো কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিতে হবে হয়তো। তুমি নিজে ঠিক আছ তো ?

গোপাল নতুন দায়িত্বের কথায় উল্লসিত হল। সামান্য উত্তেজনা বোধ করল। ও কাজ চায়। কাজ নিয়ে ওর সাংবাদিক সততা,

কর্তব্যনিষ্ঠা এবং শক্তি প্রমাণ করার সুযোগই চায়।

গলায় দৃঢ়তা এনে বলল ও, কাগজ যতক্ষণ আছে আমি আছি স্যার। আমার ওপর আপনি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন।

সম্পাদক খুশী হলেন। এতদিন লক্ষ্য না করা এই কনিষ্ঠ কর্মীটির কর্তব্যনিষ্ঠায় তৃপ্তি বোধ করলেন। বললেন, ধন্যবাদ। আমি একটু বাদেই তোমাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

গোপাল বেরিয়ে টেলিপ্রিন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় একবার। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে কয়েকজন যন্ত্রটার ওপর। প্রতি টুকরো সংবাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রতিটি শব্দ এখন মূল্যবান। প্রতিটি কমা সেমিকোলন গুরুত্বপূর্ণ।

বার্তা সম্পাদক সংবাদধারা থেকে কিছুটা অংশ চোখের সামনে তুলে ধরে দেখছিলেন। পেছনে দাঁড়িয়েই গোপাল জিজ্ঞেস করল, নতুন কিছু সংবাদ আছে?

ভদ্রলোক সংবাদে চোখ বুলাতে বুলাতে বললেন, কিছু ফরেন্ নিউজ। পৃথিবীর চারদিকে রিঅ্যাক্শন শুরু হয়ে গেছে। কোন কোন জায়গায় ল-এণ্ড-অর্ডার ব্রেক করার মুখে। ইভাকিউয়েসনও শুরু হয়েছে দু'একটা শহরে।

গম্ভীর মুখে গোপাল গিয়ে নিজের টেবিলে বসল। কি লিখবে ভাবতে ভাবতে পেন খুলল। বার্তা সম্পাদকের দিকে তাকাল একবার। সরা-সরি সম্পাদকের সঙ্গে এই যোগাযোগে আবার চটছে না তো কেউ? কিন্তু ওতো কাউকে ডিঙ্গিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। সম্পাদকই সরাসরি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য বলে দিয়েছেন ওকে। নিজের মনেই শেষ পর্যন্ত ভাবল আবার, দূর; শিয়রে সংক্রান্তি, এখন অত নিয়ম কানুনের দিকে নজর রাখার সময় আছে কারো! কাগজটা ভাল মত ঠিক মত বের করাটাই এখন প্রধান দ্রষ্টব্য।

লেখাটা প্রায় শেষ করার মুখে পাশে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে মনে হল গোপালের। চোখ তুলে তাকাল ও। গম্ভীর মুখে সহকর্মী অশোক

দাঁড়িয়ে লেখাটা দেখছে।

গোপাল হালকা ভাবেই জিজ্ঞেস করল, কি খবর ?

সামান্য ব্যঙ্গের হাসি ফুটল অশোকের ঠোঁটে। বলল, খবর তো এখন আপনার। দেখছেন, লিখছেন, স্পেসাল আর্টিকেল নিয়ে টেলি-গ্রাম বেরুচ্ছে।

ওর বিদ্রূপ গায় মাখল না গোপাল। সহজ ভাবেই বলল, ওতো কাকতালীয় ব্যাপার। আপনি ঐ প্লেনে থাকলে আপনার অভিজ্ঞতার কথাই সারস্বরে বেরুত।

শ্লেষের সঙ্গে বলল অশোক, কাক কিনা জানি না, তবে ব্যাপারটাকে প্রথম থেকেই আমার কিছুটা তালীয় বলে মনে হচ্ছিল।

গোপাল ঠিক বুঝতে পারে না। ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, মানে ?

কিছু তিলকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাল করা হয়েছে লেখাটায়। তবু লিখে যান, লিখে যান। আপনার রাশিফলটা ভালই মনে হচ্ছে। যে গতিতে এগোচ্ছেন তাতে ভবিষ্যতে ঐ চেয়ারে দেখলেও অবাক হব না।

ইংগিতে সম্পাদকের ঘরটা দেখিয়ে দেয় অশোক। এবং গোপাল কোন জবাব দেবার আগেই ওর সামনে থেকে সরে যায়।

অশোকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল গোপাল। রাগ নয়, ক্ষোভ নয়, ওর জন্য ছোট্ট একটা সহানুভূতি অনুভব করল শুধু।

লেখাটা দিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে জরুরী কিছু আলোচনা করে আবার পথে নামল গোপাল। এবং লক্ষ্য করল আইন ও শৃঙ্খলা এতক্ষণে সামান্য টাল খেয়েছে। নিয়ম কানুনের ধার ধারছেনা মানুষ। মাঝে মাঝে পথ জাম করে দাঁড়িয়ে আছে। যানবাহনের দিকে নজর নেই। যথেষ্ট ধৈর্য সহকারে ভীড় নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই বিফল হচ্ছে।

চার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোতে থাকে গোপাল। সংবাদের

নেশা পেয়ে বসেছে ওকে। অদম্য এই নেশাই ওকে জীবনের এই পেষায় এনে ফেলেছে। অনেক ভাল চাকরি উপেক্ষা করেও ও যখন কাগজ অফিসে চাকরি নিল তখন অনেক বিষয়ী হিতৈষী ওর জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। ও নেশা বাবা দুদিনে কেটে যাবে, তখন বুঝবে আর দশটা চাকরির মতই ওটাও একটা চাকরিই। বরং অন্য সব অফিসে হয়তো এক ঈশ্বরের ভজনা করলেই মোক্ষ লাভ করা যায় কিন্তু পত্রিকা অফিসে শতেক ইশ্বরের ভজনায় হিমসিম খেয়ে যেতে হবে। সেই সব ঈশ্বরের উত্থান পতনের ওপর তোমার উত্থান পতন নির্ভর করবে। এবং সর্ব ঈশ্বর তোষণের যে গূঢ় তান্ত্রিক মন্ত্রতন্ত্র ঝানু সাংবাদিকদেব অনায়স-লব্ধ, তোমার বৈষ্ণব চরিত্রে তা আদৌ সহজ লভ্য হবে বলে তো মনে হয় না। তখন ত্রাহি ত্রাহি রব ছেড়েও মুক্তির পথ খুঁজে পাবেনা।

হিতৈষীদের বৈষয়িক জ্ঞান যে পাকা সেটা ও এ-কয় বছরের ভেতরই বেশ উপলব্ধি করেছে তাদের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাওয়ায়। কিন্তু একটি বিষয়ে তাদের ভবিষ্যতবাণী ব্যর্থ হয়েছে। ত্রাহি ত্রাহি রব ছেড়ে মুক্তির পথ খুঁজতে হয়নি ওর। ববং সাংবাদিক জীবনের বৈচিত্রে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় আবো বেশী নেশাগ্রস্থ হয়েছে। সংবাদপত্র অফিসের ঈর্ষা, দৈন্য, গ্লানি ওর সহজাত নির্লিপ্তিব বর্ম ভেদ করে ওকে আঘাত করতে পারেনি।

ওব ওপর অর্পিত কর্তব্যের বোঝাটুকু সানন্দে বহন করেই তৃপ্তি বোধ করেছে ও। এবং অপেক্ষা করেছে বৃহত্তর কোন দায়িত্বের, যা সাফল্যের সঙ্গে পালন করে ও প্রমাণ করতে পারে, সাংবাদিকতা ওর শুধু নেশাই নয়, এ বৃত্তিতে ওর স্বকীয়তা আছে, শক্তি আছে।

আশেপাশের অনেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। কোন কোন দোকানের দরজা আধ-ভেজান। সামনে একটা খোলা রেষ্টুরেন্ট দেখে মনে হল একটু চা খেলে মন্দ হত না।

খালি টেবিল পেলনা ভেতরে, একটা খালি চেয়ার টেনে বসে পড়ল গোপাল। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। প্রতিটি টেবিলের

আলোচ্য বিষয় বর্তমান সংকট। সম্ভব অসম্ভব নানা রকম গবেষণা চলছে টেবিলে টেবিলে। দু একজন মাত্র গভীর অন্যমনস্কতায় নিঃশব্দে চা খাচ্ছে।

গোপাল চা এবং কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে নিঃশব্দে বিভিন্ন টেবিলের আলোচনাগুলো শুনে যাচ্ছিল। টেবিল ভেদে আলোচনার প্রকার ভেদ লক্ষ্য করছিল ও।

আরে দূর, শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না দেখিস।

ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছে, না, নতুন ধরণের কোন স্টাণ্ট-ফাণ্ট কে জানে।

হলেই বা ক্ষতি কি, যা সুখে আছি!

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিড়বিড় করতে করতে টেবিল থেকে উঠে গেলেন, কলি কাল পূর্ণ হল, বুঝলে ভায়া, কলি কাল পূর্ণ হল। এত পাপ সয় না। সয় না।

আচ্ছা, পাইলটরা যে আমাদের বিফুল করছে না তার প্রমাণ কি?

দৈনিক 'প্রতিনিধি'র প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণটা পড়ে দেখিস।

গোপাল নিজের উল্লেখে চাপা উত্তেজনা বোধ করল। নিঃশব্দে ফিরে তাকাল পাশের টেবিলের দিকে।

আরে বাবা, সেও তো শুনে এসেছে, বোমাগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে আসেনি।

কোন্ দেশ থেকে চুরি গিয়েছে, কি ধরণের এক্সপ্লোসিভ্, নতুন কিছু গোপন আবিষ্কার কি না, সে সব কিছুইতো পরিষ্কার জানা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা কেমন যেন চেতাবাণীর নতুন সংস্করণ বলে মনে হচ্ছে না?

কিন্তু কোন দেশ তো ব্যাপারটাকে ভাঁওতা বলে প্রতিবাদও করছে না? তাদের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট তোমার আমার চেয়ে কম বুদ্ধিমান নয় নিশ্চয়ই।

গোপালের চা এল। ও চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে সকৌতুকে লক্ষ্য করল সামনের টেবিলের অন্যমনস্ক এক ভদ্রলোক গ্লাসের গায়ে চায়ের কাপের হ্যাণ্ডেল হাতড়াচ্ছেন।

লিও জিলার্ড শালা এখনও বেঁচে আছে?

নামটা শুনে ঔৎসুক্যের সঙ্গে সামনের টেবিলে চোখ ফেরায় গোপাল। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার যুবক দুটির ওপর চোখ বুলিয়ে নেয় একবার। চার পাশের আলোচনার ভেতর ওদের আলোচ্য বিষয়টি কিছুটা বেমানান মনে হয় ওর। কারণ, গোপাল নিশ্চিত, এ রেস্তোরার বোধ হয় কেউই লিও জিলার্ড নামটা জীবনে শোনেনি পর্যন্ত। জানে না যে, আমেরিকা প্রবাসী এই হাঙ্গেরিয়ান বৈজ্ঞানিকই সর্বপ্রথম পারমাণবিক শক্তির সামরিক প্রয়োগের সম্ভাবনার কথাটা আমেরিকার রাষ্ট্রনেতাদের মাথায় ঢুকিয়েছিলেন। এবং নিজের একক চেষ্টা ফলপ্রসূ নাও হতে পারে ভেবে বিখ্যাত আইনষ্টাইনকে মুখপাত্র করে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে তাঁর পরিকল্পনা ও আবেদন পৌঁছে দিয়েছিলেন। আজ ভয়াবহ পারমাণবিক যুগ বলতে যা বোঝায় তার সূত্রপাত বোধহয় সেই দিনটিই।

দ্বিতীয় যুবকটি প্রতিবাদ জানাল, বেঁচে আছেন কিনা জানি না, কিন্তু জিলার্ড উপলক্ষ মাত্র। ঠিক সামরিক দিকটার কথা মাথায় না এলেও, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মান কোন্ দেশটা পরমাণু গবেষণার দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল? কারো না কারো মাথায় এটা আসতই। তাছাড়া জিলার্ড একদিক দিয়ে মানুষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই, নাজিজিমের বীভৎসতায় আতঙ্কিত হয়েই ব্যাপারটা করেছিলেন। ওঁর ধারণা ছিল জার্মানরা ইতিমধ্যে এদিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সুতরাং ওদের আগেই অস্ত্রটা মিত্র শক্তির হাতের মুঠে না এলে হিটলারকে রোখা যাবে না।

প্রথম যুবকটির কথা শুনে বোঝা গেল সেও ব্যাপারটা জানত, কিন্তু উত্তেজনার বশেই মন্তব্যটা করে ফেলেছে। গম্ভীর মুখে বলল ও,

তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু উদ্দেশ্য যাই থাক, অপরাধটা এতে লাঘব হচ্ছে না। ওঁর আগে যদি জার্মানের হাইসেনবার্গ, উৎসাকার বা অটোহান প্রস্তাবটা হিট্‌লারের কাছে পৌঁছে দিত আজ তাদেরই আমি সোচ্চারে শালা বলতে দ্বিধা বোধ করতাম না।

সঙ্গী যুবক যেন কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দোকানের রেডিও সরব হল। কোলাহল মুখরিত রেষ্টুরেন্টটা মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ঃ পশ্চিমী শক্তিজোট থেকে পাইলটদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, দু ঘণ্টার ভেতর নেমে না এলে ওদের বলপ্রয়োগ করে নামান বা ধ্বংস করা হবে বলে। পাইলটরা সে রকম কোন প্রচেষ্টা থেকে ওদের নিরস্ত হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। না হলে তিন দিন নয়, এই মুহূর্তেই বোমাগুলো ওরা কাজে লাগাবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন।

নতুন করে একটা আতঙ্কের স্রোত বয়ে যায় শ্রোতাদের ভেতর। তাহলে কি সব চেষ্টাই বিফল হবে? মৃত্যু কি তাহলে নিশ্চিত? পুরো জিনিষটাই কেমন যেন খেলা খেলা মনে হচ্ছিল গোপালের। মঞ্চের নাটকের মত। তবু এ ঘোষণার পর গোপালের ভেতরও ছোট্ট একটা আতঙ্ক দেখা দিল। সত্যিই কি আকাশের ওরা শেষ পর্যন্ত এই চরম পাগলামি করে বসবে? না কি নিছক ভয় দেখাচ্ছে?

নিঃশব্দে দামটা মিটিয়ে বেরিয়ে এল গোপাল।

ট্রাম বাসের চলাফেরা অনিয়মিত হয়ে উঠেছে। ভীড়ের চাপে বন্ধকতায় প্রায়ই দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছে। প্রাইভেট্ গাড়ি ও ট্যাক্সী ছুটাছুটি করছে চার দিকে।

একমাত্র নিরুদ্বেগ বোধহয় বাচ্চারা। মজা পেয়ে ওরাও দল বেঁধে পথে নেমে পড়েছে। নিষেধ করার মত অভিভাবকরা অনেকেই পথে। নিজেদের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী সংবাদগুলো নিয়ে খেলছে ওরা।

হাঁটতে হাঁটতে জিলার্ডের কথাটা আবার মনে পড়ে গোপালের। এবং সে প্রসঙ্গেই বৈজ্ঞানিকদের মানবতাবোধ এবং মারণাস্ত্র প্রসঙ্গে তাঁদের দায়িত্বের প্রশ্ন।

আজকের এবং আগামী দিনের শান্তিপ্রিয় মানুষ শুধু জিলার্ডকেই নয়, নাম জানা না-জানা পরমাণু বিজ্ঞানীদের সবাইকেই অভিশাপ দেবে জানে ও। এবং হয়তো সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু ক'জন ভেবে দেখে বৈজ্ঞানিকদের দায়িত্ব এখানে কতটুকু। আত্মবিক্রীত বৈজ্ঞানিক নেই তা নয়। সে তো রাশি রাশি শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকও আছে। কিন্তু প্রথম যে সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা, আইনষ্টাইন, ম্যাকস প্লাঙ্ক, রাদারফোর্ড, কুরী দম্পতিরা নিত্য নতুন আবিষ্কারের আনন্দে বিহ্বল হয়ে পরমাণু গবেষণা করছিলেন, তাঁরা একবারও ভাবতে পারেন নি যে তাঁদের এই গবেষণার ফল রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একদিন চরম সংকট ডেকে আনতে পারে। কূট-রাজনীতিকদের হাতে পড়ে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলোপের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

তাহলে সত্যি অপরাধটা কার? জিলার্ডদের? না, ট্রুম্যানদের? মার্কিন সামরিক অধিকর্তা জেনারেল গ্রোভসদের? যে গ্রোভস-এর সদম্ভ ঘোষণা, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছেন, সাধারণ মৃত্যু যন্ত্রনার তুলনায় পারমাণবিক মৃত্যু অনেক বেশী আরামদায়ক!

ভাবতে ভাবতে কখন যে চৌরঙ্গী এলাকায় চলে এসেছে ঠিক খেয়াল করেনি গোপাল। এখানে পুলিশের পাহারা দৃঢ়। ভীড়টাও বড়। অবশ্য এ এলাকার ভীড় সাধারণ অবস্থায়ও অসাধারণ।

দোকানপাটগুলো এখনও খোলাই আছে। বড় বড় হোটেল রেস্তোরায় ব্যস্ত অভিজাত খরিদ্দাররা গম্ভীর মুখে ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। আপাত নিরাসক্তি এবং গাম্ভীর্যের তলে ওঁরা কতটা আতঙ্ক বহন করছেন ঠিক বুঝতে পারল না গোপাল। বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি নিজেদের আতঙ্ক প্রকাশ করে সাধারণ আর দশজনের দলভুক্ত হতে রাজী নয় তাঁরা। ঘটনাটাকে গায় না মাখার চেষ্টা করেই আর দশ জন থেকে নিজের দূরত্বের সীমারেখাটা ঠিক রাখতে চাচ্ছেন তাই।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে এসে একটি অন্ধ ভিখারী ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভিখারীটি হাতরে হাতরে সামনের লোকদের ধরবার চেষ্টা

করছিল।

বাবু কি হয়েছে ? ...ও বাবু, কি হয়েছে গো...বাবু কোন গোলমাল লেগেছে নাকি ?

কিন্তু ওর কথা কেউ কানে তুলছে না। ব্যস্ত ভীড় ভিক্ষার প্রার্থনা মনে করে আমল দিচ্ছে না ওকে। গোপাল আস্তে ওর কাছে এগিয়ে গেল। বলল, কিছু জিজ্ঞেস করছ ?

গোপালের দিকে ফিরে তাকাল অন্ধটি। নিষ্প্রাণ ক্ষত বোবা দৃষ্টি তুলে ধরে চাপা আতঙ্কে জিজ্ঞেস করল, বাবু, কোন গোলমাল হয়নি তো ? দাঙ্গা-টাঙ্গা লাগেনিতো ?

গোপাল সহানুভূতির সঙ্গে বলল, কিছু হয়েছে কি করে বুঝলে ?

অন্ধ কিছুটা সহজ হয়ে বলল, খুব ভীড় মনে হচ্ছে। তাছাড়া, আজ টম সাহেব, হার্ডি সাহেব, জনসন সাহেবরাতো এলেন না ?

অবাক হয় গোপাল। তুমি তো দেখতে পাওনা, কি করে বুঝলে তারা আসেনি ?

সামান্য সলজ্জ হাসি ফোটে অন্ধর মুখে।

দীর্ঘ কুড়ি বছর এই হোটেলে এখানে দাঁড়িয়েই ভিক্ষে করছি বাবু, পায়ের শব্দে সবাইকে চিনি।

ছোট্ট একটা কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল গোপাল, কোন দিন ভেতরে ঢুকেছ ?

অন্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ভগবান সে ভাগ্য দিলে এখানে ভিক্ষে করব কেন বাবু ? তবে শুনেছি, ওখানে ভীষণ দামী দামী সব খাবার পাওয়া যায়। শুনতে শুনতে অনেকগুলো নাম মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু খাইনি, কোন দিন খাইনি।

গোপাল ওর বোবা দৃষ্টির দিকে সহানুভূতির সঙ্গে তাকাল। ওর হাত ধরে একটা কোণের দিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, সেরকম গোলমাল কিছু নয়, তবু পারলে তুমি বরং বাড়ি চলে যাও।

অন্ধ নিজের মনেই বলল, তাহলে খোকাই নিতে আসবে'খন।

গোপাল আবার সামনে পা বাড়ায়। অন্ধ ভিখারীর সঙ্গে মধ্যবিত্ত নিজের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পায় যেন হঠাৎ। আমরাও তো আজীবন ভোগের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েই ভিক্ষে করে গেলাম। ভেতরে ঢুকবার সুযোগ পেলাম না কোনদিন।

হাঁটতে হাঁটতে কৃষ্ণার কথা মনে পড়ল আবার। ঠিক ভেবে উঠতে পারছেনা মেয়েটির জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়। ইতিমধ্যে বার দুই তিন ফোন করেছিল এদিকে ওদিকে। কিন্তু যানবাহনের কোন আশা আছে বল তো মনে হয় না। তবু একবার স্টেশনে গিয়ে খোঁজ করা উচিত মনে করে ও স্টেশনের দিকে রওয়ানা হল।

স্টেশনে গিয়ে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেল। শুধু মানুষ আর মানুষ। কত দেশের, কত জাতের, কত ধর্মের তার কোন হিসেব-নিকেশ নেই। গোটা ভারতবর্ষ তার পূর্ণ বৈচিত্র্য নিয়ে যেন হাজির হয়েছে এখানে। পুলিশ পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া কোন উপায় নেই ওদের। মাইকের মুখে ক্লান্ত কণ্ঠের ঘোষণা শোনা গেল ঃ মনোযোগ দিয়ে শুনুন, হাওড়া থেকে বর্তমানে বহির্গামী কোন ট্রেন ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না। কখন ছাড়বে তাও বলা সম্ভব নয়। যাত্রী সাধারণকে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনুরোধ জানান যাচ্ছে।

লক্ষ্য করল গোপাল, কিছু গলায় রুমাল বাধা ছোকরা এর ভেতরই ট্রেন ধরিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে আগাম টাকা সংগ্রহ করছে। দেখে হাসি পেল গোপালের।

স্টেশন থেকেই বার কয়েক চেষ্টা করে এয়ার পোর্টেও ফোন করল একবার। কিন্তু ওখানকার সংবাদও একই। বহির্গামী কোন প্লেন ছাড়ছে না। কখন ছাড়বে তারও কোন স্থিরতা নেই।

কৃষ্ণার জন্য সহানুভূতি অনুভব করল গোপাল। সামান্য দুশ্চিন্তাও। চরম শোক ও সংকটের মুহূর্তে মানুষ আপনজনের কাছে থাকতে চায়। মেয়েটি অত্যন্ত চাপা। ওর উদ্বেগ, আতঙ্ক তাই সোচ্চার হয়ে ওঠে না হয়তো, কিন্তু সেটা সহজেই অনুমেয়।

ঘড়িতে সময় দেখল। ছ'টা। কলকাতায় আলোর মালা নিয়ে সন্ধ্যা নামছে। রোজের মতই। কিন্তু ওপরের ওদের যদি এই সাময়িক উন্মত্ততা থেকে বিরত না করা যায় তাহলে হয়তো পরশু সন্ধ্যায় এ আলো জ্বলবে না। এ শহর থাকবে না। মানুষ থাকবে না। জীবনের সমস্ত তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে যাবে। বীভৎস একটা ধ্বংসস্তূপ জড়পিণ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকবে এই গ্রহের। কিন্তু মহাশূন্যে এই বিশাল গ্রহের নিরাসক্ত সূর্যপরিক্রমা তাতে মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হবেনা। নিষ্প্রাণ গ্রহ তার কক্ষ পথে নির্ভুল নিয়মে অক্লান্ত আবর্তন করে যাবে। কত দিন? কত যুগ? তারপর এক দিন অযুত অর্বুদ বছর পরে আবার কি এই গ্রহে জীবনের অঙ্কুর দেখা দেবে? জীবনের স্পন্দনে চঞ্চল হয়ে উঠবে পৃথিবী? আজের মানুষের মতই প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালবাসার স্বপ্নে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে তারা? আজের মত হিংসা দ্বেষ, জ্বালা থাকবে না সে পৃথিবীতে? সে গ্রহের—

আচমকা একটা ধাক্কায় ছিটকে পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নেয় গোপাল। পাশের গলি থেকে কিছু লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। প্রায় সবার হাতেই থলি বা ছোট ছোট বস্তা। কেউ কেউ কাপড় বা জামার কোঁচড়ে করেও কি যেন নিয়ে আসছে। কিছুলোক কি হয়েছে বুঝতে না পেরে আতঙ্কেই ছুটে পালাতে শুরু করেছে। একজনের কোঁচড় থেকে চাল পড়তে পড়তে আসছে দেখে ব্যাপারটা এবার বুঝতে পারল গোপাল। তবু সামনে এসে পড়া একটা ছেলেকে ধরে ও জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ভাই?

ছেলেটি উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, একটা বিরাট চালের গুদাম লুট হচ্ছে। বাছাধন এত দিন ব্ল্যাক মার্কেট করে ফুলে ফেঁপে কোলা ব্যাঙ্ হচ্ছিল, আজ বিলকুল সাফ।

হঠাৎ নজরে পড়ল গোপালের একটি যুবক গলির ভেতর থেকে একটা চালের বস্তা টানতে টানতে এনে বড় বস্তায় ফেলল। যুবকটির সার্টের হাতা গুটান। ফুলপ্যান্টটাও গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তোলা।

প্যাণ্টের একটা পা ছিঁড়ে ঝুলছে। উস্কোখুস্কো চুলগুলো মুখের ওপর নেমে এসেছে। মুখে একটা ক্রুঢ় কাঠিন্য। বস্তাটা ও বড় রাস্তার ওপর ঢেলে ফেলল। তারপর অপ্রকৃতিস্থের মত চালগুলোকে লাথি মেরে মেরে চারপাশে ছড়াতে লাগল।

গোপাল সামান্য আতঙ্কিত হল। পড়ে পড়ে মার খাওয়া মানুষের অবরুদ্ধ আক্রোশ এবার প্রতিশোধে মাতবে। আইন ও শাসনে আস্থাহীন প্রতিহিংসা এবার নির্মম হয়ে উঠবে।

একবার পত্রিকা অফিসে যাওয়া প্রয়োজন। ফোনে যোগাযোগ রাখলেও অনেকক্ষণ অফিসের বাইরে। ওদিককার অবস্থা কেমন কে জানে।

তার আগে অবশ্য একবার বাড়িটা ঘুরে যাওয়া উচিত। মা নিশ্চয়ই ভাবছে। এবং কৃষ্ণা উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে। হয়তো ভাবছে গোপাল শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা করতে পারবেই। ওর বাড়িতে কে কে আছেন? মা? বাবা? ভাই বোন? আর? আর কেউ? পথ চেয়ে বসে থাকার মত আরো একজন কেউ?

পাড়ার দানায় দানায় ভীড়। জটলা। মেয়েরাও উৎকণ্ঠায়, নতুন সংবাদের আশায় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটদের কাছে সকালে যেটা মজার ব্যাপার মনে হচ্ছিল এখন সেটা আতঙ্কের হয়ে দাঁড়িয়েছে। মায়েদের গা ঘেষে ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে সব।

গোপালকে দেখে এগিয়ে এল দু একজন।

নতুন কোন খবব-টবর আছে নাকি?

মাথা নাড়ে গোপাল। রেডিওতে যা শুনছেন তাই-ই। তার বেশী কিছু সংবাদ নেই।

বাইরে থেকে বাড়িটাকে খালি মনে হচ্ছে। নিঃশব্দ। বৈঠকখানায় নেই কেউ। ক্লান্ত পায়ে ওপরে উঠল গোপাল। বাবার ঘর খালি। মা'র ঘরে বসে কৃষ্ণা আর মা। কৃষ্ণা মাথা নিচু করে বসে আছে। গম্ভীর। বিষণ্ণ। মা সস্নেহে কি যেন বোঝাচ্ছেন ওকে।

গোপাল নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। মা আস্বস্ত হয়ে ওর দিকে ফিরে তাকালেন।

এইতো গোপাল এসেছে। কোন খোঁজ খবর পেলি বাবা ?

কৃষ্ণা উৎসুক দৃষ্টি তুলে তাকাল ওর দিকে। সে চোখে নীরব জিজ্ঞাসা। আকুতি। চোখদুটো সামান্য ফোলা। কেঁদেছে বোধ হয়। বিষণ্ণ বোধ করে গোপাল। নিজেকেই কেন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে ওর।

মা'র ওপর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, না। সব খানেই খোঁজ করলাম। কিন্তু সব কিছুই বন্ধ। তবু আমি চার দিকে খোঁজ খবর নিচ্ছি। হঠাৎ যদি কিছু পেয়ে যাই তাহলে—

কথাটা আর শেষ করে না গোপাল। মিথ্যে স্তোকবাক্যটা নিজের কাছেই কেমন যেন নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছিল। একটু থেমে থেকে জিজ্ঞেস করল তাই, ইতু কোথায় ?

আর কোথায়, ছাদে !

লক্ষ্য করে গোপাল, মা'র দৃষ্টি ম্লান হয়ে এসেছে। আর্দ্র। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ও। যেতে যেতেই মা'র সান্ত্বনাবাণী শুনতে পায়।

মন শক্ত কর মা। ভয় কি ? আমরাও তো আছি। শেষ মুহূর্ত পযন্ত ইতুর মতই তোমাকে আগলে রাখব আমি। মন শক্ত কর। ভগবানকে ডাক।

নিঃশব্দে ইতুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল গোপাল। ভেজান দরজায় হাত দিতেই সামান্য খুলে গেল দরজাটা। এবং দরজার ফাঁক দিয়ে এক ফালি বিস্ময় চোখে পড়ল ওর। নতুন বিয়ে করা ভদ্রলোকের ভয়ে যে জানলাটা খিল এঁটে রাখে ইতু, সেই জানলাটা সামান্য ফাঁক করে উৎসুক দৃষ্টিতে কি যেন দেখছে ও।

সামান্য শব্দ হয়েছিল বোধ হয়, চমকে ফিরে তাকাল ইতু। দাদাকে দেখে সামান্য থতমত খেয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে সলজ্জ হেসে বলল, ভীষণ গরম লাগছিল। চল

ছাদে যাই।

ছাদেব কার্ণিশেব পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। কৌতূহলী দৃষ্টিতে ইতুকে লক্ষ্য করছিল গোপাল। ওব নিস্তরঙ্গ দৃষ্টিতে ঈষৎ চাঞ্চল্যের আভাস। নিঃশব্দে নিচেব দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় দাদার দিকে আস্তে ফিবে দাঁড়াল। কেমন যেন অসহায় স্ববে প্রশ্ন করল, তাহলে কি সত্যিই আর তিন দিন বাঁচছি আমবা ?

আস্তে বলল গোপাল, বিশ্বাস কবতে ভাল লাগছে না, কিন্তু সঠিক কিছু বলাও যাচ্ছে না।

ইতু চোখ ফিবিযে নেয। ইচ্ছে কবেই ইতুকে অভয় দেবাব চেষ্টা কবেনি গোপাল। যে কোন একটা ধাক্কায ওকে ওব খোলসেব বাইবে আনার প্রয়োজন ছিল। এই আতঙ্ক যদি সেই প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারে, মন্দ কি ? এখনও দৃঢ বিশ্বাস গোপালেব, এ সংকট কাটবেই। কিন্তু একবার স্বাভাবিক মুক্তিব স্বাদ পেলে ইতু আব স্বেচ্ছা-বন্দীত্বে ফিবে যেতে চাইবেনা কিছুতেই।

কে যেন ছাদে আসছে। কৃষ্ণা না ? সামান্য অবাক হয গোপাল। কৃষ্ণা আস্তে ইতুব পাশে এসে দাঁড়াল। ক্লান্ত স্ববে গোপালকে বলল, আপনার মা আপনাকে একটু নিচে যেতে বললেন। ভীষ্মদা না কে যেন ডাকছেন আপনাকে। আবো দু'তিন বাব এসেছিলেন।

কিন্তু সংবাদটা মা না এনে কৃষ্ণাকে দিযে পাঠালেন কেন মা কি কৃষ্ণাকে সহজ কবে আনাব চেষ্টা কবছেন ?

অবশ্য কৃষ্ণার চেয়েও বড় হযে উঠল ভীষ্মদাব প্রশ্ন। ভীষ্মদা হঠাৎ ডাকছেন কেন ? যতদূব জানে, ভীষ্মদাব তো আজ মৌন দিবস। ভীষ্মদাও কি ভয় পেয়েছেন ? না, এই সংকটের মুখে চরিত্র শুদ্ধ রাখার কোন কঠোরতম নৈতিক পাঠ দেবাব জন্য এসেছেন ? মনে মনে একটু হাসে গোপাল। যা লোক, অসম্ভব না !

ভীষ্মদা নিচেব ঘবে অপেক্ষা কবছিলেন। গভীব চিন্তামগ্ন। বয়স পঞ্চাশ মত। চোখে পুরু লেন্সেব চশমা। গায়ে গলাবন্ধ পাঞ্জাবী।

সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিকতার ছাপ।

আসলে ভীষ্ম ভীষ্মদার পৈত্রিক নাম নয়। চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্যই বোধ হয় বন্ধুরা যৌবনে ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল ভীষ্মদেব। তাদের দেওয়া নামটার পেছনে কোন এক সময় সর্বজনীন দাদা যুক্ত হয়ে সেদিনের যুবক অধ্যাপক হয়েছিলেন ভীষ্মদা। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঠাট্টার হালকা পালকগুলো ঝড়ে পড়া চরিত্রের কঠিন কাঠামোটা নিয়ে প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছেন ভীষ্মদা সেই নাম নিয়েই।

দুধের মত সাদা, তুলোর মত নরম, লোহার মত শক্ত ইত্যাদি সর্ব-গ্রাহ্য উপমার মত চারিত্রিক দৃঢ়তার উপমা এ পাড়ায় ভীষ্মদা। অভি-বাবকরা ছেলেদের চরিত্রশুদ্ধির উপদেশ দিতে হলেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন ভীষ্মদার দিকে, দেখ, চরিত্র কাকে বলে ভীষ্মদাকে দেখে শেখ।

চরিত্র বলতে এ সমাজে বিশেষ যেটুকু বোঝায় শুধু সেটুকুই নয়, মানুষের জীবনের যতগুলি সংবৃত্তি থাকা সম্ভব তার সমবেত যোগফলে যে চরিত্র, সেটাই ছিল আশ্চর্য রকম শক্ত ভীষ্মদার। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয় গোপাল, ভীষ্মদা ইন্দ্রিয়জিৎ, না, অনিন্দ্রিয়!

কি ব্যাপার? আপনি হঠাৎ?

গোপাল ভীষ্মদার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমাকে খবর দিলে তো আমিই যেতে পারতাম।

ভীষ্মদা একটু বিব্রত হয়ে বললেন, না না, সে রকম জরুরী কিছু নয়। তাছাড়া সকলেরই সময়ের দাম আছে। বস।

গোপাল বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু আজ না আপনার মৌন দিবস?

ভীষ্মদা চোখ নামিয়ে গম্ভীব স্বরে বললেন, দীর্ঘ কুড়ি বছর পর নিয়মটা আজ হঠাৎ ভঙ্গ হল।

তারপর চশমাটা খুলে মোটা খদ্দরের কাপড়ের খুঁটে মুছতে মুছতে বললেন, তোমার কাছে এসেছিলাম একটা সংবাদের জন্য।

বলুন।

চশমাটা আবার চোখে দিয়ে গোপালের দিকে তাকালেন ভীষ্মদা। তারপর আস্তে টেনে টেনে বললেন, দেখ, বর্তমান, আধুনিক পৃথিবীর কোন কিছুর ওপরই আমার শ্রদ্ধাও নেই বিশ্বাসও নেই। তবু আজ সকালে তোমার লেখাটা পড়ে ভাবলাম, ব্যাপারটা একটু জেনে আসি। তা, ঘটনাটা কি সত্যি ?

গোপাল মাথা নাড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তো আমার বিশ্বাস, এর ভেতর ঠাট্টা বিদ্রূপের কোন ব্যাপার নেই।

ভীষ্মদার দৃষ্টি সামান্য ম্লান হয়ে এল। প্রায় স্বগতোক্তির মত স্তিমিত স্বরে বললেন, তাহলে সত্যিই মানুষ আর দু দিন জীবিত আছে ?

গোপাল আস্তে মাথা নাড়ল, যদি ওরা সিদ্ধান্ত না বদলায়।

ভীষ্মদা চোখ নামিয়ে নিলেন। কি যেন ভাবছেন গভীরভাবে। সামান্য বিচলিত মনে হচ্ছে। প্রায় নিজের মনেই ফিসফিস করে বললেন তারপর, তাহলে যুগ যুগ ব্যাপী মানুষের কৃষ্টি, সভ্যতা, আধ্যাত্মিক সাধনার এই শেষ পরিণতি !

গোপাল কি বলবে ভেবে পায় না। ভীষ্মদাকে উপদেশ দেবার স্পর্দ্ধা নেই ওর। দশাচল কিছু স্তোকবাক্য বা সান্ত্বনা দিতেও সঙ্কোচ বোধ করে। গভীর তাত্ত্বিক কিছু আলোচনায় নামার কথা মনে আসতেই ভীষ্মদার তুলনায় নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হয় ও। অথচ এই মৌন মুহূর্তগুলি ওর কাছে অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ ভীষ্মদা সোজা গোপালের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। ওর চোখে চোখ রেখে রুদ্ধ আবেগে প্রশ্ন করে বসলেন, তাহলে জীবনের সমস্ত প্রলোভন, সমস্ত রিপুকে নির্মম হাতে যারা আজীবন দমন করে এল, তাদের কি সান্ত্বনা থাকল বল ?

সামান্য বিস্ময়ের সঙ্গে গোপাল ভীষ্মদার দিকে তাকিয়ে থাকে। এ স্বর সম্পূর্ণ অপরিচিত ওর। এ দৃষ্টিও।

ভীষ্মদা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। নিজেকে সামলে নিলেন।

চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে মুছুতে মুছতে সামান্য অনুশোচনার সুরে বললেন, তামসিকতার প্রশ্রয় দিলে একদিন নিজের তৈরী ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের হাতে এ রকম অপমৃত্যুই ঘটে, বুঝলে। আচ্ছা, চলি।

রাস্তার মোড় পর্যন্ত ভীষ্মদাকে এগিয়ে দিল গোপাল। অনুরোধ জানাল, ভীষ্মদা, আপনি এ সময় বেশী বাইরে বেরুবেন-টেরুবেন না। সেরকম কোন খবর থাকলে আমিই দিয়ে আসব আপনাকে।

কোন জবাব দিলেন না ভীষ্মদা। গম্ভীর মুখে আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে গেলেন।

ভীষ্মদাকে জীবনে এই প্রথম উত্তেজিত, বিচলিত দেখল গোপাল। সাধারণ লোকের মনেব অবস্থাটা এ থেকেই অনুমান করতে পারল।

ওপরে আসতে আসতে মার ঘরে কৃষ্ণা একা বসে আছে দেখল। হাঁটুর ওপর থুঁতনি রেখে গভীর অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছে ও। দেখে মায়া হল। কিছুই করার নেই, তবু বারে বারে কেন যেন মনে হচ্ছে গোপালের, মেয়েটির প্রতি ওর কর্তব্য ও পালন করতে পারেনি। মনের দিক থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন এ-পরিবার বোধহয় আরও নিঃসঙ্গ করে তুলেছে ওকে। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে গোপালের নিজেরই কেমন হাঁপ ধরে যায়। বাবা সিন্দুকের পাশে, মা পূজোর ঘরে, ইতু চিলেকোঠায়—গোটা বাড়িটাকে এসব সময় নির্জন একটা পোড়ো বাড়ি বলে মনে হয় ওর। ওঁরা, অন্ততঃ ইতুও যদি মানসিক সঙ্গ দিতে পারত তাহলে হয়তো নিজেকে এত নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব মনে হত না কৃষ্ণার। এবার নিজের দিক দিয়েও কথাটা ভাবে গোপাল। আমিও কি ওকে মানসিক সঙ্গ দেবার কোন চেষ্টা করেছি? পথের পরিচয় ছাড়া ওর সঙ্গে ভাল করে পরিচয় পর্যন্ত হল না। নিছক ছাদের তলের আশ্রয়টুকু জুটিয়ে দিয়েই নিজের কর্তব্য শেষ করিনি কি আমি?

আস্তে ঘরে এল গোপাল।

আপনি ছাদ থেকে চলে এলেন যে?

কৃষ্ণা চোখ তুলে তাকাল। বলল, ওপরে এক ভদ্রলোক এসেছেন।

ভদ্রলোক! সামান্য অবাক হয় গোপাল।

ওর বন্ধুর দাদা। বন্ধু আপনাদের খোঁজ খবর নেবার জন্য পাঠিয়েছেন বললেন।

আন্দাজেই বুঝল গোপাল, জয়ার দাদা। কলেজের সহপাঠিনীদের মধ্যে একমাত্র জয়ার সঙ্গেই যেটুকু যোগাযোগ ওর। অবশ্য, বিপরীত চরিত্রের উচ্ছল আমোদী আধুনিকা জয়ার সঙ্গে যোগাযোগটা ইতু কি করে এত দিন রক্ষা করে যাচ্ছে ভেবে অনেক সময় অবাক হয় গোপাল। জয়াকে এ বাড়িতে দেখেছে দু একদিন। ওর দাদাকে দেখেনি। কিন্তু ভদ্রলোকের জন্য সহানুভূতি অনুভব করে ও। ইতু মুখ ফুটে অকম্পিত স্বরে, আমরা ভাল আছি, এই কথাটুকুও বলতে পেরেছে তো?

গোপাল চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। কৃষ্ণার দিকে অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আপনার খুবই অসুবিধে হচ্ছে বুঝছি, কিন্তু—

কৃষ্ণা বাধা দিল, না, না, অসুবিধে কি? বরং এ আশ্রয়টুকু না পেলে—

একটু হাসল গোপাল। আশ্রয়টুকুই শুধু পেয়েছেন, কিন্তু পরবর্তী কোন আশ্বাস আপনাকে দিতে পারছি কই।

কৃষ্ণাও সামান্য হাসে। কৃষ্ণাকে এই প্রথম হাসতে দেখে তৃপ্তি বোধ করে গোপাল। নিজেকে কিছুটা হালকা মনে হয়।

কৃষ্ণা হেসে বলল, আশ্বাস কেই বা এখন কাকে দিতে পারছে বলুন।

গোপাল লক্ষ্য করে, কৃষ্ণা শান্ত, কিন্তু সপ্রতিভ। কথাবার্তায় কোন জড়তা নেই ওর, কিন্তু পরিমিতি বোধ আছে।

একা একা আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে, না?

কৃষ্ণা মাথা নাড়ে। না, অসুবিধে কি? তা ছাড়া সময় পেলেই মাসীমা এসে আমার সঙ্গে গল্প করেন। বরং ওঁর পুজোয় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি ভেবে আমারই লজ্জা করে।

সামান্য আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলল গোপাল, আপনার সঙ্কোচের কারণ

নেই। এ সংসারে বিগ্রহটাই মার সবচেয়ে প্রিয় হলেও প্রিয়রে দেবতা করে নেবার উদারতাও মা'র আছে।

কৃষ্ণা গোপালের দিকে তাকাল। গোপাল সামান্য অপ্রতিভ হয়। একটু বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেছে ভেবে।

কৃষ্ণা ওর চোখে চোখ রেখেই বলল, আপনি তো এখন ভীষণ ব্যস্ত, না? গোটা পৃথিবীটাই এখন সংবাদ। খুব লিখছেন বোধহয়?

গোপাল প্রশ্নটার গভীরে অনুসন্ধান করে। ওর ব্যস্ততার পরিমাপ নিতে চাচ্ছে কেন কৃষ্ণা? ও আর একটু কম ব্যস্ত থাকলে, পরিবারের জন্য সময় দিতে পারলে, কৃষ্ণা কি খুশী হত? না কি, নিছক সৌজন্য-মূলক প্রশ্নই এটা?

গোপাল সহজ সুরে হঠাৎ একটা প্রস্তাব করে বসল। বাড়িতে একা একা খুব হাঁপিয়ে উঠেছেন, না? যাবেন বাইরে? একটু ঘুরেটুরে আসবেন?

কৃষ্ণা বিস্মিত হল যেন। বলল, বাইরে!

ক্ষতি কি? সমাধান সবটাই যখন হাতের বাইরে, না হয় কিছুক্ষণ সংবাদ দেখেই বেড়ালেন।

কৃষ্ণা চোখ নামিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর আস্তে বলল, না, থাক। আপনার হয় তো অসুবিধে হবে।

হাসল গোপাল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হালকা সহজ সুরে বলল, জীবনের শেষ তিন দিনের জন্য না হয় এক জনের জন্য একটু অসুবিধে ভোগ করলামই। দাঁড়ান, আমি মাকে বলে আসছি।

মাকে বলে ফিরবার পথে হঠাৎ সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে একটু দাঁড়ায় গোপাল। ইতু জয়ার দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিচে নামছে। অবশ্য দাদাটিই কথা বলছে বেশী। ইতু মাঝে মাঝে সায় দিচ্ছে মাত্র। পোষাকে, চলনে বলনে জয়ারই দাদা ছেলেটি। এক নজরেই সামান্য আপস্‌টার্ট বলে মনে হয়। ইতু বৈঠকখানা পর্যন্ত সঙ্গে গেল। তারপর হাত তুলে নমস্কার করে বিদায় দিল ওকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে দেখছিল গোপাল। মাত্র এক বেলার ভেতর ইতু এতখানি সামাজিক হয়ে উঠেছে! চেনা মুখগুলো ইতিমধ্যেই কেমন পালটাতে শুরু করেছে! খেই রাখা যাচ্ছে না যেন। ইতুকে ফিরতে দেখে আস্তে সরে যায় গোপাল। দাদাকে দেখলে হয়তো লজ্জা পেতে পারে।

বেরুনব আগে কৃষ্ণার অনুরোধে ইতুকেও প্রস্তাব করেছিল গোপাল। কিন্তু ইতু রাজী হয়নি। শরীর ভাল নেই নাকি ওর।

গলির মোড়ে এসে নির্জন পার্কটার দিকে দৃষ্টি পড়ল গোপালের। পার্কের কোণের সেই অবহেলিত মন্দিরটায় টিম টিম করে প্রদীপ জ্বলছে। সামান্য কৌতুক বোধ করে গোপাল। নিধু ঠাকুর সংবাদটা কি পায়নি এখনো।

কৃষ্ণাকে বলল, চলুনতো মন্দিবটা একটু হয়ে যাই। আমাদের পরিচিত এক পুরোহিত আছেন ওখানে। একটু দেখা করে যাই।

মাঝে মাঝে মনে হয গোপালেব মন্দিবেবও বোধহয় ভাগ্য আছে। স্থান কাল নির্বাচনের উপর ভগবানেব ক্রমোন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। এই মন্দিরই কালীঘাটের দিকে হলে হয়তো কলকাতায় নামকবা একখানা বাড়িও হয়ে যেতে পারত পূজারীর। মন্দিবের দেবীর সঙ্গে সঙ্গে গৃহের দেবীটিরও সারা অঙ্গ ছেয়ে যেত সোনার অলঙ্কারে।

ছেলেবেলা থেকে দেখে আসা সেই নিধু পুরোহিত। আঘাড়বিস্তৃত টাক। হাড় গোণা যাওয়া পাকানো চেহারা। চোখে মুখে নিবিড় নিরাসক্তি। কিঞ্চিৎ কানে খাটো। সে জন্যই বোধহয় ভক্তের ভীড় কম। প্রার্থনাগুলো নিজেই যদি না শুনতে পান তবে ভগবানের দরবার পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন কি করে।

বসে বসে সারাদিনের সংগ্রহ গুণছিলেন নিধু ঠাকুর। সংখ্যায় নয়া পয়সা বেশী বলেই বোধহয় গুণতে সময় লাগছিল। গোপাল পকেট থেকে একটা সিকি বের করে সামনে ছুঁড়ে দিল। অসময়ের ভক্তের দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু অবাক হলেন নিধু ঠাকুর।

কি গোপাল, তুমি হঠাৎ মন্দিরে ? চাকরিটা গেছে নাকি ?

গোপাল একটু হেসে বলল, শুধু চাকরি নয়, গোটা পৃথিবীটাই যেতে বসেছে।

কানে হাত দিয়ে একটু সামনে ঝুঁকলেন ঠাকুর।

কে যেতে বসেছে ? কি অসুখ ?

গলার স্বর উঁচু করে গোপাল। সবাই যেতে বসেছি। আর তুদিন পর সবাই এক সঙ্গেই মরছি। আপনি শোনেন নি কিছু ?

একটু হাসলেন নিধু ঠাকুর। বিদ্রূপের হাসি। কিন্তু বিজ্ঞোচিত গাম্ভীর্য রক্ষা করে বললেন, জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রু'বং জন্ম মৃতস্য চ। জন্ম হলেই মৃত্যু আছে বাবা। ও নিয়ে বিজ্ঞজনের শোক করা উচিত নয়। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। জীর্ণ বাসের মতই আত্মা শুধু পুরাতন আবাস ত্যাগ করে। আমরা তাকেই মৃত্যু বলে ভয় পাই।

মনে মনে ভয় পায় গোপাল। বহুদিন পর এমন ভক্ত শ্রোতা পেয়ে যে রকম রুখে উঠেছেন পুরোহিত, বাধা না দিলে হয়তো সারা রাত শাস্ত্র আওড়াবেন। বরং শান্তিতে থাক নিধু ঠাকুর। এ তু'দিন যারা শান্তিতে থাকার সুযোগ পাচ্ছে তারাই প্রকৃত সুখী।

গোপাল তাড়াতাড়ি প্রণাম করে বলল, তাহলে চলি ঠাকুর।

নিধু ঠাকুর কৃষ্ণার দিকে ফিরে তাকালেন।

এটিকে তো ঠিক চিনলাম না।

গোপাল বলল, আত্মীয়া।

কৃষ্ণাও প্রণাম করল। আশীর্বাদের ভঙ্গীতে কৃষ্ণার মাথায় হাত রাখলেন নিধু ঠাকুর। মনে মনে একটু হাসল গোপাল। আশীর্বাদটা ওজনে কিছুটা ভারী বলেই বোধহয় মাথার ওপর হাতটা এত দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। জনশ্রুতি, শিষ্যের চেয়ে শিষ্যাদের প্রতি নিধু ঠাকুরের নাকি করুণা বেশী। জাত হিসেবে মেয়েরা অবলা বলেই হয়তো।

নির্জন পার্কটা পাশাপাশি হেঁটে ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

বড় রাস্তায় এসে হকচকিয়ে গেল কৃষ্ণা। সমস্ত শহর যেন পথে নেমে এসেছে। মোড়ে উৎকণ্ঠিত উত্তেজিত জনতা। জটলা। রাস্তা জুড়ে শিথিল জনস্রোত। নির্লিপ্তভাবে রাস্তা জুড়ে হাটছে লোক। বরং যানবাহনই সঙ্কুচিতভাবে কোনক্রমে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগোচ্ছে। ট্রাম সম্পূর্ণ বন্ধ। মাঝে মধ্যে দু-একটা বাস চোখে পড়ছে। বেশী ভীড়ের জায়গাগুলো সন্তর্পণে কৃষ্ণাকে পার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল গোপাল।

কৃষ্ণা ভীরু দৃষ্টি তুলে তাকাল একবার গোপালের দিকে।

বাড়ি বসে কিছুই বুঝতে পারি নি। এ কী অবস্থা হয়েছে চারদিকের ?

গোপাল আস্তে বলল, এ তো অবস্থার সবে শুরু।

সামনেই একটা উত্তেজিত ভীড় দেখে থেমে পড়ল ওরা। কি নিয়ে যেন প্রচণ্ড তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে সেখানে। নিঃশব্দে রাস্তা পেরিয়ে কৃষ্ণাকে নিয়ে ও-ফুটে গেল গোপাল। জানে ও, আতঙ্কের অন্য পিঠ অসংযম। মানুষ ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছে। শুধু মারামারি হানাহানি নয়, এসব মুহূর্তে মানুষের আত্মঘাতী হয়ে ওঠা পর্যন্ত অসম্ভব নয়।

সামান্য আতঙ্কের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণা, চারদিকের এই অবস্থা, কই, পুলিশ চোখে পড়ছে না তো ? পুলিশ কি করছে ?

গোপাল ও-ফুটের জমায়েতটার ওপর চোখ রেখেই বলল, জনসংখ্যার তুলনায় পুলিশের সংখ্যা নগণ্য। তাছাড়া পুলিশের আসল শক্তি সংখ্যা নয়, রাষ্ট্র শক্তি। কিন্তু এখন শুধু রাষ্ট্র নয়, পুরো পৃথিবীটাই এক অনিশ্চিত সূতোর উপর ঝুলছে। কে কাকে মানবে বলুন। তাছাড়া পুলিশও মানুষ। স্বভাবতই তারাও এখন এ আতঙ্কের শিকার।

কৃষ্ণার আতঙ্ক ক্রমেই বাড়তে থাকে। এখন পর্যন্ত সংযত উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা যে কোন মুহূর্তে উচ্ছৃঙ্খল অসংযমেও ফেটে পড়তে পারে। তখন ? তখন কে কাকে রক্ষা করবে ? একক মানুষের শক্তি তখন কতটুকু ?

কৃষ্ণার ভয়টা টের পায় বোধ হয় গোপাল। আস্তে জিজ্ঞেস করে, ভয় করছে ?

কৃষ্ণা মাথা নাড়ে। না, কেমন ক্লান্ত লাগছে।

দেহ মন, এ অবস্থায় কোনটার ক্লান্তিই অস্বাভাবিক নয়। গোপাল ঘড়িতে সময় দেখল। বলল, একটু এগোলেই একটা বড় পার্ক আছে, চলুন একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক। আমিও খুব টায়ার্ড ফিল্ করছি।

অন্যান্য দিন পার্কে ভ্রমণকারীদের ভীড় থাকে। শিশুদের সোরগোল থাকে। কিন্তু আজ পার্কটা প্রায় ফাঁকা। দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে কিছু লোক। অবাধ স্বাধীনতায়, জড়তাহীন উচ্ছলতায়, এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করে খেলছে কিছু ভিখারী ছেলে মেয়ে। আবছা আলোর একটা কোণ বেছে নিয়ে মুখোমুখি বসল ওরা। তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল।

যদিও প্রাথমিক সঙ্কোচ কেটে গেছে, সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে এসেছে, তবু ঠিক কথা হাতড়ে পাচ্ছিলনা গোপাল। কৃষ্ণা নিচু হয়ে পায়ের নখ খুঁটছিল। বোঝে গোপাল, সঙ্কোচ নয়, বিপর্যস্ত মনটাকে সংহত করার জন্যই বোধ হয়। কারণ কৃষ্ণাও ইতিমধ্যে জড়তা কাটিয়ে অনেক সহজ হয়ে এসেছে। গোপালের ওপর, ওদের পরিবারের ওপর, ওর ক্রমবর্ধমান অসঙ্কোচ নির্ভরতাও অনুভব করেছে ও। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মানুষকে বোধ হয় অনেক তাড়াতাড়ি সহজ করে তোলে। ঘনিষ্ঠ, পরস্পরনির্ভর করে তোলে।

হঠাৎ মিলির কথা মনে পড়ে গোপালের। মিলির স্পর্দ্ধায় অপমানিত বোধ করেছে ও। গোপালের সহজাত বিনয়, সংযম, সৌজন্যকে কি ও করুণাপ্রার্থীর বশ্যতা বলে ভেবেছে। মিলি দীর্ঘদিন প্রেমের অভিনয় করে অবশেষে ওকে প্রত্যাখান করেছে—মুখ ফুটে কিছু না বললেও ওর ব্যবহারেই সেটা সুস্পষ্ট। ওর শেষ চিঠিটার কোন জবাব পর্যন্ত দেয় নি মিলি। এ জন্য ক্ষোভ বা অভিমান থাকলেও অপমান বোধ

করে নি গোপাল। নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে সরে এসেছিল ও। প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে আর যারই হোক প্রেমের অধিকার পাওয়া যায় না। বরং নিজের দীনতাই প্রকাশিত হয়। কিন্তু আর্জ মিলির ব্যবহারে সন্দেহ হয়েছে গোপালের. মিলি বোধ হয় ওকে প্রেমের ক্রীতদাস বলে ভাবে। ভাবটা যেন, আমার মালিকানার জোরেই তোমাকে আমি ইচ্ছে মত দূরে সরাব, অবজ্ঞা করব, আবার প্রয়োজন হলে কাছে ডাকব। তুমি নত মস্তকে আমার সামনে এসে দাড়াবে।

কি ভাবছেন ?

কৃষ্ণার ডাকে সচেতন হয় গোপাল। হালকাভাবেই বলে, ভাবনার কি আর অন্ত আছে।

কৃষ্ণা চুপ করে থাকে।

বাড়ির জন্য খুব মন খারাপ লাগছে, না ?

কৃষ্ণা আস্তে বলে, মা'র জন্য। মা যে এখন কি করছেন আমি চিন্তা করতে পারছি না।

গোপাল অন্তরঙ্গ স্বরে জিজ্ঞেস করে, আপনার আর কে কে আছেন ?

দুই বোন। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইরাও বিয়ে করে যার যার মত আলাদা সংসার করছে। বুড়ো মা ছাড়া সে-রকম চিন্তা করার আর নেই কেউ।

গোপালের একটা ছোট্ট কৌতূহল হল জিজ্ঞেস করে, আপনি এখনো বিয়ে করেন নি কেন ? কিন্তু প্রশ্নটা বড় বেশী ব্যক্তিগত এবং সামান্য অসামাজিক মনে হতে পারে ভেবে চেপে যায়। বলে, আপনার জন্য কোন ব্যবস্থাই করে উঠতে পারছি না বলে ভীষণ অস্বস্তি লাগছে।

কৃষ্ণা কৃতজ্ঞ স্বরে বলে, না না, আপনি অনেক করেছেন। আপনার এ-ঋণ আমি আজীবন—

গোপাল কৌতুকের সুরে সংশোধন করে দেয়, এ দু'দিন।

একটু হাসে কৃষ্ণা, আপাতত এ দু'দিন মনে রাখব।

সুযোগ পেলেই কথার পিঠে সকৌতুক সংযোজন বা টিপ্পুনি কাটা একটা বদভ্যাস গোপালের। বলেই ভেবেছিল, কৃষ্ণা ওর চটুলতায় ক্ষুণ্ণ না হয়। কৃষ্ণাকে হাসতে দেখে তৃপ্তি বোধ করে ও। কৃষ্ণার চোখ থেকে ইচ্ছে করেই চোখ নামায় না।

গেটের দিকে ছোট্ট একটা কোলাহল শুনে দুজনেই ফিরে তাকায়। সচেতন হয়ে ওঠে। হাসি মিলিয়ে যায়।

কয়েকটি বখাটে ধরনের ছেলে ও মেয়ে হুল্লোড় করতে করতে পার্কে ঢুকছে। বেশ কিছুটা দূরে দল বেঁধে বসে পড়ল ওরা। দূর থেকেও বুঝল গোপাল, ছেলেদের দু'একজন পকেট থেকে ছোট ছোট বোতল বের করছে। ওদের হাসি, কথাবার্তা, আচরণ রীতিমত আপত্তিজনক। ভুরু কুঁচকে ওঠে কৃষ্ণার। গোপালও গম্ভীর হয়। কিন্তু প্রতিবাদের প্রচলিত কর্তব্যজ্ঞানটাকে দমন করে রাখতে হয়। বিশেষ করে কৃষ্ণার জন্য। কৃষ্ণার নিরপত্তার কথা ভেবে। ওরা বিপদে পড়লে, চীৎকার করলেও এগিয়ে আসার মত মানবিক বা সামাজিকবোধ মানুষের এখনও অটুট আছে কিনা সন্দেহ আছে গোপালের।

উঠতে উঠতে বলল তাই, চলুন, ওঠা যাক। এখানে থাকাটা আর উচিত হবে না।

কৃষ্ণাও অস্বস্তিবোধ করছিল। সঙ্কোচে গোপালের দিকে তাকাতে পারছিল না। বলল, আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। বরং বাড়িই চলুন। বাইরে ভাল লাগছে না।

গলির মুখে সুব্রতদার সঙ্গে দেখা। অনর্গল হর্ণ দিয়েও গাড়ি বের করার পথ না পেয়ে নেমে এসে হাত জোর করে ভীড়ের লোকজনদের কী যেন বোঝাচ্ছিলেন। গোপাল কৃষ্ণাকে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

কি ব্যাপার সুব্রতদা, এর ভেতর গাড়ি নিয়ে কোথায় বেরুচ্ছেন?

মুখ দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোক রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। গোপালকে দেখে একটু যেন ভরসা পেলেন। বললেন, আর বলনা ভাই, এক্ষুণি একবার হাসপাতালে যাওয়া দরকার। জরুরী ফোন এসেছিল।

হাসপাতালে? কে আছেন?

সুব্রতবাবু গাড়িব কাছে এগিযে যেতে যেতে বললেন, তোমাদের বৌদি। ডেলিভাবী কেস্।

তাবপব হঠাৎ গোপালেব দিকে তাকিযে অনুবোধেব ভঙ্গীতে বললেন, কিন্তু চাবপাশেব অবস্থা দেখে তো বীতিমত নার্ভাস ফিল্ কবছি। তুমি একটু সঙ্গে যেতে প .ব ..

গোপাল কৃষ্ণাব দিকে ফিবে তাকাল। কৃষ্ণা বুঝল। বলল, ঐ তো বাড়ি দেখা যাচ্ছে, আমি একাই যেতে পাবব।

গোপাল গাড়িব দিকে এগিযে যেতে যেতে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। মা'কে একটু বলে দেবেন।

গোপাল সুব্রতব সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসে।

হাসপাতালেব গেট থেকেই কড়া পাহাডা। কেন কোথায যাচ্ছে তা সন্তোষজনক জবাবদিহি চাওযা হচ্ছে। এ. আদেশ দেওযা হচ্ছে, ভেতবে ঘুণাক্ষবেও এসব আলোচনা যেন না কবা হয। কর্তৃপক্ষেব নিষেধ।

সিঁড়িব কাছে এসে গাড় থেকে নামল ওবা। সাবাদিনে এই একটি শান্ত জাযগা দেখল গোপাল যেখানে এখন পর্যন্ত কোন ছন্দপতন ঘটে নি। শহবেব নিবিবিলি একটা অংশে হাসপাতালটা। সম্ভবত সেজন্যই সতর্কতাব ব্যূহ ভেদ কবে বাইবেব আতঙ্ক উত্তেজনা ভেতবে প্রবেশ কবতে পাবে নি।

ডাক্তাব নিজেব ঘবেই ছিলেন। তাব কাছ থেকে সংবাদ পাওযা গেল আব ভযেব কিছু নেই। ডেঞ্জাবটা কেটে গেছে। কথায কথায একটু হেসে বললেন ডাক্তাব, পেসেন্টও অত্যধিক নার্ভাস।

সামান্য সলজ্জ হাসলেন সুব্রতবাবু। গোপালেব সঙ্গেও আলাপ আছে বৌদিব। গোপাল জানে নার্ভাসনেসেব দিক দিযে এদেব কেউই কম যান না।

বেবি ভাল আছে?

ডাক্তার অভয় দিলেন সুব্রতকে। হ্যাঁ, বেবি, মাদার দু'জনেই ভাল আছে।

সামান্য ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন সুব্রতবাবু, পেসেন্টের সঙ্গে একটু দেখা করা যায়?

ডাক্তার একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, বাইরের কোন আলোচনা না হয় যেন। আর, ঘুমাচ্ছে দেখলে ডাকবেন না।

ইচ্ছে করেই গোপাল সঙ্গে গেল না। এই সুযোগে এখানকার কিছু সংবাদ জেনে নেওয়া দরকার।

সুব্রত বেরিয়ে গেলে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল গোপাল, এখানকার কোন পেসেন্টই খবরটা জানে না এখনও, না?

ডাক্তারবাবু একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, না। কিছু মনে করবেন না, এ প্রসঙ্গটা এখানে আলোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনায়।

গোপাল বিনয়ের সঙ্গে বলল, মাপ করবেন, চার পাশে কেউ নেই দেখেই জিজ্ঞেস করছিলাম তা ছাড়া আমার আলাদা একটা ইন্টারেষ্ট আছে। আমি একজন প্রেস রিপ্রেজেন্টেটিভ্।

ওর পরিচয়ে ডাক্তারবাবু সামান্য সচেতন হলেন মনে হল। মনে মনে তৃপ্তিবোধ করে গোপাল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই তৃপ্তিটুকুই বাড়তি পারিশ্রমিক সাংবাদিকদের।

ডাক্তার নিজে থেকেই বললেন এবার, শুরুতেই নানা অজুহাতে পেসেন্টদের ঘর থেকে রেডিওগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এবং ষ্টাফ্‌কে ডেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল এ আলোচনা না করার জন্য। দু'একজন ছাড়া বাইরের ভিজিটার্সও এ্যালাউ করছি না আমরা। এবং তাদেরও বারে বারে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, ষ্টাফ্‌দের রিএ্যাকসন কি রকম।

ডাক্তার একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, অস্বীকার করে লাভ নেই, প্রায় আর দশজনের মতই। তবে এখন পর্যন্ত, হয়তো

নিজেদের দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করেই অধৈর্য হয়ে ওঠে নি কেউ।

ওদের কথার ভেতরই নার্স এসে খবব দিল, ডক্টর নাগ আপনাদের নিচের হল ঘরে যেতে বলেছেন এক বার।

ডাক্তার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আপনি বসুন, আমি একটু আসছি। অবশ্য উনি ইতিমধ্যে ফিরে এলে আমার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। বলবেন ভয়ের কিছু .নই, সব ঠিক আছে। বরং কাল সকালে যেন একবার ফোন করেন।

কিছুক্ষণের ভেতরই সুব্রত বাবু ফিবলেন। বেশ তৃপ্ত মনে হল তাকে। গোপালেব কাছে সব শুনে বললেন, তাহলে যাওয়া যাক, চল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সিঁড়িব মুখেব হলঘরটায় ছোট একটা ভীড় দেখে দাঁড়াল ওরা। ভেতবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার নার্স ও অন্যান্য কিছু স্টাফ। সৌম্য শুভ্রকেশ বৃদ্ধ এক ডাক্তার আবেগেব সঙ্গে ওদের বলছেন, সেবাই আমাদের ধর্ম। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কর্তব্যে আমি অবিচল থাকতে চাই। কিন্তু আমি কারো উপর জোর করতে চাই না। যাঁবা স্বেচ্ছায় আমাব সঙ্গে থাকতে চান তাঁবাই শুধু থাকুন। কেউ কোন পিছুটান বোধ কবলে তাঁদেব আমি বাধা দেব না। তাঁরা তাদের পবিবার পবিজনেব কাজে ফিরে যেতে পারেন। আমি হৃষ্ট চিত্তে তাঁদের অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু তবু, আমি শেষ বারের মত আমাদের বৃত্তিগত মহান দায়িত্বেব কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

ডাক্তার বাবু থামলেন। ক্লান্ত ভাবে নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন। নিঃশব্দে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামটা টিকটিক শব্দে নিরাসক্ত ভঙ্গীতে দুলে যাচ্ছে শুধু।

গাড়িতে উঠে ঘড়িটা দেখে নিল একবার গোপাল। রাত দশটা। সুব্রতকে জিজ্ঞেস করল, আপনি সোজা বাড়ি ফিরবেন তো?

হ্যাঁ। কেন, তুমি আর কোথাও যাবে?

গোপাল বলল, একবার অফিসে যাওয়া দরকার। একটা লিফ্‌ট দেবেন ?

গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বললেন সুব্রত, নিশ্চয়ই। কেন দেবনা ?

রাস্তার সেই একই অবস্থা। অবশ্য এখন পর্যন্ত কোন উন্মত্ততা শুরু হয় নি। কম বেশী বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে মাত্র। পুরো চেতনায় ঘটনাটাকে এখন পর্যন্ত অনুভব করতে পারছে না যেন মানুষ। সকলেই ভাবছে শেষ পর্যন্ত একটা সুরাহা হবেই। বোধ হয় বিকল্প পরিণতিটা ঠিক কল্পনায় আনতে পারছে না। অথবা চাচ্ছে না।

রেডিও অফিসের সামনে বেশ কড়া পাহাড়া দেখা গেল। মিলিটারী নিয়োগ করা হয়েছে এখানে। বোধ হয় পুলিশের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে ভরসা পান নি কর্তৃপক্ষ। খুবই স্বাভাবিক। যে কোন রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার মুখে অস্ত্রাগারের চেয়েও রেডিও অনেক বেশী শক্তিশালী অস্ত্র। যে কোন বিদ্রোহের সময়ও বিদ্রোহীদের প্রথম লক্ষ্যস্থলের তালিকায় থাকে তাই বেতার কেন্দ্র।

বোধ হয় মিলিটারী দেখে মনে পড়ল সুব্রতবাবুর। একটু হেসে বললেন, সন্ধ্যার সময় রাস্তায় একটা মজার ঘটনা দেখলাম। বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ একটা নির্জন গলির দিকে নজর পড়ল। একটা সোনার দোকানের গা দিয়ে গেছে গলিটা। দেখি গলির দিকের জানালা গলে একটা লোক লাফিয়ে পড়ছে। আমি চোর চোর বলে চিৎকার করে ওঠার ভেতরই লোকটা লাফিয়ে পড়ে চোঁচোঁ দৌড়। অভ্যেস বশেই চোর চোর করতে করতে তাড়া করলাম আমি। সঙ্গে কিছু লোকজনও জুটে গেল। কিন্তু গলির ভেতর ঢুকে আর হদিস পাওয়া গেল না লোকটার।

হঠাৎ দেখি পাশের গলির বাঁক ঘুরে এক সিপাই-জী আসছেন এদিকে। চোখে মুখে কেমন যেন একটা নির্লিপ্তি। দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘটনাটা জানালাম। সিপাইজী কি উত্তর দিল জান ?

গোপাল বলল, ঠিক বলতে পারছিনা। কিন্তু একটা কার্টুনের কথা মনে পড়ছে। একটা চোর চুরি করছে, সিপাইজী তার পাশ দিয়ে যেতে

যেতে বলছে, যা ব্যাটা, আমার এখন অফ্-ডিউটি বলে খুব বাঁচা বেঁচে গেলি। সে ধরনের কোন জবাব-টবাব দিল বোধ হয়।

সুব্রতবাবু একটু হাসলেন। বললেন, প্রায়; তবে আর একটু বেশী। নির্লিপ্ত স্বরে আপ্তবাক্যের মত বলল সিপাইজী, ছোড় দিজিয়ে বাবু। চোর কোন্ না আছে? পাকড়াতে গেলে তামাম দুনিয়া সাফা হয়ে যাবে। সাচ্ বাত বলব বাবু? আপনি হামি সভ্‌ভি চোর। বায়তামিজ। বলতে বলতে আবেগে হঠাৎ সিপাইজীর গলা কেঁপে উঠল। চোট্টা বদমায়েস নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলাম! দেব্‌তার কথা ভাবলাম না। পথ ছাড়িয়ে দিন বাবু, আভি শিউ মন্দিরে যাব। দু'রোজ দেবতার গোড় আকড়িয়ে পড়ে থাকব।

রাস্তার বাঁক ঘুরেই গাড়ি একটা ভীড়ের মুখে পড়ল। সামনের একটা দোকান থেকে লাউড-স্পিকার দিয়ে রেডিও নিউজ শোনান হচ্ছে। বিরাট ভীড় দোকানটার সামনে। রাস্তার ওপরও উপচে এসে পড়েছে ভীড়। ঠিক এ-মুহূর্তে রেডিও নিঃশব্দ, কিন্তু জায়গাটা সরব হয়ে উঠেছে কিছুটা ব্যবধানে প্রায় মুখোমুখি দুটো জীপের দৌলতে। দুটো জীপ থেকেই মাইকে তারস্বরে যার যার আবেদন পৌছে দেওয়া হচ্ছে জনতার কাছে। শ্রোতা এক, জনতা। কিন্তু বক্তার সংখ্যা দুই। দুটো জীপ। ফলে কারো কথাই ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। কান পেতে উভয় দলের কাটা কাটা কিছু বাক্যাংশ কানে এল মাত্র।

ঃ বন্ধুগণ, আজ সমগ্র পৃথিবীর এই চরম সংকট মুহূর্তে বিপ্লবী জনগনের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমরা বরাবর জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এসেছি, সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্রলালসাকে রোধ করতে না পারলে, পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব করে তুলতে না পারলে—

ঃ কোন প্ররোচনায়, উত্তেজনায় আপনারা মনোবল হারাবেন না। বন্ধুগণ, আপনাদের আস্থাভাজন যে মহান প্রতিনিধিদের ওপর আপনারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাঁরা, জানবেন, এই দুর্দিনেও আপনাদের

পাশেই আছেন তাঁরা।

ঃ বন্ধুগণ, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই সাম্রাজ্যব্যদীদের প্রশ্নে আমাদের শাসক সম্প্রদায়ও যথেষ্ট সাহসের বা বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারে নি। তবু আজকের এই দুর্দিনে—

ঃ বন্ধুগণ, মানবদ্রোহী, দেশদ্রোহীদের কোন প্ররোচনায় আপনারা—

এরই ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে ভীড়েব টুকরো বিদ্রূপাত্মক সোচ্চার মন্তব্য।

দাদারা আর কেন ?

আবার শুরু হল রাজনীতি ? দু'দিনের জন্য ক্ষেমা দিন, ক্ষেমা দিন দাদাবা।

এই বিচিত্র চীৎকাবেব ঐক্যতানে যোগ দিয়েছে পথ না পাওয়া গাড়িগুলোর বিভিন্ন স্ববেব হর্ণ। সব মিলে কেমন যেন একটা ভাঙ্গা .মলাব রূপ নিয়েছে জাযগাটা।

এরই ভেতর এক সময রেডিও সরব হয়ে উঠল ঃ

আকাশবাণী কলকাতা। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ—

অধৈর্য জনতা এবাব জীপ দুটোব উদ্দেশ্যে চীৎকাব কবে উঠল।

থামুন দাদারা, থামুন।

.মবে ভাগিযে দাও।

আর উপকাব কবতে হবে না দাদারা।

কেটে পড়ুন, মানে মানে কেটে পড়ুন এবাব।

কিন্তু ততক্ষণে জীপের দু'পক্ষেব বক্তার স্বরই উচ্চগ্রামে পৌঁছেছে। কিন্তু কারো কোন বক্তব্যই স্পষ্ট নয়। এরই ফাঁকে ফাঁকে রেডিও ঘোষণারও দু'একটি কথা শোনা যাচ্ছিল। ক্রুদ্ধ জনতার ভেতর থেকে কয়েকজন এবার হাতা গুটিয়ে জীপ দুটোর দিকে ধেয়ে গেল। মুহূর্তে জীপ দুটো পাশের গলিতে ঢুকে উধাও হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে রেডিও ঘোষণা শেষ হয়ে এসেছে। গোপাল পুরোটা শুনতে না পেলেও মনে হল, পৃথিবীব বিভিন্ন কিছু বাষ্ট্রের সাম্প্রতিক

বিবরণ ও প্রধানমন্ত্রীর জনসাধারণের কাছে অনুরোধের সংবাদ দিচ্ছে।

কিন্তু সংবাদটা মাঝ পথে থেমে গিয়ে হঠাৎ আবার নতুন করে শুরু হল।

ঃ এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল, সমস্ত সমাজতন্ত্রী দেশ থেকে সম্মিলিতভাবে, পৃথিবীর জনসাধারণের নামে, পাইলটদের কাছে নেমে আসার অনুরোধ জানান হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানান যাচ্ছে সে-প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। পাইলটরা জানিয়েছেন, তাঁদের সিদ্ধান্তে তাঁরা অবিচল থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

থেমে থাকা গাড়িগুলো চলতে শুরু করেছে আবার। গোপাল লক্ষ্য করল, এ সংবাদে জনতা আরো আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। চোখে-মুখে গভীর আশঙ্কা ফুটে উঠেছে সবার! আশার আলোগুলো যেন একে একে নিভে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে।

সুব্রতবাবু আবার গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। ফেরার পথের সেই খুশী-ভাবটা মিলিয়ে গেছে। ঠিক আতঙ্কিত না হলেও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হল গোপালও। যদি স্বেচ্ছায় ওরা হঠাৎ মত পরিবর্তন না করে তাহলে আর কোন্ পথ খোলা থাকছে সত্যিই ওদের গুলি করে নামান যায় না? আকাশেই ধ্বংস করে দেওয়া যায় না? কে জানে, হয়তো বিরাট ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে সমস্ত রাষ্ট্রের।

পত্রিকা অফিসের সামনে লোকে লোকারণ্য। সর্বশেষ সংবাদের জন্য উত্তেজিত ভীড় অধৈর্য উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করছে। কোলাপ্সেবল গেটের ওপাশ থেকে একজন সহকর্মী চীৎকার করে সদ্যপ্রাপ্ত টেলিপ্রিন্টারের সংবাদ টুকরোগুলো পড়ে দিচ্ছে। গোপাল বুঝল, টেলিগ্রাম পর্যন্ত অপেক্ষা করার আর ধৈর্য নেই লোকের। এখন প্রতি ঘণ্টার, প্রতি মিনিটের, প্রতি সেকেণ্ডের সংবাদ চায় তারা।

সুব্রতদাকে বিদায় দিয়ে ভীড় সরিয়ে কোন রকমে অফিসে ঢুকল গোপাল।

ভেতরের উপস্থিতি বিপরীত। বহু চেয়ার ফাঁকা। অন্য দিনের এ-সময়ের সোচ্চার অফিস আজ স্তিমিতপ্রাক। ম্লান। কোথাও উদ্দামতা নেই। হৈচৈ নেই। অতিরিক্ত চাঞ্চল্য নেই। যারা উপস্থিত, বোঝা যায়, তারা উপায়ন্তর নেই বলেই এসেছে। গোপন আতঙ্ক, উত্তেজনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে তারা। সকালের মত বিভিন্ন আলোচনায় উত্তেজিত হয়ে উঠছে না। স্ব স্ব ভবিষ্যতবাণী যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য মুখর হয়ে উঠছে না। সবাই বোধ হয় বুঝে ফেলেছে, ঈশ্বরে আস্থার মত পাইলটদের ওপর নিরুপায় আস্থা রাখা ছাড়া আর কিছু করনীয় নেই।

ইতিমধ্যে চার ঘন্টা অন্তর অন্তর সঠিক সময়ে টেলিগ্রাম বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে মেসিন। একটা টেলিগ্রামের কতটুকুই বা ম্যাটার। অল্প কয়েক জনই সেটা দু'এক ঘন্টার ভেতর লিখে ফেলতে পারে। সেদিক দিয়ে সাংবাদিকদের পোষা কলম। একই বিষয়ের ওপর আদেশ মাফিক পক্ষেও যেমন বিপক্ষেও তেমনি আগুন ছড়িয়ে লিখতে পারে। কিন্তু অনভিজ্ঞ হাতে যন্ত্র পোষ-মানা নয়। মেসিন রুমের অভিজ্ঞ হাত প্রায় সবই অনুপস্থিত।

বিভিন্ন পত্রিকার মালিকরা কী সব জরুরী আলোচনার জন্য নাকি একটা গোপন মিটিং-এ জমায়েত হয়েছেন। সম্পাদক সেখানেই গিয়েছেন। গোপাল হাতড়ে পেল না, এ অবস্থায় মালিকদের হঠাৎ মিলিত আলোচনার মত কী এমন থাকতে পারে। পলিসির কোন প্রশ্ন নেই। এখন নিছক সর্বশেষ সংবাদটুকু জনসাধারণকে সরবরাহ করে যাওয়াটাই এক মাত্র এবং শেষ দায়িত্ব।

চিফ রিপোর্টারের সঙ্গে আলোচনা করে ছোট একটা রিপোর্ট লিখে দিল গোপাল। ভীষণ খিদে পাওয়ায় ক্যান্টিনে খেতে গেল। বাড়ি ফিরতে কত রাত হবে কে জানে।

ক্যান্টিনের এক কোণে গম্ভীর মুখে বসে চা খেতে দেখল পিনাকী চৌধুরীকে। অফিসে ভদ্রলোক পরবাসী চৌধুরী নামে খ্যাত। সাব

এডিটার। তরুণতম সাহিত্যিক হিসেবে, পাঠকদের কাছে না হলেও, লেখক ও সমালোচকদেব কাছে খ্যাত। এবং আলোচিত।

ভদ্রলোকের কয়েকটা লেখা পড়েছে গোপাল, কিন্তু ঠিক মানে বুঝতে পারে নি। ভাষা এবং লেখার স্টাইল প্রশংসনায় হলেও কেমন যেন খাপছাড়া, জটিল, এলোমেলো। শেষ পযন্ত কি বলতে চেয়েছেন বোঝা মুস্কিল।

একদিন এ প্রসঙ্গে আলোচনাও হয়েছিল পিনাকীবাবুর সঙ্গে। গোপাল নিজে থেকেই গিয়ে আলাপ করেছিল এবং বলেছিল, কিন্তু ঠিক গল্পটা ধরতে পারলাম না। অবশ্য আমি একজন সাধারণ পাঠকই, সমালোচনার শক্তি আমাদের কতটুকু!

উদাস দৃষ্টি মেলে পিনাকী জবাব দিয়েছিল, গল্প? কিন্তু আমাদের গল্পে তো কোন গল্প থাকে না। আপনি বরং শরৎচন্দ্র পড়ুন। অথবা তারাশঙ্কর-টারাশঙ্কর।

মনে মনে অপমানিত বোধ করেছিল গোপাল। কিন্তু পরে শুনেছিল, ওর কথাবার্তার ধরণই নাকি ঐ রকম। এবং চিন্তা ভাবনার ধরণ আরো জটিল। রূঢ়। কিন্তু ভদ্রলোক স্বচিন্তায় সিরিয়াস। কোন সস্তা চমক বা সহজ কেরিয়ারের সঙ্গে জড়িত নয় ওর জীবনদর্শন।

জীবনের কোন কিছুর ওপরই নাকি আকর্ষণ নেই ওদের। জাগতিক কোন কিছুর ওপর আস্থা নেই। না প্রীতি, না প্রেম, স্নেহ মায়া মমতা— কিছুর ওপরই আস্থা নেই। পাশার দানের ঘুঁটিগুলো পড়ার সময় গায়ে গায়ে লেগে যেমন কতগুলো শব্দ তোলে, এগুলোও নাকি সেরকম কিছু শব্দই। এমন কি নিজেদের ওপরও না কি ওদের কোন আকর্ষণ নেই।

পৃথিবীটা ওদের মতে একটি বাসের অযোগ্য গ্রহ। এই গ্রহের বাসিন্দা করে আনার জন্য, যে ক্ষেত্রে ওদের কোন ইচ্ছে অনিচ্ছের অধিকার ছিল না, মা বাবার ওপর ওদের অপরিসীম বিরক্তি। এলেও, কষ্ট করে বেঁচে থাকাটার পিছনে কোন যুক্তি খুঁজে পায় না ওরা।

অথচ না বেঁচে থাকার জন্য সক্রিয় চেষ্টায়ও অনীহা। অগত্যা নির্লিপ্ত নিরাসক্ত পরবাসীর মত এই নির্বান্ধব গ্রহে জীবনটা কোনমতে গুজরান করে আকাঙ্খিত মৃত্যুতে এসে পৌছান নিয়ে কথা।

অবশ্য কথাগুলো ওরা ভাবের ঘোরে বলে না। অথবা কোন আশাভঙ্গজনিত নৈরাশ্য থেকে সহজাতবোধ নয় এগুলো। বড় বড় দার্শনিক যুক্তি আছে পিছে। ওরা পড়াশুনা করে, তার প্রমাণ, আলোচনায় বিভিন্ন দেশের এবং কালের বহু দার্শনিকের মত ও নামের উল্লেখ। কিন্তু ওদের দর্শনটাই গোপালের মাথায় ঢোকে না। কেমন যেম হেঁয়ালী মনে হয়। একদিন যেতে যেতে শুনেছিল গোপাল, পিনাকীবাবু কাকে যেন নিজেদের দর্শন বোঝাচ্ছিলেন। কির্কেগার্ড ও জাপার্স নাম দুটো কানে এসেছিল। ওরা কারা কে জানে? পিনাকী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলছিল, জাপার্সই শেষ কথা বলে গেছেন, টু ফিলোজফাইস ইস টু লার্ন টু ডাই।

অবশ্য পরে ভেবে দেখেছে গোপাল, পিনাকী চৌধুরীরা লেখক বলেই বোধটা প্রকাশিত। কিন্তু এ-বোধ আজ তরুণ সম্প্রদায়ের ভেতর অত্যন্ত ব্যাপক। প্রায় সহজাত। অবশ্য এই জীবন ও পৃথিবীকে মিথ্যে, মায়া বলে ভেবেছেন এমন দার্শনিকের সংখ্যা, পৃথিবীর কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, এই ভারতবর্ষেও কম ছিল না। কিন্তু এদের মত নিজেদের নিরাশ্রয়বোধ করতেন না তাঁরা। এদের যন্ত্রণাবোধও ছিল না তাঁদের। কারণ, লোকোত্তর, অপার্থিব একটা আশ্রয় ছিল তাঁদের চোখের সামনে। কিন্তু আজের পিনাকীরা মানুষেও বিশ্বাস রাখতে পারছে না, ঈশ্বরেও বিশ্বাস হারিয়েছে। মনের দিক দিয়ে নিরাশ্রয় হওয়া ছাড়া তাই ওদের উপায় নেই।

গোপাল যেতে যেতে পিনাকী চৌধুরীকে দেখে ভাবছিল, আজ সবচেয়ে খুশী বোধহয় ওরাই। এবার বিনা চেষ্টায়, এতদিনের আকাঙ্খিত মৃত্যুর দৌলতে পরবাসের বিরক্তিকর জীবনটা থেকে মুক্তি পাবে ওরা।

নিচে এসে বাড়ি যাবার আগে আর একবার খোঁজ করল গোপাল। কিন্তু সম্পাদক তখনও ফেরেন নি। সর্বশেষ সংবাদের জন্য টেলিপ্রিন্টা-রের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সহকর্মীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে যন্ত্রটার সামনে দাঁড়িয়ে। যন্ত্রটা থেমে থেমে রোজের গতি লয় রক্ষা করেই সংবাদ ঢেলে যাচ্ছে। যারা প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে তাদের আগ্রহের গতির সঙ্গে সমতা রাখার আদৌ ব্যস্ততা নেই ওর।

সেই ভীড়ের ভেতর পিনাকী চৌধুরীকেও দেখতে পেল গোপাল। বুড়ো আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে একজনের ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সংবাদ দেখছে। কিন্তু, লক্ষ্য করল গোপাল, ঠিক অভিসারিকার লাস্যময় চাঞ্চল্য নেই দৃষ্টিতে। দৃষ্টি সামান্য বিষণ্ন। আবার পরক্ষণেই ভাবল, কি জানি, আমারই দেখার ভুল হয়তো। ওদের জটিল চেতনার কতটুকুই বা আমাদের বোধগম্য!

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবাদই বেশী। ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রে আইন ও শৃঙ্খলা পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। শহর থেকে লোক পালাতে শুরু করেছে। কিছু কিছু শহর জনশূন্য হয়ে গেছে।

ফিরতে যাচ্ছিল গোপাল, হঠাৎ একটা নতুন সংবাদে থমকে দাঁড়াল। যারা চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারাও ঝুঁকে পড়ল সামনে।

অনুশোচনায় জনৈক পরমাণু বিজ্ঞানীর আত্মহত্যা।

নামসহ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি সংবাদ। এরপর যন্ত্র কিছুক্ষণ থেমে থেকে আবার সংবাদ দিতে শুরু করল। কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ সব সংবাদ। গোপাল ঘড়ি দেখল। রাত সাড়ে বারটা। এবার বাড়ি ফেরা প্রয়োজন। ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।

রাস্তায় সেই একই ভীড়। আতঙ্ক দিন ও রাতের সীমারেখা মুছে দিয়েছে যেন। আইন ও শৃঙ্খলার সেরকম ধার ধারছে না কেউ। পথের ভিখিরীগুলো কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে এই হৈ চৈ দেখে। আড়াল খুঁজে ছেলেমেয়েদের জাপটে ধরে ঘন হয়ে বসে আছে ওরা এদিকে ওদিকে। বাবুদের হৈ হল্লার কারণ, নিয়মকানুন ও

পরিণতির কোন দিনই কোন খেই পায় না ওরা।

বাড়ি ফেরার পথে বাড়ির কাছাকাছি একটা পার্কে বিরাট এক প্যাণ্ডেল বাঁধা হচ্ছে দেখে থামল গোপাল। বাড়ি থেকে বেরুনর সময়ও চোখে পড়েছে বলে মনে হল না। মজুরদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেরাও হাত লাগিয়েছে। ঝড়ের বেগে কাজ এগোচ্ছে। একটি ছেলের কাছে জিজ্ঞেস করে প্যাণ্ডেলের হেতুটা জানতে পারল। কাল থেকে নাকি বিশ্বশান্তি যজ্ঞ শুরু হচ্ছে এখানে। ছেলেটি, স্কুলের ছাত্রই হবে বোধ হয়, উৎসাহের উচ্ছ্বাসে হাত পা নেড়ে বলল, এবার আর দেখতে হবে না বাছাধনদের। মন্তরের জোরে হিঁচড়ে নামাবে না সব!

গোপাল আপাত গাম্ভীর্য রক্ষা করে বলল, হ্যাঁ, পাইলটদেরই হোক বা বোমাগুলোই হোক, তা নামাতে পারবে।

ছেলেটি কথাটা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করার আগেই গোপাল এগিয়ে গেল।

নিচের বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই মা জেগে বসে আছেন। এসব মুহূর্তে প্রথমে সঙ্কোচ ও পরে মা'র ওপর রাগ হয় ওর। বারে বারে নিষেধ করা সত্ত্বেও এ অভ্যেস গেল না মা'র। অথচ বোঝেন না মা যে, এতে যার জন্যে জেগে থাকা তারই অস্বস্তি বাড়ে।

শুধু মা নয়, কৃষ্ণাও বসে ছিল মা'র সঙ্গে। মা ওর সঙ্গে গল্প করছিলেন। গোপালকে দেখে মা অনুযোগের সুরে বললেন, তুই কেমন ছেলে বল তো? চারদিকে এই হৈ হাঙ্গামা আর রাত একটা পর্যন্ত তোর পাত্তা নেই। আমার সঙ্গে সঙ্গে এই মেয়েটা পর্যন্ত জেগে বসে আছে।

এই জেগে বসে থাকার অন্য মানে হতে পারে ভেবে সঙ্কুচিত হয় কৃষ্ণা। তাড়াতাড়ি বলে, এমনিতেই আমার ঘুম আসছে না। আপনি একা বসেছিলেন তাই—।

গোপাল কৈফিয়তের সুরে বলল, কি করব বল? এইতো অফিস থেকে ফিরছি। আমাদের ওপর কী ধরণের কাজের চাপ পড়েছে বুঝতেই পার। তোমরা শুয়ে পড়লেই পারতে।

মা দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন, কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। লোকে মরছে নিজের আতঙ্কে আর পত্রিকা তার বিক্রি বাড়ায়!

গোপাল কোন উত্তর দিল না। ওপরে যাওয়ার আগে বলে গেল, আমি আর খাব না মা, খেয়ে এসেছি।

নিজের ঘরে যেতে যেতে টের পেল গোপাল, বাবা অন্ধকার ঘরের ভেতর পায়চারি করছেন। আলমারিতে নতুন কোন তালা লাগিয়েছেন কিনা তা অবশ্য দেখতে পেল না।

নিজের ঘরে পা দিতেই সারাদিনের ক্লান্তিটা যেন ছেঁকে ধরে। পা দুটো ব্যথা করছে। চোখ জ্বালা করছে। মাথাটা ভার ভার লাগছে। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল গোপাল।

মা ঘরে দরজা দিচ্ছেন। কৃষ্ণাও মা'র সঙ্গে শোবে আজ। ওর বোধ হয় সত্যিই ঘুম আসছে না। মেয়েটা ভীষণ চাপা। রাস্তায় মাঝে মাঝে মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। অনেকেই বোধ হয় আজ রাত্রে ঘুমাবে না। কেউ আতঙ্কে, কেউ বৈচিত্র্যের নেশায়।

ভেবেছিল, ক্লান্তিতে শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু ঘুম আসছে না। বেশী ক্লান্তিও বোধ হয় ঘুমের প্রতিবন্ধক। আজ সারাটা দিন পথে পথে কাটল। সারা দিনের টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতার খণ্ডচিত্র।

ওরা কি সত্যিই নামবে না? অসম্ভব। তা হয় না, হতে পারে না। অন্তত অন্তিম মুহূর্তে নিশ্চয়ই ওদের মনে পড়বে শৈশবের কথা। সেই স্বপ্নের জগৎ। মা'র মুখ। বন্ধুর মুখ। প্রেয়সীর মুখ। সন্তানের মুখ। যাদের হয়তো গত যুদ্ধে হারিয়েছে। যাদের সঙ্গে হারিয়েছে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, আকর্ষণ। তবু মনে পড়বে। সেই অনুসঙ্গে মনে পড়বে পৃথিবীর অগণিত মানুষেব কথা। স্পষ্ট কোন মুখ না হলেও জীবনের স্পন্দন। প্রাণ তরঙ্গ। আর সেই তরঙ্গের শীর্ষে উদ্ভাসিত অগণিত শিশুর মুখ। ওদের আপাত নির্মমতার, সাময়িক

উন্মত্ততার গভীরে সেই সুপ্ত বীজকে দেখেছে গোপাল। না হলে যাত্রীদের নামিয়ে দিল কেন? ইচ্ছে হলে শেষ তিন দিনের শান্তিকে বেছে নেবারই বা সুযোগ দিয়েছিল কেন যাত্রীদের?

রাস্তা দিয়ে কারা যেন হৈ চৈ করতে করতে ছুটে গেল। বাবা কি এখনও পায়চারি করছেন? টাকার হিসেব মিলাচ্ছেন?

বহুদিন পর বাবার কথা এমন সচেতনভাবে ভাবছে গোপাল। বয়স স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব এনে দেবার পর থেকেই জীবন থেকে বাবা মা'র ভূমিকার অপরিহার্যতা ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে বোধহয়। অচেতন ভাবেই মানুষ নিজস্ব জীবন বৃত্তের কেন্দ্রে একক আশ্রয় খুঁজে নিতে থাকে তখন। যখন পিতৃমাতৃ আকর্ষণ, কিছুটা উৎসের প্রতি মায়া মমতা। এবং কর্তব্য।

গোপাল ওর কর্তব্য থেকে কোনদিন বিচ্যুত হয়নি। কিন্তু নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই ওর, মায়া মমতা আকর্ষণ ওদের ক্ষেত্রে দুর্নিবার নয়। একটু বয়স হবার পর থেকেই বুঝতে পারত গোপাল, কোথায় যেন ওদের সঙ্গে বাবার একটা ফারাক আছে। শুধু ওদের সঙ্গেই নয়, গোটা সংসারের সঙ্গেই। ওদের প্রতি বাবার আকর্ষণ নেই তা নয়, কিন্তু সে আকর্ষণ ওদের শিশুসত্তার আকাঙ্খানুযায়ী শুধু ওদের ওপরই কেন্দ্রীভূত নয়। বাবার মমতা ও আকর্ষণ দ্বিখণ্ডিত। আরো একটু বড় হলে বুঝতে পেরেছে, দ্বিতীয় খণ্ডের নাম অর্থ। কৈশরের অভিমানে বাবার বিরুদ্ধে তখন অনেক সময় অনেক অভিযোগ পুষেছে ও মনে মনে। কিন্তু আরো বড় হয়ে, জীবনকে কিছুটা নির্লিপ্তভাবে চিনতে শিখে বাবার ওপর সহানুভূতি অনুভব করেছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনেই যে কোন অস্তিতে আশ্রয় চায়। তা ধর্ম, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য অথবা ভিন্নতর যে কোন কিছুই হোক। অর্থ বাবার সেই আশ্রয়। আবার যন্ত্রণাও।

ঘাড়ের কাছটা সামান্য জ্বালা জ্বালা করছে। মাঝে মাঝেই ভাবে প্রেসারটা পরীক্ষা করে নেবে। কিন্তু রাতের সিদ্ধান্ত দিনের অবহেলায়

বাতিল হয়ে যায়। বিছানা না নেওয়া পর্যন্ত রোগ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে না কিছুতেই। মিলি প্রায়ই অনুযোগ করত, তুমি নিজের সম্বন্ধে এত ক্যালাস কেন? ও হয়তো ক্যালাসনেস বলতে জীবনে উন্নতি, প্রতিষ্ঠা, অর্থ ও যশের প্রতিযোগিতায় ওর নিরুদ্দমতার কথা বোঝাতে চাইত। তখন না, এখন এই সন্দেহ হয় গোপালের।

কৃষ্ণা কি ঘুমাচ্ছে? মা?

একজন বৈজ্ঞানিক আত্মহত্যা করেছেন! যে বৈমানিক হিরোশিমার ওপর প্রথম বোমা ফেলেছিল সেও তো পাগল হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। না কি আত্মহত্যা করেছিল? এ-রকমই কি যেন একটা ঘটেছিল।

এই আত্মঘাতী বিজ্ঞানীটি কে ছিলেন? নামটা মনে করার চেষ্টা করে গোপাল। কিন্তু পারে না। এক সময় অনুভব করে গোপাল, এবার বোধ হয় ঘুম আসছে। অনেক সময় দেখেছে ও, চিন্তার দোলায় দোলায় ঘুমের ঢুলুনী আসে। ভেড়া গুণে ঘুমে পৌছান তো আজ় প্রচলিত প্রবাদই।

বিজ্ঞানীর নামটা মনে পড়ছে না, কিন্তু টুকরো কিছু স্মৃতি, কিছু ঘটনার ভেতর দিয়ে যেন স্পর্শ করা যাচ্ছে। একটা অবয়ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

জার্মানের ছোট্ট একটি শহর। শহরের শেষ প্রান্তে একটি ছোট্ট সুখী তিন জনের সংসার। স্বামী স্ত্রী এবং ছোট্ট একটি ফুটফুটে শিশু। শিশুটি দোলনায় দোলে। মা'র কোলে ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে মায়ের বুকের উষ্ণতায় ঘুমিয়ে পড়ে। পাশে বসে তৃপ্ত চোখে বাবা সেই ঘুমকে দেখেন। উঠে যাবার আগে ওর ফোলা ফোলা গাল দু'টো আলতোভাবে টিপে দিয়ে যান।

স্নেহের ছায়ায় ছায়ায় বয়স বাড়ে। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পৌছায়। কিন্তু কেমন যেন আত্মমগ্ন ছেলেটি। গভীর ডাগর দু'টি চোখে রাজ্যের জিজ্ঞাসা। বহির্জগৎ প্রসঙ্গে অনন্ত কৌতূহল। অজস্র প্রশ্ন। সদুত্তর না পেলে অস্বস্তি বোধ করে। যন্ত্রণায় কাতর হয়।

কৈশোর থেকে যৌবন। ওর জিজ্ঞাসা ওকে পৌঁছে দেয় বিজ্ঞানে। ওর মেধা, অনিসন্ধিৎসা, বুদ্ধির প্রাখর্যে অধ্যাপকরা মুগ্ধ। মা'র স্নেহ গর্বিত। কিন্তু ছেলেটির মনে অসীম অতৃপ্তি। পিপাসা। জটিলতর আরো বহু প্রশ্নের অস্বস্তি।

শিক্ষা জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে গবেষণাগার। জীবনের, জগতের অজানা রহস্যঘেরা রূপকথার দেশ।

অদম্য উৎসাহ ও উদগ্র অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সেই স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করলেন তরুণ বিজ্ঞানী। তারপর, ক্রমে ওঁর চতুস্পার্শের বিশাল বহির্জগৎ সংকীর্ণ হতে হতে একদিন কেন্দ্রীভূত হল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একবিন্দু পরমাণুতে, পরমাণু অর্থাৎ এ্যাটম। যে গ্রীক শব্দটির অর্থ অবিভাজ্য। কিন্তু সত্যিই কি এ্যাটম অবিভাজ্য? একটি পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন এবং সেই কেন্দ্রীনের চারপাশে একটি কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি ইলেকট্রন! যে কোন মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীনে যতগুলো প্রোটন থাকে, তার বহির্কক্ষেও ততগুলো ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়। তাহলে স্বভাবতই একটি পরমাণুর ভর হওয়া উচিত ঐ প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভর বা মাস্-এর যোগফলের সমান। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে পরমাণুটির ভর সে যোগফলের চেয়ে অনেক বেশী দাঁড়াচ্ছে? এই বাড়তি ভরটুকু তাহলে আসছে কোত্থেকে? এ ভর কার? কিসের?

তীব্র আরো বহু প্রশ্নের যন্ত্রণায় ভুগতে শুরু করেন তরুণ বিজ্ঞানী। ধীরে ধীরে মা'র মুখ পর্যন্ত নির্বাসিত হয় এই প্রশ্নের তাড়নায়। জীবনের সমস্ত সত্তিকে গ্রাস করে ঐ ক্ষুদ্র পরমাণু।

আচমকা এক দিন একটি ক্ষুদ্র সংবাদে গবেষণাগারের চেয়ার থেকে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন যুবকটি। লর্ড রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে গবেষণা করতে করতে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমস্ চ্যাডউইক পরমাণুর কেন্দ্রীনে নিউট্রন নামে একটি নতুন বস্তুকণিকার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল যেন যুবকটির সামনে।

নতুন উদ্যমে গবেষণা শুরু করলেন যুবকটি। অবশ্য তখন তিনি স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক। জার্মানের বিখ্যাত বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ, উৎস্যাকার আটো হান সবার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচিত।

চ্যাডউইকের পরে, ঐ একই বছর, ১৯৩২-এ ওঁকে নতুনভাবে উৎসাহিত করল প্রায় সমবয়সী অষ্ট্রীয়ান তরুণ বিজ্ঞানী ফ্রিজ হাউটার-ম্যানস। চ্যাডউইক যে নতুন বস্তুকণিকা আবিষ্কার করলেন, ধর্মের দিক থেকে সেই নিউট্রন তড়িৎ-ধর্মনিরপেক্ষ। ফ্রিজ আভাস দিলেন, এই তড়িৎ ধর্ম-নিরপেক্ষতার সাহায্যে এক নতুন পারমাণবিক শক্তি উন্মোচন করা অসম্ভব নয়। ফ্রিজের বক্তব্যকে বিজ্ঞানীরা তেমন আমল দিলেন না, কিন্তু যুবকটির কেন যেন নিশ্চিত ধারণা হল, ফ্রিজের বক্তব্য উড়িয়ে দেবার মত নয়।

ওঁর বিশ্বাস যে ভ্রান্ত নয় সেটা প্রমাণিত হল তিন বছর পর গুরুস্থানীয় জোলিও কুরী স্টকহোমে নোবেল প্রাইজ বক্তৃতায় এই সম্ভাবনার কথা সমর্থন করায়। এমন কি এই অমিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে বিশ্ববিধ্বংসী বিস্ফোরণও ঘটান যেতে পারে তারও আভাস দিলেন জোলিও। কিন্তু যুবকটি অস্বস্তি মনে করলেন. বিজ্ঞানীরা জুলিওর বক্তব্যকেও যেন সে রকম গুরুত্ব দিলেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা নবাবিষ্কৃত সেই নিউট্রনকে নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠলেন। কেম্ব্রিজ, প্যারিস, রোম, জুরিখ, কোপেনহেগেন, বার্লিনের গবেষণাগারগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল নিবিড় গবেষণায়! বহির্বিশ্ব ভুলে গেলেন যুবকটি।

কিন্তু বহির্বিশ্ব তাঁকে ভুলল না। যুবকটি এতদিন বার্লিনের রাজপথে যে দর্পিত স্বস্তিকা চিহ্নগুলোর পদধ্বনিকে কানে তোলেননি, একদিন শেষরাত্রে সেই মদমত্ত পদধ্বনি তাঁর নিভৃত কক্ষের সামনে এসে থামল। এবং সেই স্বস্তিকা চিহ্নের তীক্ষ্ণধার প্রশ্নের ঝলকে এতদিন পর, জীবনে এই প্রথম, তিনি জানতে পারলেন, ওঁর ধমনীতে নাকি খাঁটি আর্য রক্ত প্রবাহিত নয়। জন্মভূমি জার্মানকে ও স্বদেশ বলে ভাবলেও

হিটলারের নতুন জার্মান ওঁদের বেজাত বোঝা হিসেবেই বহন করছে। বহুদিন পর পরমাণুর পর্দা সরিয়ে মা'র মুখ ও'র চোখের সামনে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। ও'র চোখ দু'টো স্মৃতির ভারে ভিজে উঠল।

এবং বহুদিন পর তরুণ বিজ্ঞানী সেদিন গবেষণাগারের জানলা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকালেন। স্বদেশ জার্মানের দিকে।

কিন্তু শিউরে উঠলেন তিনি। এ কোন জার্মান? সুস্থ চেতনা, সৌন্দর্যের সাধনা, মানবতার উপসনা পৈশাচিক উল্লাসের সামনে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। দিকে দিকে অ-জার্মান পুস্তকের বহ্ন্যুৎসব চলছে। তার ভেতর পুড়ে ছাই হচ্ছে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড, এরিখ মাবিয়া রেমার্ক! সে বহ্নিজিহ্বা অ-জার্মান, ইহুদি, লিবারেল, কমিউনিষ্ট অন্বেষণে বাতাসে লক্‌লক্‌ করে ছুটে বেড়াচ্ছে। আর, সে বহ্নিবণ্যার অসহ্য তাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য অসহায় ভাবে ছুটাছুটি করছেন বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইন, সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, মাইটনার; সাহিত্যিক হেইনরিখ মান, টমাস মান, আর্ন্যল্ড ৎস্নুইগ, লিও ফয়েখট্‌ ওয়াঙ্গার; সুরশিল্পী এ্যাডলফ বুশ, ফ্রিজ বুশ, টোসকানিনি, আর্নেষ্ট ব্লক; স্থপতি শিল্পী এরিক মনডেলশন, ওয়াটাব গুপিয়াস, ভাস্কব বেনো এলর্কা, শিল্পী পিকাশো, ক্লী।

দেখতে দেখতে সে বহ্নিশিখা একদিন গবেষণাগারের রন্ধ্র পেরিয়ে তাঁর দিকেও ছুটে এল। আতঙ্কিত, হতবুদ্ধি, বিহ্বল বিজ্ঞানী প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করলেন। কারা যেন পিছে তাড়া করে ছুটছে। তাঁর স্বদেশ জার্মান তাকে তাড়া করছে? তাঁর গুরুস্থানীয় জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক, আটো হান তাঁরা কোথায়? তাঁরা কি ওর উদ্ধারে এগিয়ে আসবেন না?

তরুণ বিজ্ঞানী যখন চেতনা ফিবে পেলেন তখন তিনি আমেরিকায়। স্বদেশ জার্মান থেকে বিতাড়িত।

অপমানিত, ক্ষুব্ধ, আতঙ্কিত তরুণ বিজ্ঞানীব সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পরাজিত বিবেকেব বাতিল মানুষটা মাঝে মাঝে নিজের

দিকে সভয়ে তাকিয়ে দেখছেন। আর কোন্ পথ খোলা থাকল? আত্মহত্যা ছাড়া?

আমেরিকার পথেই পরিচয় হল বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিও জিলার্ডদের সঙ্গে। শুধু জিলার্ড নয়, ইউজিন উইগণার, এডওয়ার্ড টেলর, ফার্মি এবং ফ্যাসিজিম-এর হাতে নিগৃহীত, অপমানিত একদল বিজ্ঞানীর সঙ্গে।

ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার বীভৎস রূপ এঁরা প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। জার্মান সহ-বিজ্ঞানী, যারা এখনও জার্মানের গবেষণাগারে গবেষণারত, বিশেষ করে হাইসেনবার্গ, উৎস্যাকার, অটো হানদের শক্তি প্রসঙ্গে এঁরা অবহিত। হিটলার কি এদের কাজে লাগানর চেষ্টা করবে না? সাফল্যের প্রান্তে উপস্থিত পারমাণবিক শক্তিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে করায়ত্ব করার চেষ্টা করবে না? ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডাঃ আর্নস্ট ক্রীকের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা মনে পড়ে ওঁদের: খাঁটি বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞান নয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সৈনিকের বীর-বিজ্ঞান, সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।

ভবিষ্যৎ-আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন ওঁরা। আর কেউ না জানলেও ওঁরা বিজ্ঞানীরা জানেন নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু ভাঙ্গনের তত্ত্বকে কোনক্রমে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারলে, এবং যা অসম্ভব নয়, কী প্রচণ্ড ধ্বংসের সৃষ্টি করতে পারে তা।

নিজেদের ভেতর আলোচনা হল ওঁদের। জিলার্ড ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে। এবং দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হল, এ প্রসঙ্গে আমেরিকার রাষ্ট্রনেতাদের সচেতন করা প্রয়োজন। স্বয়ং জিলার্ড মেমোরেণ্ডাম প্রস্তুত করলেন। মুখপাত্র হতে স্বীকৃত হলেন আইনস্টাইন। ১৯৩৯ সালের ১১ই অক্টোবর সেই আবেদন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের হাতে পৌঁছে দিলেন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ও উপদেষ্টা আলেকজাণ্ডার স্যাক্স। শুধু পৌঁছে দিলেন না, এ সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করে এ প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য সুপারিশও করলেন।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট খুব উৎসাহিত হলেন না। তবু আর্মি, নেভি ও অসামরিক প্রতিনিধি নিয়ে তিন জনের একটি কমিটি গঠন করলেন বিষয়টি প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করে তাঁকে অবহিত করানর জন্য।

জিলার্ডরা অধীর উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে লাগলেন। কে জানে, কবে সংবাদ এসে যায় জার্মান পারমাণবিক অস্ত্র আয়ত্ব করে ফেলেছে। বেশ কয়েকটা বৈঠক বসল কমিটির। কিন্তু সব কেমন যেন ঢিমে তালে চলছে। রাষ্ট্রনায়করা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না সম্ভাবনার কথাটা।

১৯৪০ সালের ৭ই মার্চ আইনস্টাইন দ্বিতীয় পত্র দিয়ে আবার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে সতর্ক করলেন। ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন প্রসঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রনায়করা আগ্রহী হয়ে উঠেছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, কালক্ষেপের সময় নেই।

কিন্তু তবু আশানুরূপ সাড়া নেই। ইংলণ্ডও তখন চুপ করে বসে নেই। সেখানেও দ্রুত গবেষণা চলছে। আজকের আত্মঘাতী, সেদিনের তরুন বিজ্ঞানী, ১৯৩২ সালে বার্লিনের গবেষণাগারে বসে যাঁর নিউট্রন আবিষ্কারের সংবাদে চমকে উঠেছিলেন, সেই বৃটিশ বিজ্ঞানী চ্যাডউইক তাঁর ধ্রুব সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করা সম্ভব। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে থমসন্ কমিটি বৃটিশ পরমাণু গবেষণার ভিত্তিতে একটি পূর্ণ বিবরণ পেশ করে জোরের সঙ্গে জানান, যুদ্ধ শেষ হবার আগেই এ্যাটম বোম্ তৈরী করা সম্ভব। এবং প্রয়োজন। কিন্তু তাও সদ্য ফলপ্রসূ হল না! অবশেষে জাপানের পার্লহারবার আক্রমণের ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে প্রেসিডেন্ট সচেতন হলেন। জিলার্ডের পারমাণবিক শক্তির সামরিকীকরণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ গৃহীত হল। এবং সরকারীভাবে বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ সাহায্য ও প্রযুক্তিগত সহায়তার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল। বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাতেই শুরু হল সভ্যতার ইতিহাসের এক সংকটময় ভবিষ্যতের।

জিলার্ডদের সঙ্গে একই স্বপ্নের সরিক হিসেবে এ জয়ে উল্লসিত

হলেন তরুণ বিজ্ঞানী। হিটলারের হাত থেকে ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতাকে রক্ষার গৌরব অর্জনের সুযোগ পাবেন ভেবে তৃপ্তি ও গর্ববোধ করলেন।

কিন্তু অল্প কিছুদিনের ভেতরই কেমন যেন সন্দেহ হল, তাঁরা, অমার্কিন ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরাই, মার্কিন সরকারকে এ প্রসঙ্গে বহু চেষ্টায় সচেষ্ট করা সত্বেও, অমার্কিন বলেই তাদের যেন এখন দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। নানারকমের প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হচ্ছে তাদের কাজে। এমন কি ফার্মির মত বিজ্ঞানীকেও ইতালীয় বলে সহজভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না।

এতে সবাই অতৃপ্তি ও অস্বস্তি বোধ করলেন। তারপর ক্রমে প্রতিবাদ শুরু হল। এবং শেষ পর্যন্ত বোধহয় এই অমার্কিন বিজ্ঞানীদের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেই, সেই অবিশ্বাসের আড়াল সরিয়ে নেওয়া হল।

তরুণ বিজ্ঞানী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার ফিরে গেলেন তাঁর গবেষণাগারে। আবার তাঁর জগৎ কেন্দ্রীভূত হল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুতে।

কিন্তু কিছুদিনের ভেতরই বহির্জগৎ প্রসঙ্গে আর একবার সচেতন হতে হল এই তরুণ বিজ্ঞানীর। একদিন সভয়ে অনুভব করলেন তিনি, বহির্জগতের কোলাহল থেকে সাত হাজার মাইল উচ্চের যে নির্জন বিচ্ছিন্ন গবেষণা-নগর লস আলমোসকে তিনি বিজ্ঞানীর তীর্থ ভেবে তৃপ্ত ছিলেন, ধীরে ধীরে কখন যেন সেটা অলক্ষ্যে পারমাণবিক-কারাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। চারদিকে অদৃশ্য চোখ পাহাড়া দিচ্ছে তাঁদের গতিবিধি। অদৃশ্য কান ফোন ট্যাপ্ করছে। অদৃশ্য হাত ব্যক্তিগত চিঠিপত্র খুলে দেখছে। বিজ্ঞান-প্রতিভার অদৃশ্য চালক হিসেবে কাজ করছে সমর বিভাগ। অথবা বলা যেতে পারে, ভাগ্যান্বেষী এক সমরনায়ক—লেস্‌লি রিচার্ড গ্রোভস।

অবশ্য আত্মসম্মানে, বিবেকে আঘাত লাগলেও বৃহত্তর মানব-স্বার্থের কথা ভেবে মুখ বুজে এ শাসন মেনে নিলেন তরুণ বিজ্ঞানী। সহকর্মীদের

সঙ্গে অহোরাত্র অক্লান্ত কাজ করে যেতে লাগলেন। আরাধ্য সাফল্য তখন প্রায় করায়ত্ব।

কিন্তু তার আগেই যুদ্ধ সমাপ্তির মুখে পৌঁছাল। মানব সভ্যতার আতঙ্ক হিটলার বশ্যতা স্বীকার কবল। একক জাপান তখন অনুল্লেখ্য। তারও আসন্ন পরাজয় সুস্পষ্ট। বিজ্ঞানীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। হিটলারের হাতে তাহলে শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র পৌঁছায় নি! এবং উৎসাহিত হলেন। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োজন তাহলে ফুরোল! এবার এই নবাবিষ্কৃত পারমাণবিক শক্তিকে মানব কল্যাণে প্রয়োগ করলে যে অবিশ্বাস্য স্বপ্নের জগৎ গড়ে তোলা যাবে তার কল্পনায় রোমাঞ্চিত হলেন তরুণ বিজ্ঞানী।

কিন্তু জয়ের আনন্দে সাময়িকভাবে তাঁরা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন, সরল বিশ্বাসে আরব্যোপন্যাসেব যে জিনকে তাঁরা ঘরা থেকে বের করেছেন সেই জিন আজ তাঁদের আজ্ঞাধীন নয়, রক্তোন্মাদ সমরনায়কদের ক্রীতদাস।

সমরনায়ক গ্রোভস তখন উল্লাসে মাতোয়ারা। যে গতিতে কাজ এগোচ্ছে তাতে ১৯৪৫এর গোড়াতেই কয়েকটি বোমা প্রস্তুত হয়ে যাবেই। তখন তাঁর একমাত্র আতঙ্ক, এই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রটি তৈরীর আগেই যুদ্ধ না শেষ হয়ে যায়! দেড় লক্ষ কর্মী এবং কুড়ি লক্ষ কোটি ডলারেব বিনিময়ে তিনি যে কৃতিত্ব অর্জন করতে যাচ্ছেন তা থেকে বঞ্চিত না হন!

কিন্তু বিজ্ঞানীদের বিবেক ততদিনে মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। হিটলারের পতন এবং যুদ্ধের অবসানের পরও তাঁরা সামরিক প্রয়োজনে পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পেলেন না। মনের দিক দিয়ে তরুণ বিজ্ঞানীটিও এঁদের চিন্তার সরিক ছিলেন।

তাই তিনি দেখে উৎসাহিত হলেন, জে, জেফ্রিসের সভাপতিত্বে পরমাণু বিজ্ঞানীদের একটি সমিতি গঠিত হল। সে সমিতি থেকে পার-

মাণবিক বোমার সামরিক প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন পেশ করা হল।

দেখে উল্লসিত হলেন তরুণ বিজ্ঞানীটি, একই আবেদন নিয়ে সক্রিয় ভাবে এগিয়ে এসেছেন ডেনমার্কের বিশ্ববিখ্যাত বর্ষীয়ান পরমাণু বিজ্ঞানী নীল বোরও। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি দেখা করেছেন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে।

এবং একদিন শুনে বিস্মিত হলেন, রাষ্ট্রপাত রুজভেল্টের ব্যক্তিগত বন্ধু ও উপদেষ্টা হিসেবে যে আলেকজাণ্ডার স্যাকস একদিন জিলার্ড ও আইনস্টাইনের প্রথম আবেদন বহন করে নিয়ে গিয়ে ছিলেন, অক্লান্ত চেষ্টায় রুজভেল্টকে দিয়ে পারমাণবিক বোমার পরিকল্পনা সরকারীভাবে গ্রহণ করিয়ে ছিলেন, তিনিও এই অস্ত্র প্রয়োগ বন্ধেব একই অনুরোধ নিয়ে সাক্ষাৎ করেছেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে।

তরুণ বিজ্ঞানীটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, এবার, এবার তাহলে বিজ্ঞানীদের মানবতাবোধই জয়ী হবে!

কিন্তু জানতেন না তিনি, তখন সতর্ক গোপনতায় জেনারেল গ্রোভস সমর দপ্তরের প্রতিনিধি, রাষ্ট্রনীতি বিষারদ, বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য কয়েকজন বিশ্বস্ত বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রথম বোমা বিস্ফোরণের লক্ষস্থল ঠিক করছেন। এবং সর্বসম্মতি ক্রমে জুয়ার তাসের মত বেছে নেওয়া হয়েছে এমন দুটি শহরকে, যাদের সঙ্গে জাপানের সমরায়োজনের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই—হিরোশিমা, নাগাসাকিকে। এবং ঠিক হয়েছে বোমাবর্ষণের পূর্বে বেসামরিক অধিবাসীদের সতর্ক করা হবেনা এই নতুন ধরণের বোমাটি প্রসঙ্গে।

কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল একান্ত গোপনীয়। কিন্তু কি করে যেন ততো-ধিক গোপন রন্ধ্রপথে এ-কথা বাইরে বেরিয়ে গেল। শিউরে উঠলেন বিজ্ঞানীরা। অস্থির হয়ে উঠলেন জিলার্ড। যে জিলার্ড সর্বপ্রথম প্রায় একক অক্লান্ত চেষ্টায় রাষ্ট্রনেতাদের সচেতন করে তুলেছিলেন এই অস্ত্র প্রসঙ্গে, তিনিই আবার সেই আইনস্টাইনকেই মুখপাত্র করে রাষ্ট্রপতি

রুজভেল্টের কাছে আকুল আবেদন জানালেন এ সিদ্ধান্ত বাতিল করবার জন্য। কিন্তু সে আবেদনপত্র খুলে পড়ার আগেই অকস্মাৎ ১৯৪৫ এর ১২ই এপ্রিল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যু হল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন মিঃ ট্রুম্যান। বিজ্ঞানীরা অধীর প্রতীক্ষায় থাকলেন, এই নতুন রাষ্ট্র-নায়কের হাতে তাঁদের আবেদন কি অনুমোদিত হবে না? তরুণ বিজ্ঞানীটিও লস আলমোসের কারানগরীতে বসে ঈশ্বরের কাছে অহোরাত্র প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন, শুভ বিবেকের এ আবেদন গৃহীত হোক!

কিন্তু ঈশ্বরের আগেই সারা দিলেন জেনারেল গ্রোভস। একদিন ওপর থেকে গোপন আদেশ এল তরুণ বিজ্ঞানীর কাছে। ১৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোর এক নির্জন মরু প্রান্তরে প্রথম বোমাটি পরীক্ষিত হবে, সেখানে উপস্থিত থাকার আদেশ।

অনেক বিনিদ্র রজনীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল আজ পরীক্ষিত হবে। কিন্তু আনন্দ নয়, উৎকণ্ঠা আতঙ্ক এবং এক গোপন দুর্বহ অপরাধবোধ বহন করে ১৬ই এপ্রিলের সেই নির্জন প্রান্তরে উপস্থিত হলেন তরুণ বিজ্ঞানীটি। তখনও সূর্য ওঠে নি, ভাল করে ভোরের আলো ফোটে নি। আয়োজন পর্ব শেষ হল। ওঁরা তিনটি দলে বিভক্ত হলেন। পরীক্ষা-স্তম্ভ থেকে সাত মাইল, দশ মাইল এবং পঁচিশ মাইল দূরে এক এক দল পর্যবেক্ষক প্রতীক্ষায় দাঁড়ালেন। রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনতে লাগলেন।

তারপর ধীরে ধীরে সেই চরম মুহূর্ত এল। নিঃশব্দ অশুভ ছায়ার মত একটি হাত যান্ত্রিক সুইচ্‌টার ওপর নেমে এল। যন্ত্র প্রাণ পেল। চঞ্চল গতিতে তার পরিকল্পিত কাজ শুরু হল। অধৈর্য উত্তেজনা। অজানা আশঙ্কা।

শেষ মুহূর্তে মানসিক ভারসাম্য হারানো তরুণ বিজ্ঞানীটি হয়তো চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন, থা-মো-ও। কিন্তু তার আগেই সেই ভয়ঙ্কর বিষ্ফোরণ ঘটে গেল। সহস্র সূর্যের ঝলক। অসহ্য উষ্ণ উত্তাপের স্রোত। এবং গগন বিদারী প্রচণ্ড বিষ্ফোরণের শব্দ।

দশ মাইল দূরের আশ্রয়ে থেকেও নিচে ছিটকে পড়লেন জনৈক

পর্যবেক্ষক। আতঙ্কিত বিজ্ঞানিদের চোখের সামনে পরীক্ষিত হল পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র।

বৈজ্ঞানিকরা আতঙ্কিত হলেও এ-সাফল্যে প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ল মার্কিন সামরিক বিভাগ। পারমাণবিক সংস্থার সামরিক অধিকর্তা লেসলি রিচার্ড গ্রোভসদের একটি মাসও তড় সইল না। শুভবুদ্ধির, বিবেকের, মানবতাবোধের সমস্ত আবেদন বিদীর্ণ করে পূর্বনির্ধারিত হিরোশিমার ওপর বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হল।

৬ই আগষ্ট ১৯৪৫। ইতিহাস হিরোশিমার ওপর তার বীভৎসতম বিস্ফোরণ অবলোকন করল।

ইতিহাস হয়তো নির্লিপ্ত, কিন্তু সেই দিন থেকে হিরোশিমা নাকা-সাকির লক্ষাধিক প্রেতাত্মার করুণ দীর্ঘশ্বাস বিষিয়ে তুলল সেই তরুণ বিজ্ঞানীর জীবন। দুবহ আত্মগ্লানি জীবন দুর্বিসহ করে তুলল। তারই পরিণতি আজের এই আত্মহনন। কিন্তু কই, কোন রাষ্ট্রনায়ক, সমর-নায়ক, তারা তো আত্মহত্যা করছে না? দংশিত হবার মত বিবেক নেই বলে?

পাশের বাড়ির রেডিও হঠাৎ সরব হয়ে ওঠে। ঘুম ঘুম আবেশের ভেতরই সচেতন হয় গোপাল।

ঃ সমগ্র বিশ্বের শিশুদের তরফ থেকে পাইলটদের বিরত হবার জন্য প্রার্থনা জানান হয়েছিল। পাইলটরা এ আবেদনের মুখে কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন। কিন্তু তারপর সহানুভূতির সঙ্গে জানিয়েছেন, শিশুদের দিয়ে বোধ হয় এ আবেদন বয়স্করাই করাচ্ছেন। কিন্তু আজের শিশুরা হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর স্বরূপ জানবার আগেই, তাদের শৈশব স্বপ্ন চোখে নিয়েই, যদি আজ মৃত্যুর সাক্ষাৎ পায়, সেটা তাদের পক্ষে আশীর্বাদ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

ঘুম ঘুম চেতনায় সে-দিনের শেষ সংবাদ শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে গোপাল। গভীর ঘুমের ভেতর তলিয়ে যায়।

২

পবদিন ঘুম ভাঙ্গল গোপালেব ফায়াব ব্রিগেডের শব্দে। একটা তার-স্বর বিপদ সূচক ঘণ্টাধ্বনি গলিব ভেতর থেকে বড় রাস্তার দিকে ছুটে গেল।

রোদ এসে পড়েছে ঘরে। হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে ঘড়িটা তুলে নেয় গোপাল। সাতটা।

কালকের ক্লান্তির অবশেষ এখনও গায়ে জড়িয়ে আছে। একটা আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসে গোপাল। সামনের দেওয়ালের দিকে চোখ পড়ে। ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে এ তিনটা দিন বাদে সব তারিখগুলো কে যেন কেটে বাদ দিয়েছে। কালকের দিনটিও লাল পেন্সিলে কাটা। কে হতে পারে? মা বাবার পক্ষে সম্ভব নয়। কৃষ্ণা? ইতু?

গোপাল উঠে একটা সিগারেট ধরায়। তারপর আস্তে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ায়।

ডাষ্টবিনটা রাস্তার ওপর উল্টে পড়ে আছে। লাইট পোষ্টের বাল্‌ব ভাঙ্গা। একটা পোষ্টের মাথা থেকে কেটে দেওয়া তারটা ফুটপাতের ওপব ঝুলে পড়েছে। গোপাল সামান্য চিন্তিত হয়। আজকের গোটা দিনের এটুকুই যেন ভূমিকা।

আপনার চা।

গোপাল ফিরে তাকায়। কৃষ্ণা। ক্লান্ত ; বিষণ্ণ। কালকের বিনিদ্র রাতের স্বাক্ষর ওর চোখের কোলে।

মা পাঠিয়ে দিলেন।

কেমন কৈফিয়তের মত শোনাল কথাটা। মা বোধ হয় ওকে কাজে জড়িয়ে রাখছেন।

গোপাল চা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে, কাল রাতে কি খুব গোলমাল হয়েছে ?

কৃষ্ণা ক্লান্ত স্বরে বলল, সারা রাত।

কাল সারা রাত ঘুমায় নি কৃষ্ণা। গোপাল বাড়ির বাইরে থাকলে হয়তো ও-ও ঘুমাতে পারত না। যে মুখগুলো পাশে, অভ্যেসের ভেতর, আছে বলে ওর চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে, দূরে থাকলে সেই মুখগুলোই বড় হয়ে উঠত। সমস্ত চিন্তায় জড়িয়ে গিয়ে ওকে বিচলিত করত।

কৃষ্ণা এত চাপা ! ও যে বিচলিত হয়েছে সেটুকু প্রকাশ করতেও যেন সঙ্কোচ ! ও কি নিজেকে এই সংকটে এ পরিবারের ওপর বাড়তি বোঝা ভেবে সঙ্কুচিত হচ্ছে। কিন্তু এ সংকটতো পরিবার, পাড়া, প্রদেশের গণ্ডী অনেক আগেই ভেঙ্গে দিয়েছে। গোটা পৃথিবী এখন একই আতঙ্কের আশ্রয়ে একটি পরিবার।

চা-টা শেষ করে আলনা থেকে তোয়ালেটা তুলে নিল গোপাল। তৈরী হয়ে একবার বেরুন প্রয়োজন।

বাথরুমে যেতে যেতে বাবার বন্ধ ঘরের ভেতর কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে ভেতরের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে।

দরজা আগলে দাঁড়িয়ে মা। কিন্তু মা'র এ রূপ জীবনে কোনদিন দেখেনি ও। চাপা ক্ষোভ ও ক্রোধে ফেটে পড়ছে যেন মা'র চোখ মুখ। বাবা সামান্য অসহায় ভঙ্গীতে সামনে দাঁড়িয়ে। অথচ মাঝে মাঝে সন্দেহ হত গোপালের, একই সংসার সমুদ্রে মা বাবা যেন দুটো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। পরস্পরকে দেখা যায়। প্রয়োজনে দু'চারটা কথাও বলা চলে। কিন্তু পরস্পর নির্ভরতা নেই।

মা দাঁতে চেপে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ ?

বাবা অপরাধী স্বরে বললেন, একটু বাইরে যাচ্ছি। এই সিন্দুকের চাবিটা রাখ। ছেলেমেয়েদের দিও। ওদের সঙ্গে দেখা করার মুখ নেই আমার। আজীবন টাকা টাকা করে কোনদিন ওদের আমি স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখতে দিই নি। সামান্য ক'টি টাকা নিজের প্রয়োজনে সঙ্গে নিচ্ছি। তাছাড়া আমার সমস্ত জীবনেব সঞ্চয় ঐ সিন্দুকে থাকল, ওদের দিও।

মা শ্লেষের সঙ্গে বললেন, শেষ দু'দিনের জন্য এ দাক্ষিন্যটুকু ওদের না দেখালেও চলবে !

বাবা গভীর স্বরে বললেন, শেষ নাও হতে পারে। নিশ্চয়ই এ সংকট কোনভাবে কাটবেই। তাহলে চিরদিনের জন্যই ওদের জন্য থাকল এ চাবি। এ আঘাত বোধ হয় আমার দরকার ছিল।

মা নির্দয়ভাবে তীক্ষ্ণ হেসে বললেন, এত পরিবর্তন! তাহলে সেটুকু নিজেই ছেলেমেয়েদের জানিয়ে যাও না, ওরা খুশী হবে।

বাবা একটা বাতিল মানুষের মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর মুখ তুলে মা'র চোখে চোখ রেখে বললেন, তোমার কাছেও বোধ হয় আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। অবশ্য তুমি আজীবন পুজো-আচ্চা নিয়েই ছিলে—।

মা'র চোখ কেমন যেন থমথমে হয়ে এল। তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন মা, কিন্তু কেন ছিলাম সেকথা কোনদিন ভেবে দেখেছ? তোমার কাছ থেকে জীবনের সমস্ত দিকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষোভে অপমানে অভিমানে সেই ষোল বছর বয়সেই জপের মালা হাতে তুলে নিয়েছিলাম। না হলে আর দশটা মেয়ের মত সাধ আহ্লাদ কি আমারও ছিল না।

মা'র স্বর কেমন যেন ভারী হয়ে এল। আবেগে কেঁপে উঠল ঠোঁট দু'টো।

তোমার কাছ থেকে প্রতারিত হয়েই আমি এতদিন নিজেকে প্রতারণা করে এসেছি। নিঃশেষ করেছি। সে ক্ষতি আজ কে পূরণ করবে ? কে পূরণ করবে ?

দু'হাতে মুখ ঢাকলেন মা। বাবার চোখ দু'টো ভারী হয়ে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এ অভিযোগ, এই দীর্ঘ পুঞ্জিত ক্ষোভের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন বলেই হয়তো।

গোপাল নিঃশব্দে সরে যায় জানলার কাছ থেকে। সমস্যাটা মা বাবার নয়। শাশ্বত দু'টি নরনারীর। হৃদয়ের বোঝাপড়ার এসব ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি শুধু অশোভন নয়, অবাঞ্ছিতও।

এ পর্বটাকে দ্বিতীয় দিনের ভূমিকা বলে মনে হল গোপালের। কালকের আচমকা সংবাদে মানুষ উত্তেজিত হয়েছিল, হয়তো কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদও পেয়েছিল, কিন্তু সমস্ত চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে নি, অন্তিম আসন্ন। জীবনেব প্রচলিত মূল্যবোধগুলো তাই সামান্য নাড়া খেয়েছে, কিন্তু ভিত নড়ে নি। অবচেতন থেকে কিছু কামনা লিপ্সা নড়ে চড়ে উঠতে চেয়েছে, কিন্তু মানুষ তখনও মনে আশা পুষছে বলে শাসন করেছে নিজেকে।

কিন্তু কালকের গোটা দিন বাত মানুষ সংকট উত্তরণের যে আশা পুষছিল মনে, তা ব্যর্থ হল। একটা গোটা রাত পেল সবাই ঘটনাটা উপলব্ধি করতে। রাতের দর্পণে মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ দেখে শিউরে উঠল। কি পাই নি তার হিসেব মিলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল মানুষ। হাট ভাঙ্গার মুখেই তো মানুষ হিসেব মিলায়! সকালে উঠেই দু'টো গরমিল হিসেবের সাক্ষাৎ পেয়ে এ কথা নতুন করে উপলব্ধি করল গোপাল।

ইতুর কথা মনে পড়ে গোপালের। সামান্য কৌতূহল বোধ করে। ইতু কি আজও পড়ছে?

দরজাটা আধ ভেজান। নিঃশব্দে বসে ইতু। সুদূরবিদ্ধ উদাস দৃষ্টি। কোলের ওপর একটা খোলা বই। ইতু কি আসন্ন ধ্বংসের দর্পণে ওর পুরো অতীতের প্রতিবিম্ব দেখছে? স্বেচ্ছায় হারিয়ে আসা মণিমুক্তোগুলোকে চিনবার চেষ্টা করছে?

আস্তে ওর পিছে এসে দাঁড়ায় গোপাল। কোলের ওপর খোলা ওমরখৈয়াম।

বিরাট ধ্বংসের এই বিশ্বগ্রাসী তীরে
একটি পলক শুধু ঘিরে,
জীবন উৎসের স্বাদ জেনে নেওয়া আজ
শুধু মাত্র নিমেষের কাজ!
দেখ ওই একে একে আকাশের দীপ নিভে যায়,
না জানি সে কোন্ শূন্যে ব্যর্থতার নিষ্ফল উষায়
যাত্রীদল হতেছে উধাও ;
নাও ওগো, ত্বরা করে নাও।

দীর্ঘশ্বাস পড়ে গোপালের। জীবন-উৎসের স্বাদ!

হঠাৎ টের পেয়ে ফিরে তাকায় ইতু। অসময়ে ঘুম ভাঙ্গার তন্দ্রা ওর চোখে। কেমন এক বিহ্বলতা।

আস্তে ওর মাথায় হাত রাখে গোপাল। কিরে, ভয় করছে?

ইতু কোন জবাব দেয় না।

দূর বোকা মেয়ে! দেখিস শেষ পর্যন্ত একটা ফয়সালা হবেই। এ কি ঘটতে পারে কখনও। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে গোপাল।

ইতু হঠাৎ অনুনয়ের সুরে বলে, দাদা, আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাবে?

সামান্য অবাক হয় গোপাল। কোথায়?

কেমন যেন অসংলগ্নভাবে বলে ইতু, বাইরে। যেখানে খুশি। তুমি তো আমাকে বাইরে বের করার জন্য পাগল ছিলে। কত বকেছ। তখন যে সব জায়গায় নিয়ে যেতে চাইতে? জান, আমার আর ভয় করছে না। একেবারে ভয় লাগছে না। এতদিন একটা মিথ্যে ভয়ের খোলসে বসে ছিলাম বলে নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে।

গোপাল গভীর দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা

করে ইতুকে। তারপর বলে, নেব না কেন? তবে বাইরের অবস্থাটা আগে দেখে আসি, তার পর।

ইতু কোন জবাব দিল না। আবার বাইরে চোখ ফিরিয়ে নিল।

নিচে নেমে এল গোপাল। বাথরুমে ঢোকার মুখে মা ওকে ডাকলেন। দাঁড়াল গোপাল। মা এগিয়ে এলেন। সেই আগের মা।

কিছু ভাবলি?

কি প্রসঙ্গে মা?

মা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, এখন আর কোন প্রসঙ্গ আছে বল?

গোপাল আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল, এত ভাবছ কেন? দেখ শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসা হয়ে যাবেই।

মা ওর চোখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন। তুই কি এখনও বিশ্বাস করছিস না?

গোপাল হাসবার চেষ্টা করে। বলে, বর্তমানটুকু ঘটছে বলেই বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কিন্তু শেষটুকু কেমন যেন এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।

মা সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বললেন, কিন্তু তোর বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তো চলবেনা সব? অনেকেই বাইরে পালিয়ে যাবার কথা ভাবছে শুনলাম।

গোপাল আস্তে বলল, ওটা মূর্খের ভাবনা। তাতেও ফলটা একই হবে। তফাৎ শুধু, বাইরে মরা আর বাড়িতে বসে মরা। সুতরাং এ প্রসঙ্গে এখন যত কম ভাবা যায় ততই লাভ। শুধু নির্লিপ্ত দর্শকের মত সব কিছু দেখে যাও।

মা ওর চোখে চোখ রাখেন। সহানুভূতির সুরে বলেন, তোর মত হাঁসের পালক মন পেলে লোকে বেঁচে যেত। কিন্তু তুই কি আবার দেখতে বেরুবি নাকি এখন? এ দু'টো দিনও কি তুই বাড়িতে থাকতে পারিস না?

এ অনুযোগের স্নেহটুকু তৃপ্তি দেয় গোপালকে। একটু হেসে

তরল স্বরে বলে, সত্যিই যদি সে রকম কিছু ঘটে, শেষ সময়টুকু তোমাকে ছাড়ছি নাকি ?

মা সামান্য অস্বস্তি ছাড়া নিজেও খুব একটা ভয় পেয়েছেন বলে মনে হয় না। যেটুকু ভাবছেন তাও নিজের জন্য নয়, পরিবারের জন্য। মা যাওয়ার আগে বললেন, তাহলে একবার সৌমেনের ওখানে যাসতো। কাল থেকেই বারে বারে ছেলেটার কথা মনে পড়ছে। যদি রাজী হয় তাহলে বরং নিয়েই আসিস।

সৌমেনের উল্লেখে মনে মনে লজ্জিত হয় গোপাল। ওর মনে পড়া উচিত ছিল। কাল সারাদিনের ভেতর একবার যাওয়া উচিত ছিল ওর ওখানে। কালকের দিনটা এমন ঝড়ের মুখে কেটে গেল !

বাথরুমে ঢুকে কলটা পুরো খুলে দিল। তোড়ে জল পড়তে শুরু করল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া জলের দিকে তাকিয়ে থাকে গোপাল। অনেকদিন পর সচেতন ভাবে জলের শব্দ শোনে।

সামনের বাড়ির রেডিওটা হঠাৎ সরব হয়ে ওঠে। মুহূর্তে কলটা বন্ধ করে কান খাড়া করে গোপাল।

ঃ গতকাল গভীর রাত্রে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দলমত নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রকে বর্তমান সংকট প্রসঙ্গে জরুরী আলোচনার জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। এবং বহু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই পৌছে গিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে আর কিছুক্ষণের ভেতরই প্রথম বৈঠক শুরু হবে।

গোলটেবিল বৈঠকটার কথা জানত না গোপাল। রাত্রেও ঘোষনা করা হয়েছিল কিনা কে জানে। নিজেদের রেডিওটা সারাতে না দিলে, এবং কানের কাছে সারারাত খোলা থাকলে, হয়তো জানতে পারত সংবাদটা। সংবাদটায় সামান্য আশান্বিত হয় গোপাল। হয়তো এবার একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। সত্যিই এখনও ভাবতে পারছে না ও, এতবড় একটা বিপর্যয় শেষ পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাড়াতাড়ি মুখ

ধুয়ে বেরিয়ে পড়ে ও বাথরুম থেকে।

তৈরী হয়ে বেরুবে হঠাৎ দরজার মুখে ভীষ্মদার সঙ্গে দেখা। সামান্য অবিন্যস্ত চুল। চোখে মুখে বিনিদ্র রাতের ছাপ। পুরু চশমার নিচে চিরদিনের প্রশান্ত চোখ দু'টোয় সামান্য চাঞ্চল্য।

ভীষ্মদা ভেতরে এসে ঢুকলেন।

কি সাংবাদিক, তোমাদের লেটেষ্ট সংবাদ কি?

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায় গোপাল। স্নেহ না ব্যঙ্গ? ভীষ্মদার সুরে কিসের আভাস?

তবু একটু হাসে গোপাল। এখন আমরাও সংবাদ পাচ্ছি রেডিও মারফৎ।

এবার পরিষ্কার বিদ্রূপের সুরে বললেন ভীষ্মদা, কেন, নিউজ পারস্যু করছ না? সোর্স ট্যাপ করছ না? আরো যেন কি সব গালভরা টার্ম আছে তোমাদের জার্নালিজিমের।

যে ভীষ্মদাকে কোনদিন হালকা সুরে কথা বলতে শোনে নি, হাসি ঠাট্টা করতে দেখে নি, তাঁর গলায় এ সুর শুনে একটু অবাক হয় গোপাল। এবং আহত হয় ওর বৃত্তির প্রতি এই অহেতুক বিদ্রূপে।

সামান্য গম্ভীর স্বরে বলল তাই, আমাদের গালাগাল করে কোন লাভ আছে ভীষ্মদা? এক্ষেত্রে আমাদের –

আচমকা উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন ভীষ্মদা। কেন গাল দেব না? দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, তোমরা, সাংবাদিক সাহিত্যিক শিল্পী অধ্যাপকরা, সাধারণ মানুষকে মিথ্যে ভাঁওতা দাও নি, মানবতার জয় অবশ্যম্ভাবী? ঐ স্কাউণ্ড্রেল ধর্মীয় নেতারা যুগ যুগ ধরে শেখায় নি, সত্যমেব জয়তে? জালিয়াৎ রাষ্ট্রনেতাগুলোর একদিকে গালভরা শান্তির নিরাপত্তার আশ্বাস আর অন্যদিকে বীভৎস অস্ত্র প্রতিযোগিতাই আজ এই চরম বিপদ ডেকে আনে নি? কার, কার ওপর আমাদের আস্থা রাখতে বল? কাকে শ্রদ্ধা করতে বল?

হতভম্ব হয়ে যায় গোপাল। ভীষ্মদার চোখ দু'টো যেন ক্ষোভে

ছুঃখে, অভিমানে ফেটে পড়ছে। গোপাল যতটা বিস্মিত, তার চেয়ে অনেক বেশী সহানুভূতি অনুভব করে ভীষ্মদার জন্য।

এগিয়ে এসে ভীষ্মদার হাত ধরে অনুরোধ জানায়, একটু শান্ত হয়ে বসুন ভীষ্মদা। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন আপনি।

ওর হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলেন তিনি। প্রচণ্ড ব্যঙ্গের সুরে বললেন, থাক, আর ভীষ্মদা ভীষ্মদা করে ছেঁদো শ্রদ্ধা দেখিও না গোপাল। সবই দেখছি, সবই বুঝছি, কিন্তু ছুঃখ, বড় দেরীতে বুঝলাম।

বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ভীষ্মদা। করুণ ব্যথাতুর দৃষ্টিতে ভীষ্মদার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল গোপাল। তার পর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই মিঠুর কথা মনে পড়ে। রোজ সকালে বেরুনর সময় গত কালের সারাদিনের ট্রাম-বাসের টিকিট-গুচ্ছ যে ক্ষুদে বান্ধবীকে উপহার দেবার জন্য ও দায়বদ্ধ। মিঠুও যেন কি করে টের পায়। রোজ সঠিক সময়ে ডাগর চোখ ছু'টো মেলে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। কোনদিন হঠাৎ ভুলে গেলে অভিমান ভাঙ্গাতে রীতিমত সাধ্যসাধনা করতে হয়। ওর মা বাবা মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত হলেও বেশ উপভোগ করেন ওদের সম্পর্কটা। ভদ্রমহিলা হয়তো হেসে বলেন, আপনাদের মান অভিমানের পালা শেষ হলে চা খেয়ে যাবেন।

এই পরিবারের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ নয়। যতটুকু সংশ্লিষ্ট, মিঠুর মাধ্যমে। কিন্তু মনে মনে এই দম্পতিকে শ্রদ্ধা করে ও। নিজের চোখে দেখেছে ও, কী প্রচণ্ড দারিদ্রের সঙ্গে মুখ বুজে সংগ্রাম করে ওঁরা এই সংসার গড়ে তুলেছেন। ভালবাসার বিয়ে ওদের। অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে, প্রাচুর্যের পরিবার থেকে সব সংস্রব ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন মহিলা। কিন্তু এত দারিদ্রের ভেতরও কোনদিন ওঁকে বিমর্ষ দেখে নি গোপাল। ইদানিং ছু'জনেই মোটামোটি ছু'টো চাকরি পেয়েছেন। ভদ্রলোক বোধহয় অফিসের পর ছু'একটা ট্যুশনিও করেন। সংসার এখন সুখের মুখ দেখেছে, ওদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় সেটা।

মেয়েটি ওদের নয়নের মণি। ইদানিং চতুর্দিকে পরাভূত, বিপর্যস্ত জীবন দেখে অভ্যস্ত গোপালের মাঝে মাঝে ওঁদের দেখে অপরাজিত শব্দটার কথা মনে পড়ে।

বাঁক ঘুরে প্রত্যাশী চোখে তাকাল গোপাল। কিন্তু বারান্দা ফাঁকা। কারণটা অনুমান করতে পারল। কিন্তু মিঠুও কি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে ঘটনাটা ?

বারান্দায় গিয়ে উঠল গোপাল। জানলা দিয়ে দেখতে পেল ওঁদের। মিঠু মাঝখানে বসে পুতুল খেলছে। তু'পাশে ওর মা বাবা নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। গভীর নিষ্পলক দৃষ্টি। যেন নবদম্পতি।

একটু আড়ালে সরে ডাকল গোপাল, মিঠু।

কাকু !

ভেতর থেকে মিঠুর দৌড়ে আসার শব্দ শোনা গেল।

মিঠু ! মা'র গলায় আশঙ্কা।

মিঠু ততক্ষণে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গোপাল ওকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিল।

মিঠু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, কাল টিকিট দাওনি কেন ?

রোজের মত হালকা সুরে আজ জবাব দিতে পারল না গোপাল। কথা বলতে গিয়ে ওর গলাটা একটু কেঁপে গেল।

মিঠুর বাবা এসে দরজায় দাঁড়ালেন। পেছনে মা। তু'জনেরই চোখ মুখ থমথমে। ঘরের টেবিলের ওপর একটা সগু আনা ফ্যান। এখনও বাক্স থেকে খোলা হয় নি। নতুন কেনা রেডিওটা কুর্শির কাজ করা ঢাকনায় ঢাকা।

বাবা সামান্য অনুযোগের সুরে বললেন, মিঠু, বিরক্ত কর না।

ইতিমধ্যে গোপাল নিজেকে সামলে নিয়েছে। একটু হেসে বলল, জীবনে বিরক্ত করার লোক আমার একটিই, করুক না একটু বিরক্ত।

তার পর একটু থেমে বলল, খুব ভয় পেয়ে গেছেন, না ? এখনই

এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? দেখবেন শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না।

ভদ্রলোক গভীর বিষণ্ণ স্বরে বললেন, আপনার মত আশাবাদী থাকতে পারলে হয়তো সুখী হতাম ; কিন্তু পারছি না। জীবনের আসল সময়টুকু চূড়ান্ত সংগ্রাম করে সবে একটু সংসারটাকে গুছিয়ে তুলছিলাম। দুঃখ ঠিক সেজন্যও ততটা নয়, যতটা ঐ মেয়েটার কথা ভেবে।

গোপাল মিঠুর গাল দু'টো টিপে আদর করে। আদর করতে করতেই বলে, অত ভাববেন না। যা হবার তা তো হবেই, আগে থেকেই চিন্তা করে মন খারাপ করে লাভ নেই।

ভদ্রলোক বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে বললেন, আপনার মত নির্লিপ্ত হয়তো থাকতে পারতাম, যদি ঐ আপদটা চোখের সামনে না থাকত। চিন্তা ফেরাতে চাই, অন্য কথা ভাবতে যাই, কিন্তু বারে বারে ওকে জড়িয়ে বীভৎস সব কল্পনা এসে ছেঁকে ধরে। কেমন যেন মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, ও যদি অসুখবিসুখেও এখন চোখের সামনে মরে যেত তবু বোধ হয় কিছুটা নিশ্চিন্তে মরতে পারতাম।

হঠাৎ পেছন থেকে চাপা আর্ত চীৎকারে ধমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা, কী যা-তা বলছ ?

ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে গোপালের কোল থেকে মিঠুকে কোলে টেনে নিলেন। গোপালের চোখ দু'টো সামান্য ভারী হয়ে আসে। প্লেনের টিকিটটার কথা মনে পড়ে ওর। পকেটেই আছে ওটা। আস্তে বের করে মিঠুর হাতে দিল টিকিটটা। তারপর নিঃশব্দে নেমে এল বারান্দা থেকে।

সত্যিই যদি একসঙ্গে সব নিশ্চিহ্ন না হয় ? আহত বিকৃত বিকলাঙ্গ কিছু সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বেঁচে থাকে। এই ফুলের মত কিছু শিশুরা ? গোপাল মনে মনে কেমন যেন কেঁপে উঠল। সেই বিধ্বস্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবীর বুকে অসহায় নিরাশ্রয় জীবন্মৃত শিশুগুলির গলিত ক্ষত মুখের ভীড়ে মিঠুর মুখটা কল্পনা করে শিউরে উঠল ও।

দাদাবাবু।

সংবিৎ ফিরে পায় গোপাল। হরিহর। বয়সের চেয়েও আতঙ্কের ভারে নুয়ে পড়েছে যেন। হরিহর একটা চিঠি এগিয়ে দিল।

মিলি দিদিমণি এটা দিয়েছেন।

গোপাল চিঠিটা পড়ে। ভুরু দু'টো সামান্য কুঁচকে ওঠে। চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে বলে, গিয়ে বল, এখন আমার সময় হবে না। পরে সময় পেলে যাবার চেষ্টা করব।

একটু ইতস্তত করে হরিহর। তারপর আস্তে বলে, দিদিমণি ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছে।

গোপাল জানে ওদের সম্পর্কের কথাটা জানত হরিহর। কথার ইংগিতটা বুঝতে কষ্ট হল না তাই। বলল, আতঙ্কটাতো কম নয়, ভেঙ্গে সকলেই পড়েছে।

হরিহর বলেই ফেলল এবার, আপনি গেলে বোধ হয় একটু ভরসা পেত।

গোপালের মুখে একটা কড়া জবাব এসেছিল কিন্তু চেপে গেল সেটা। মিলির ওপর রাগ করে একে আঘাত দিয়ে লাভ কি। মিলিকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে বলেই মালিকের চেয়ে মিলির কথাটাই বেশী ভাবছে ও। গোপাল সামনে এগোতে এগোতে বলল, আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখছি।

রাস্তার দানায় দানায় ভীড়। দোকানপাট প্রায় সব বন্ধ। সর্বত্র উত্তেজিত আলোচনা। বেপরোয়া ভঙ্গীতে দল বেঁধে রাস্তা জুড়ে হাঁটছে লোক। সরকারী বেসরকারী যানবাহন প্রায় সব বন্ধ। ক্বচিৎ কদাচিৎ দু একটা প্রাইভেট গাড়ি কোনক্রমে চলাফেরা করছে। তাও বেশীর ভাগ ডাক্তারের গাড়ি। গত রাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতার কিছু চিহ্ন এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে।

হঠাৎ সামনে একটা পুলিশের গাড়ি দেখে হাত তুলে থামাল গোপাল। নিজের পরিচয় দিয়ে একটা লিফ্‌ট নিল। অফিসের দিকেই যাচ্ছিল গাড়িটা।

অস্থিরভাবে ঘরের ভেতর পায়চারি করছিল মিলি। এক দিনেই আতঙ্কে শুকিয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে। কিছুতেই পুরো চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছে না যেন ঘটনাটা। আর কারো ভাবনার আশ্রয়ে যদি শিশুর মত আত্মসমর্পণ করতে পারত, যেন বেঁচে যেত। মা'র কথা মনে পড়ছে বার বার। সেই আবছা হয়ে আসা মা'র মুখ। আজ যেন নতুন করে আবার উপলব্ধি করে, বাবা ঐশ্বর্য দিতে পারে, সুখ দিতে পারে, কিন্তু বিপর্যয়ের মুখে মায়ের আশ্রয় দিতে পারেনা। কাল মাঝরাতে বাবা একবার ওপরে এসেছিলেন। ওকে জেগে থাকতে দেখে সস্নেহে বলেছিলেন, এত ভয় পাচ্ছিস কেন? ঘুমিয়ে পড়। অনেক রাত হল।

কিন্তু কই, মা'র মত ওকে জড়িয়ে নিয়ে তো বিনিদ্র রাতের আশ্রয় হতে পারলেন না? বরং বাবা চলে গেলে বাবার স্নেহের ভেতরও শুধু যেন কর্তব্যপরায়ণ একটি পুরুষকে মাত্র দেখল মিলি।

বাবার দম্ভে চিড় ধরেছে। কাল সারারাত নিজের চেম্বারে পায়চারি করেছেন পাগলের মত। চারদিকে কোথায় কোথায় যেন ফোন করেছেন। সারারাত ধরে মদ খেয়েছেন। জীবনে এই প্রথম এমন প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আঘাত এসেছে যাকে দম্ভ, দাপট, ঐশ্বর্য, জেদ— কিছু দিয়েই প্রত্যাঘাত করা যায় না। অক্ষম আক্রোশে তাই নিজের চুল ছিঁড়ছেন বাবা।

মা নেই, বাবা নয়, আর একজনের কাছে হয়তো আজ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেতে পাবত, কিন্তু নিজের অবহেলায় সে আশ্রয় হারিয়েছে ও। বাবার ভয়ে।

একটা কথা ছিল।

দরজার দিকে তাকায় মিলি। মিঃ দত্ত। সামান্য অবিন্যস্ত চুল। চোখে মুখে আতঙ্কের সঙ্গে কেমন যেন একটা অসহায় আকুতি। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল মিলি। চিরায়ত অভ্যেসে আজ্ঞাতেই যেন সচেতন হল ও, বাবার কর্মচারী, স্টেনো, ওর কাছে কিছু প্রার্থনা

নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

দত্ত দু'পা এগিয়ে এল। হাত দু'টো জোব করে অবিশ্বাস্য আর্ত-স্বরে বলল, আমার অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য একটু বাড়ি যাওয়া উচিত। কাল সারাদিন বাড়ি যাই নি। বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমার মা ভীষণ, অসুস্থ। আমি পালিয়ে যাবার জন্য বলছি না। পালিয়েই বা যাব কোথায় ? পরে, কিছু নাহলে, খাব কি ? কিন্তু মা'কে একবার একটু দেখা দিয়ে আসা প্রয়োজন।

মায়া বোধ করে মিলি। বলে, বাবাকে বলুন না।

অসহায় ভঙ্গীতে বলল দত্ত, ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করছে। ভীষণ চটে আছেন সবাব ওপব। আপনি যদি একটু বলে দেন। আপনি বললে ঠিক—

আপনি যান।

মিলির স্বরের দৃঢ়তায় থতমত খেয়ে যায় দত্ত। এও যেন আর এক আদেশ।

মিলি গম্ভীর ভাবে বলল, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনি যান।

দত্ত কৃতজ্ঞ দৃষ্টি তুলে ধরে বলল, আমি একটু দেখেই চলে আসব। ঠিক এক ঘণ্টার ভেতরই চলে আসব।

দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দত্ত। মিলি ছোট একটা তৃপ্তি বোধ করে। পরোক্ষ হলেও বাবার দম্ভের মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারায় কোথায় যেন একটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়।

একটু বাদেই হরিহর খোঁজ করতে আসে।

দত্ত বাবু এসেছিলেন ওপরে ?

কেন ?

বাবু খুঁজছেন। ভীষণ রেগে গেছেন।

মিলি আস্তে বলে, আচ্ছা, আমি দেখছি। চিঠি দিয়েছিলে ?

হরিহর সস্নেহে তাকায় মিলিব দিকে। বলে, হ্যাঁ, দাদাবাবু আসবেন বললেন। একটু সময় পেলেই আসবেন।

একটু ইতস্তত করে মিলি।

আর কিছু বলল ?

চোখ নামায় হরিহর। হ্যাঁ, তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। ভয় পেতে না করলেন।

এত আতঙ্কের ভেতরও ছোট্ট একটা খুশীর ছোঁয়া লাগে মিলির চোখে। বাবার সামনে যাবার সাহস বেড়ে যায় ওর।

বাবার চেম্বারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মিলি। বাবা পাগলের মত টেবিল চাপড়াচ্ছেন, ইট মাস্ট বি ডান্। ভারতবর্ষের সবচেয়ে রেপুটেড ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম হয়ে দু'দিনের ভেতর মাত্র একশ ফুট একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে দিতে পারবেন না ?

মুখোমুখি চেয়ারের সুবেশ ভদ্রলোক একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, দেখুন, আগেই তো বলেছি, এটা আমাদের ক্যাপাসিটির প্রশ্ন নয়।

হঠাৎ অসহায় অনুরোধে ভেঙ্গে পড়লেন বাবা, যত টাকা লাগে লাগুক, কালকের ভেতরই আমাকে একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে দিন। আমার লাস্ট ফার্দিং পর্যন্ত আপনাকে দেব আমি। দেশের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, একমাত্র এই বিশ্বাসেই আপনাকে ডেকে ছিলাম।

হতাশ স্বরে বললেন ভদ্রলোক, আমরা নিরুপায়। আপনার আগে অন্তত একশ' জন লোকের কাছ থেকে এ অফার পেয়েছি আমরা। কিন্তু মজুর পাওয়া যাচ্ছে না।

আপনারা একশ' গুণ বেশী পারিশ্রমিক অফার করুন।

করেছি। কিন্তু মজুররা নির্বিকার ভাবে ঐ একই উত্তর দিচ্ছে, বাবুরাতো তাতে বাঁচবেন, কিন্তু আমরা ?

হঠাৎ হিস্টিরিয়া রুগীর মত খিঁচিয়ে উঠলেন মিঃ করঞ্জিয়া, কম্যুনিস্ট, ঐ কম্যুনিস্ট শালারাই ওদের মাথাগুলো খেয়েছে।

সামনের ভদ্রলোক আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

আচ্ছা, আমি তাহলে চলি স্যার।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলে মিলি ঘরে ঢোকে।

মিঃ দত্তকে খুঁজছিলে তুমি ?

হ্যাঁ। সে কোথায় ?

মিলি আস্তে কিন্তু আত্মবিশ্বাস নিয়ে জানায়, বাড়ি গেছেন। এখনই আসবেন বলে গেছেন।

করঞ্জিয়া রাগে ফেটে পড়লেন। হোয়াট্ ? এত সাহস, আমাকে না বলে—

তোমাকে বলতে ভয় পাচ্ছিলেন বলে আমাকে বলে গেছেন। আমি যেতে বলেছি।

মিলির চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজলেন করঞ্জিয়া। তার পর টেনে টেনে বললেন, কিন্তু ওর মালিক তুমি নও, আমি।

মিলি চোখ না নামিয়েই বলল, উত্তরাধিকারী সূত্রে বোধ হয় কিছুটা আমিও। অবশ্য আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি আমারও মালিক।

মিলি যাবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছিল, গম্ভীর স্বরে ডাকলেন করঞ্জিয়া, মিলি!

মিলি ঘুরে দাঁড়ায়। করঞ্জিয়ার দৃষ্টি নরম হয়ে এসেছে। সস্নেহে আস্তে আস্তে বললেন তিনি, এ ঘটনাটা সবার নার্ভের ওপরই ট্রিমেণ্ডাস প্রেসার ফেলেছে জানি। এখন কারোরই মাথার ঠিক নেই। কাউকে বেশী প্রশ্রয় দিও না। কিছু বলবার আগে, করবার আগে, ভেবে নিও। অন্যায় তোমার যতটা তার চেয়ে বেশী ওর। এজন্য ওর জবাবদিহি করতে হবে।

মিলি স্পষ্ট বলল, না, এ ব্যাপারে কোন জবাবদিহি করতে হলে আমি করব। বল, কি জানতে চাও।

কিন্তু করঞ্জিয়া কিছু বলবার আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকেন মিঃ চেট্টীয়ার। করঞ্জিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিরাট ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা ভদ্রলোকের। করঞ্জিয়ারও নাকি শেয়ার আছে ওঁর ব্যবসায়।

করঞ্জিয়া বুঝলেন, জরুরী কোন সংবাদ। মিলিকে বললেন, তুমি যাও, আমি কাজ সেরে ওপরে যাবখ'ন।

মিলি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই চেট্টিয়ার সামনে ঝুঁকে পরে ফিসফিস করে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গীতে বললেন, ফরেন্ থেকে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যারা এসেছেন তাদের ভেতর হু' একজন বড় বিসনেস্ ম্যাগনেট আছেন। রিলায়েব্‌ল সোর্স থেকে শুনলাম, হঠাৎ ওদের মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে যে, গোপনে পাইলটদের একটা হেভি এ্যামাউন্ট অফার করে দেখলে কেমন হয়। ওদের একজনের একটা প্রাইভেট দ্বীপ আছে। খুব লাভলি নাকি। গোপনে আফিং-টাফিং না কিসেব চাষ হয় যেন। সেটাও ওদের অফার করতে রাজী ভদ্রলোক।

করঞ্জিয়ার চোখ হুটো জ্বলে উঠল। টেবিলে একটা ঘুষি মেরে বললেন, এ্যাটওয়ান্স ব্যবস্থা করুন। আমার ব্যাঙ্কের লাস্ট ফার্দিং পর্যন্ত অফার করতে রাজী আমি। ইট্'স এ গুড আইডিয়া! শান্তি পায়নি বলেই তো ওরা এ পাগলামি করতে যাচ্ছে, ওদের ফিউচার লাইফের শান্তিকে যদি আমরা সিকিওর্ড করে দিতে পারি, ওদের আপত্তি না হবারই কথা।

চেট্টিয়ার একটু চিন্তান্বিত ভাবে বললেন, কিন্তু অফারটা কি করে ওদের—

একটু হাসলেন করঞ্জিয়া। আপনারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। এয়ার পোর্টের এয়ারলেস অপারেটররা চুনোপুঁটি। ওদের কিনতে এক সেকেণ্ডও লাগবেনা। দেখুন দেখুন, আর আর সমস্ত এ্যারেঞ্জমেণ্ট করে ফেলুন। কিন্তু একটু সাবধানে করবেন।

কথা শেষ হবার আগেই ফোন বেজে ওঠে। দ্রুত ফোন তুলে নেন করঞ্জিয়া।

ঃ হ্যালো? ...ম্যানেজার বাবু? কি, কারখানার ওপর হামলা হতে পারে মনে হচ্ছে? ...থানায় ফোন করেছিলেন? ...আচ্ছা দেখছি আমি।

ফোন নামিয়েই আবার উত্তেজিত ভাবে ফোন তুলে নেন করঞ্জিয়া। তিন চার বার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত থানার কানেক্‌সন পান।

ঃ আমি মিঃ করঞ্জিয়া বলছি। আমার ফ্যাক্টারিতে শ্রমিকদের একটা হাঙ্গামার আশঙ্কা করছি। আপনি এই মুহূর্তে প্রোটেকশানের···ঠিক কথা দিতে পারছেন না?···নিজেরা চারদিক সামলাতে না পারলে মিলিটারী কল করছেন না কেন?···হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা আপনাদের এক্তিয়ার নয় জানি, কিন্তু সরকারের ওপর আপনারা চাপ সৃষ্টি করছেন না কেন? এতটুকু একটা আঘাতেই যদি দেশে জঙ্গলের আইন চলতে শুরু করে তা'হলে এত টাকা কর দিয়ে, ইয়ে দিয়ে আমরা গভর্ণমেন্টকে পুষছি কেন?···নো, আই মাস্ট নট্ উইথড্র। হ্যাঁ, আমরা পুষছিইতো গভর্ণমেন্টকে।···আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কি করতে পারি সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি।

উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন করঞ্জিয়া। একটা থানার দারোগাও মেজাজ দেখিয়ে কথা বলবে! সব পেয়েছে কি?

চেট্টিয়ার কোন জবাব দিলেন না। চোখ দু'টো ছোট ছোট করে গভীর ভাবে কি যেন ভাবছিলেন। চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে চোখ দু'টোকে চক্রান্তকারীর চোখ বলে মনে হচ্ছিল।

কি ভাবছেন?

চুরুটের ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালেন চেট্টিয়ার।

একটা কথা ভাবছি।

কি?

এত আতঙ্কের ভেতরও একটু হাসলেন চেট্টিয়ার। অনেক দূর ভবিষ্যতের কথা। এখন পর্যন্ত মানুষ যতই উত্তেজিত আতঙ্কিত হোক, আসলে সকলেই বিশ্বাস করছে শেষ পর্যন্ত একটা ফয়সালা হবেই। এবং আমারও বিশ্বাস তা হবেই। কিন্তু এই উত্তেজনাটাকে আমরা একটা কাজে লাগাতে পারি।

অধৈর্য হয়ে ওঠেন করঞ্জিয়া। যা বলবার বলে ফেলুন না।

এইবার আস্তে আস্তে তাঁর প্ল্যানটা করঞ্জিয়ার বিবেচনার জন্য পেশ করলেন চেট্টিয়ার। ওঁদের ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ব্যবসার বিরুদ্ধে কয়েক

কোটি টাকার ফরেন্ মানি ফাঁকি দেবার যে এনকোয়ারিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সেটার ফাইলপত্র সরকারী দপ্তরের কোথায় আছে তা জানেন চেট্টিয়ার। কিছু ভাড়াটে লোক দিয়ে, এ সংকটের মুখে সরকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এই ধুঁয়ো তুলে, জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ক'টা থানা আর সরকারী দপ্তরটা যদি লুটপাট করিয়ে দেওয়া যায়, ব্যাপারটা কেমন হয়? এ পরিস্থিতিতে সেটা আদৌ কঠিন নয়।

করঞ্জিয়া গভীর ভাবে ভাবলেন। একটা চুরুট ধরালেন। তার পর উঠে গিয়ে সেল্ফ্ থেকে একটা বিয়ারের বোতল সোডা আর দু'টো গ্লাস বের করে আবার এসে চেয়ারে বসলেন।

বললেন, একটু ভাবতে দিন।

গোপাল ভেবেছিল অফিসের সামনে আজ জনসমুদ্র দেখবে। কিন্তু দেখে অবাক হল, কালকের চেয়ে ভীড় অনেক কম। সঠিক কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না। তবে অনুমান করল, কাল আচমকা আঘাতে মানুষ সংবাদটা সত্যি কিনা অথবা সংকটের চরিত্রটা কি জানবার জন্য অধীর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কালকের সারাদিনের অভিজ্ঞতায় সংকটের গুরুত্ব প্রসঙ্গে সবাই আজ নিঃসন্দেহ। এখন উত্তেজনা, সমাধানের সংবাদের জন্য। সেটুকু রেডিওতেই জানা যাচ্ছে। তবু অবশিষ্ট ঔৎসুক্যটুকু বোধ হয়, সংবাদপত্র রেডিওর চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে মুক্ত কণ্ঠ এবং জনমতের দিক দিয়ে স্বাধীন বলেই।

অফিসে ঢুকে দেখল বহু চেয়ার ফাঁকা। সামান্য ক'জন গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত অফিসটা জুড়ে একটা থমথমে ভাব। আস্তে সম্পাদকের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল গোপাল। চার ঘণ্টার ব্যবধান কাল শেষের দিকেই রাখা সম্ভব হয়নি। আজ ক'ঘণ্টা অন্তর টেলিগ্রাম বের করা যাবে কে জানে।

সম্পাদক গভীর অন্যমনস্কতায় কি যেন ভাবছিলেন। গোপালকে

দেখে ক্লান্ত চোখ তুলে তাকালেন।

ও, তুমি এসেছ? আমি ভাবলাম তুমিও বুঝি কেটে পড়লে।

গোপাল সামান্য আবেগের সঙ্গে বলল, পত্রিকার শেষ পর্যন্ত আমি আছি স্যার। সাংবাদিকতা আমার শুধু জীবিকাই নয়, জীবনও।

গভীর দৃষ্টিতে গোপালের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সম্পাদক বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন।

আজকাল এ ধরণের কথা শুনতে ভুলে গিয়েছি বলে একটু অবাক হচ্ছিলাম। অবশ্য কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। সংবাদপত্রের মালিকরাই কি আজকাল ধান-পাট-সিমেন্টের ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ভাবে পত্রিকাকে।

মালিকের মুখে এ ধরণের আত্মসমালোচনা শুনে বিস্মিত হয় গোপাল। লোকটার নতুন একটা দিক যেন দেখতে পায়।

গোপাল সরাসরি কাজের কথায় আসে এবার।

গোলটেবিল বৈঠকে আমাদের কেউ গিয়েছে?

সম্পাদক সামান্য নিরাসক্ত ভাবে বললেন, রিপোর্টারের ভেতর একমাত্র অশোককেই হাতের কাছে পেলাম, ওকেই পাঠিয়ে দিয়েছি। অবশ্য এ বৈঠক থেকে আদৌ কিছু আশা করছি না আমি। ১৯৪৬ থেকে যারা আটশো তেষট্টিটা নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে বসে,

সতের হাজার ঘণ্টা ব্যয় করে, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য এক কোটি আশি লক্ষ শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না, এ দেড় দিনে তাদের কাছ থেকে আর কি আশা করছ বল?

গোপাল বলল, কিন্তু এবার পরিস্থিতিটা আলাদা। এতদিন আণবিক অস্ত্রধারী শক্তি দু'টো ছিল প্রতিপক্ষ, কিন্তু আচমকা একটি তৃতীয়পক্ষর আবির্ভাবে আজ মিলিতভাবেই এরা ওদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এবার যার যার নিরাপত্তার কথা ভেবেই নিশ্চয়ই সিদ্ধান্তে একমত হবে।

সম্পাদক গম্ভীরভাবে বললেন, কিন্তু এবার তাদের একমত হবার

ওপর কিছু নির্ভর করছে না। পাইলটরা একমত হবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। তবু, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তুমি এক্ষণি ওখানে চলে যাও। নিচে অফিসের জীপটা আছে বোধ হয়, নিয়ে যাও। সব সময় ফোনে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবে। অবশ্য ইতিমধ্যে মেসিনরুম থেকে আর ঢুচারজন চলে গেলে পত্রিকা বের করা হয়তো সম্ভব হবেনা।

গোপাল নিচে এসে জীপটা ভাল করে দেখেশুনে নিল একবার। মিলির গাড়ির দৌলতে ড্রাইভিংটা শেখা ছিল বলে ড্রাইভারের খোঁজ করল না আর। সেও আছে না কেটে পড়েছে কে জানে।

বিরাট একটি সুরক্ষিত প্রাসাদে, একসময় জনৈক মহারাজা যার মালিক ছিলেন, বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ির চারদিকে উঁচু প্রাচীর। বিরাট লোহার গেট ভেতর থেকে বন্ধ। গেটের ওপারে ঋজু ভঙ্গীতে পাহারায় দাঁড়িয়ে সশস্ত্র সৈনিক।

ভেতরেও চারদিকে মিলিটারী পাহারা দিচ্ছে। প্রশস্ত লন্‌টা পেরিয়ে প্রাসাদ। ওরই কোন একটি কক্ষে বৈঠক বসেছে।

গেটের এপাশে রাস্তার ওপর ছোটখাট একটা জনতা। উৎকণ্ঠা নিয়ে ফলাফলের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। নিজেদের ভেতর চাপাস্বরে এসব প্রসঙ্গেই আলোচনা চলছে।

ভীড়ের ভেতর কিছু বিদেশী রিপোর্টার ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। গলায় বিভিন্ন আকারের তিন চারটে করে ক্যামেরা। ফোল্ডিং টাইপ-রাইটার। হয়তো যার যার দেশ থেকে চার্টার্ড প্লেনেই চলে এসেছে। মাঝে মাঝে ওদের এই আড়ম্বর দেখে হাসি পায় গোপালের। এদেরই কেউ কেউ সাড়ম্বর প্রস্তুতির পর, খোলামকুচির মত পত্রিকার টাকা উড়িয়ে, স্বদেশে প্রত্যক্ষদর্শীর সংবাদ পাঠায়, দলাইলামা নিবীড় অরণ্যের ভেতর দিয়ে পালিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

ঘুরতে ঘুরতে অন্য পত্রিকার এক পরিচিত রিপোর্টার ভদ্রলোকের

সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গোপাল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভেতরের কিছু জানা গেল?

ভদ্রলোক হতাশ ভাবে বললেন, কিচ্ছু না। ভীষণ কড়াকড়ি। কোন প্রেসকেই এ্যালাও করছে না।

দূবে অশোককে দেখতে পেল গোপাল। বিদেশী এক রিপোর্টারেব সঙ্গে আলাপ কংছে। এখনও অশোকেব এই উৎসাহ দেখে মনে মনে খুশী হল। এখনও কি অশোক ঈর্ষায় ভুগছে?

ভীড় ঠেলে অশোকেব কাছে এগিযে গেল ও। অশোক ওকে দেখে সামান্য ভুরু কোঁচকাল।

এডিটাব তোমাকে পাঠালেন বুঝি?

অন্তবঙ্গ স্বুবে বলল গোপাল, হ্যাঁ, তোমাকে সাহায্য কবাব জন্য পাঠালেন। তা, কিছু স্নবিধে হল?

আস্তে মাথা নাড়ল অশোক।

গোপাল বলল, যতদূব মনে হচ্ছে খান থেকে কিছু বেব কবা যাবে না। তবু তুমি ববং থেকে যাও। আমি চাবদিকে কিছুটা টহল দিয়ে আসছি।

গোপালেব কথা শেষ হবাব আগেই বৈঠক-প্রাসাদেব এ্যাম্‌প্লিফায়ারে গম্ভীর ঘোষণা শোনা গেল।

ঃ আব কিছুক্ষণেব ভেতবই গোল-টেবিল বৈঠক শুরু হচ্ছে। ফলাফল যথাসময়ে জনসাধাবণকে বেডিও মাবফৎ জানিয়ে দেওয়া হবে। জনসাধাবণকে অহেতুক এখানে ভীড় কবে এই অসীম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বিঘ্ন স্বষ্টি না করতে অনুরোধ জানান যাচ্ছে।

ভীড়েব ভেতর সামান্য গুঞ্জন শুরু হয। গোপাল অশোককে বলে বেরিয়ে আসে। পথে একটা পোষ্ট অফিস থেকে ফোন করে এখানকার সংবাদ সম্পাদককে জানিযে দেয়।

পথের ভীড় আরো বেড়েছে। গোটা শহব যেন পথে নেমে এসেছে। রাস্তার রেডিওর সামনে প্রচণ্ড ভীড়' সরব উত্তেজিত

আলোচনা। যে প্রত্যাশায় এরা প্রতীক্ষা করছে সে প্রত্যাশা পূরণ না হলে কি পরিণাম দাঁড়াতে পারে, অনুমান করার চেষ্টা করে গোপাল।

নেহাৎ 'প্রেস' লেভেল্‌টার জন্যই বোধ হয় জীপটা কোন ক্রমে এগোতে পারছে। অবশ্য মাঝে মাঝে নেমে অনুরোধ করে পথ করে নিতে হচ্ছে। উৎসুক প্রশ্ন নিয়ে ঘিরে ধরছে মাঝে মাঝে লোকজন। ছেলে ছোকরারা টিটকারিও দিচ্ছে দু'এক জায়গায়।

যেতে যেতে হঠাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর কথা মনে পড়ে গোপালের। কঙ্গো থেকে কৃষ্ণনগর, সমস্ত সমস্যা নিয়েই যারা ভাবিত এবং সরব, এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে দ্বিমত, তাঁরা এই সংকট প্রসঙ্গে কি ভাবছে জানবার কৌতূহল বোধ করে।

কৌতূহল নিয়েই রওয়ানা হয়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন অফিস ঘুরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করল গোপাল, তাতে কৌতুক অনুভব করল।

প্রতিটি অফিসেই কর্মীর ভীড় নগণ্য, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় নেতারা অনেকেই উপস্থিত। বিভিন্ন ধরণের তথ্য, তত্ত্ব ও কর্মসূচী নিয়ে উষ্ণ আলোচনা চলছে নিজেদের ভেতর। এবং এর ভেতরই পরস্পরের প্রতি মৃদু কটাক্ষ বা দোষারোপও চলছে। এতদিন দলীয় শৃঙ্খলার ভয়ে যেসব প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ তোলা যায় নি সেগুলোও সরবে আলোচিত হচ্ছে।

বামপন্থী দলগুলোর সমস্যাই সর্বাধিক। এ যাবৎ কাল পর্যন্ত মানব সভ্যতার ইতিহাস, শ্রেণী সংঘাতের ইতিহাস— এই আপ্তবাক্যের আলোকেই তাঁরা চিরদিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা বিশ্লেষণে ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণে অভ্যস্ত। কিন্তু বর্তমান সমস্যা একটি অভূতপূর্ব সমস্যা। কিন্তু মূলত এই সমস্যার জন্য দায়ী যারা তাদের শ্রেণী চরিত্র নিরূপণের চেষ্টা এ মুহূর্তে শুধু জটিল নয়, প্রায় বাতুলতা। এবং তারা এখন, প্রায় ঈশ্বরের মতই, সর্বশক্তিমান, এবং পৃথিবীর ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। ওদের যদি নিরত নাই করা যায় তাহলে অবশ্য একদিক দিয়ে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি প্রতিহত করা যায় তাহলে বর্তমানে গৃহীত স্ট্র্যাটেজির ভবিষ্যৎ ফলাফলটাও এখনই ভেবে দেখতে

হচ্ছে। এবং সেটা ভাবতে গিয়েই কৃষক-মজুরশ্রেণী বাদে আর কোন কোন শ্রেণীর সঙ্গে কতটা হাত মেলান যায়, সেই সমস্যায়ও জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।

সরকার পক্ষীয়রা অবশ্য এসব দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত। তাঁদের যা করণীয় তা তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারই করছেন, এই মনোস্তুষ্টির আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের আলোচ্য অন্য প্রসঙ্গ। কোন কোন মন্ত্রী পালিয়েছেন, এই সংকট উত্তীর্ণ হতে পারলে তাঁরা আর কেবিনেটে থাকছেন কিনা, কেবিনেটের রদবদল হলে এবার কোন গ্রুপ কি পরিমাণ আসন পেতে পারে ইত্যাদি। অবশ্য দু'চারজন জনসাধারণের ভেতর নেমে গিয়ে তাদের অভয় দেবার কথাও যে না ভাবছেন তা নয়, কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা অল্প।

এবং বর্তমানে উভয় দলেরই সমস্যা কর্মী-সমস্যা। সাধারণ কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে। তারা এখন বিচ্ছিন্ন। সংঘ শৃঙ্খলা ছত্রখান। অথচ দীর্ঘ দিনের অনভ্যাসে সরাসরি জনতার ভেতর গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের মোকাবিলা করতেও খুব স্বস্তিবোধ করছেন না নেতারা।

রাস্তার ওপর একদল যুবক জাঁকিয়ে বসে ট্র্যানজিস্টারে সংবাদ শুনছে। সামনে কয়েকটা মদের বোতল। মাঝে মাঝে হৈহৈ করে চীৎকার করে উঠছে। অট্টহাসিতে সবাইকে নিজেদের উপস্থিতি প্রসঙ্গে সজাগ করে দিচ্ছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওদের লক্ষ্য করে গোপাল। হালের ছেলেদের ঠিক বুঝতে পারে না ও। ওদের চেয়ে বড়জোর বছর দশ পনেরর বড় হবে গোপাল। কিন্তু ওদের পোষাক আসাক, চিন্তা ভাবনা, জীবন দর্শনের সঙ্গে তুলনা করে মাঝে মাঝে ব্যবধানটা যেন এক শতাব্দীর বলে মনে হয়। অবশ্য এদের প্রসঙ্গে কোন অভিযোগ নেই গোপালের। ও বোঝে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল এরা। বরং মাঝে মাঝে জীবনের কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে ওদের মোকাবিলার অনায়াস ভঙ্গীটা বিস্মিত করে ওকে। আসন্ন বিপর্যয়ের মুখেও যেন তুড়ি মেরে ওরা ওদের অস্তিত্ব

ঘোষণা করে যেতে চায়।

সৌমেনের কথা মনে পড়ে গোপালের। ওর ওখানে অবশ্যই একবার যাওয়া প্রয়োজন। যদিও লোটন সেই ছেলেবেলা থেকে দেখছে ওকে, প্রায় ওর অভিবাবকের মতই, তবু এতক্ষণে চলে গেছে না আছে কে জানে।

জীপটা ঘুরিয়ে একটা গলির ভেতর ঢোকে গোপাল। সর্ট-কাট করে বেরিয়ে যেতে পারলে অনেক অল্প সময়ে পৌছান যাবে।

কয়েকটা গলি পেরিয়েই সামনে উচ্ছৃঙ্খল জনতা দেখে গাড়ি থামাতে হল। একটা মাঝারি ধরণের কারখানার সামনে গোলমাল চলছিল। কারখানার গেট বন্ধ। চারদিকের দেওয়ালের পোস্টার দেখে অনুমান করা যায় কিছু দিন থেকে ষ্ট্রাইক ও লকআউট চলছে এখানে।

উন্মত্ত আক্রোশে মজুররা ঝাপিয়ে পড়ছে কারখানার ওপর। যে যা হাতের কাছে পাচ্ছে ছুঁড়ে মারছে। বিরাট বন্ধ লোহার গেটটা সে আক্রমণের মুখে মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ছুটাছুটি চীৎকার গালাগালিতে একটা দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়েছে যেন।

এবং তারই ভেতর হঠাৎ লক্ষ্য করল গোপাল, পাগলের মত চীৎকার করে এই উন্মত্ত জনতাকে ফেরানর চেষ্টা করছে পার্থ বিশ্বাস। সাংবাদিক হিসেবে নয়, কফি হাউসের দু'একজন সাহিত্যিক বন্ধুর মারফৎ পার্থকে চেনে ও। সামান্য পবিচয়ও আছে। এখনও পার্থ গত মহাযুদ্ধের ক্ষত বহন করছে মাথায়।

ওর কিছু কবিতাও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পড়েছে গোপাল। কবিতার অবশ্য খুব সচেতন পাঠক নয়; তাছাড়া, সাম্প্রতিক জটিলতম হেঁয়ালী কবিতা পড়ে ও-বস্তুটা আরো ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে, কিন্তু পার্থর কবিতা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বোধগম্য। অন্তত ওর কবিতার উত্তাপ এবং দরদ যে কোন মানুষকে স্পর্শ করবেই।

শুধু দেশের সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে নয়, মানব দরদ ও সমাজ

সচেতনতার দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক ও। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমান সংবেদনশীল; সমান সোচ্চার। সে লুমুম্বার হত্যাই হোক অথবা পাস্তারনাক প্রসঙ্গই হোক।

বোধ হয় সে জন্যই বনেদী অধিকাংশ পত্র পত্রিকাতেই অপাংক্তেয় পার্থ। এবং নির্দিষ্ট কোন পতাকাবাহী নয় বলে বামপন্থী পত্র পত্রিকাতেও, অবহেলিত না হলেও, স্বাগত নয়। কিন্তু নিজস্ব বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনমনীয় পার্থ।

জনতাকে ও শান্ত হবার জন্য, এই উন্মত্ততার পথ থেকে ফেরবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিল। বোঝানর চেষ্টা করছিল, রুটি রুজির প্রশ্নের চেয়েও অনেক বড় এক সমস্যার সামনে আজ দাঁড়িয়ে আছে ওরা। বিশ্বের শ্রমিক কৃষক আর সাধারণ মেহনতী মানুষের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে এই মুহূর্তে। তাদের সমবেত শক্তি দিয়ে যেমন করেই হোক এই ভয়াবহ পরিণতি রোধ করতেই হবে।

কিন্তু বৃথা। কেউ কান দিচ্ছে না পার্থর কথায়। ক্রুদ্ধ জনতার স্রোতের মুখে টলে টলে পড়ছে ও। ভেসে যাচ্ছে।

আচমকা বড় রাস্তার দিক থেকে দু'টো পুলিশের গাড়ি এসে উপস্থিত হল ঘটনাস্থলে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী লাফিয়ে পড়ল নিচে। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল জনতাকে ফেরানর। কিন্তু বৃথা। জনতা বরং আরো বেপরোয়া হয়ে উঠল। কারখানা ছেড়ে পুলিশকেই আক্রমণ করে বসল।

অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে। পুলিশ অফিসার বাধ্য হয়ে টিয়ার গ্যাস ছাড়বার নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণের ভেতর চীৎকার আর্তনাদ আর ধোঁয়ায় অস্বাভাবিক হয়ে উঠল জায়গাটা। কোনক্রমে গাড়িটা বের করে সামনের গলি ধরে বড় রাস্তায় এসে পড়ল গোপাল।

ঐ উন্মত্ত ভীড়ের মাত্র একটি মুখই ওর বারে বারে মনে পড়ছিল। সিদ্ধান্তে ঋজু কণ্ঠ। উত্তেজনায় অস্থির-দৃষ্টি। কিন্তু ও কি একা ফেরাতে পারবে ওদের? পারুক না পারুক, ও তো

একক শক্তিতে, মানুষের ওপর বিশ্বাস রেখে পথে নেমে এসেছে।

পথে একটা থানা দেখে নেমে পড়ল গোপাল। থানাগুলো ভাল নিউজ-সোর্স। তাছাড়া থানার অবস্থাটাও জানা যাবে।

দু'একজন ছাড়া থানায় কোন পুলিশ চোখে পড়ল না। দরজার কাছ থেকেই চোখ পড়লে, ভেতরে বয়স্ক এক অফিসার ভদ্রলোক তিন চারটে ফোন নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছেন। চীৎকার করে ওপ্রান্তের কাকে যেন জানিয়ে দিচ্ছিলেন ঃ অসম্ভব, এখান থেকে নতুন কোন হেল্প পাঠান সম্ভব নয়। প্র্যাকটিকালি এখান থেকে পাঠানর মত কোন লোকই নেই ; বহু এ্যাব্‌সেণ্ট, আর সব ডিউটিতে। ......হ্যাঁ, হ্যাঁ...না না, গুলির তো প্রশ্নই আসছে না, যতদূর সম্ভব ফোর্স না এ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন। ...আনরুলি? বর্তমান অবস্থাটাও বিবেচনা করে দেখবেন।

পরবর্তী ক'টা ফোনের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় সংবাদ জেনে নিল গোপাল। এখন পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা মোটামুটি বজায় আছে। কিন্তু চারদিক উত্তেজনায় থমথম করছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন রকম বিশৃঙ্খলা শুরু হতে পারে। সরকার থেকে, অবস্থা নেহাৎ আয়ত্বের বাইরে না গেলে কোন রকম ফোর্স এ্যাপ্লাই না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিছু মিলিটারী ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে, কিন্তু তাদের ওপরও সেই একই নির্দেশ আছে। ভয় দেখিয়ে নয় বুঝিয়ে অবস্থা আয়ত্বে রাখার চেষ্টা করতে হবে। পুলিশের মনোবল এখনও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে নি, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যাচ্ছে না।

গোপাল থানা থেকেই ফোন করে সম্পাদককে এদিককার মোটা-মুটি সংবাদ জানিয়ে দিল। পত্রিকা অফিসের অবস্থাটাও জেনে নিল।

জানে না, সংবাদপত্র আর কতক্ষণ জীবিত আছে। জীবন মৃত্যুর চরমতম সংশয়ের মুখে পথে পথে সংগ্রহ করা এই সংবাদ ভগ্নাংশের মূল্যই বা কতটুকু। তবু যেন একটা নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে।

সংবাদের জন্যই পথে নেমেছিল একসময়, কিন্তু কখন যেন নিজের অজান্তে মানুষ দেখতে শুরু করেছে ও। রবীন্দ্রনাথের সেই, সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে, তাকে হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করতে পারছে সে যেন আজ। এতদিন মানুষকে ঘটনার, সংবাদের অংশ হিসেবেই দেখে এসেছিল ; শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে অনেক সময় মানুষ যেমন উপকরণ। কিন্তু আজ বিচিত্র জীবন প্রবাহের অন্তরঙ্গ সহোদর হিসেবেই যেন উপলব্ধি করতে পারছে তাকে।

সৌমেনদের বাড়ির নিচের তলার দোকান কটা সবই বন্ধ। বাড়ীটা তাতে আরো বেশী নিঝুম মনে হচ্ছে।

নিঃশব্দে দোতালায় উঠে এল গোপাল। সিঁড়ি থেকেই সৌমেনের প্রশান্ত স্বর শুনতে পেল।

হে মহাসুন্দর শেষ, হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির, মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির, পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে—
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে।

সৌমেন চোখ বুজে মন্ত্রোশ্চারণের মত আবৃত্তি করছিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছিল গোপাল। এই দু'দিনের ভেতর এই প্রথম একজনকে দেখছে, যে আসন্ন শেষের জন্য প্রসন্ন আমন্ত্রণ নিয়ে অপেক্ষা করছে। দীর্ঘ রোগ মুক্তির সহায় হিসেবে নয়, মৃত্যুকে গভীর উপলব্ধিতে পরম আশ্রয় হিসেবেই যে বরণ করছে। এতদিন শিল্পী হিসেবেই চিনত সৌমেনকে, আজ ওকে সাধক মনে হল।

সৌমেন চোখ মেলেই গোপালকে দেখে। স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে ডাকে, আয়। কাল থেকেই তোর কথা ভাবছিলাম।

গোপাল ওর পাশে এসে বসে।

কেমন আছিস ?

ভাল। কাল থেকেই ভীষণ ভাল আছি। মনে হচ্ছে দীর্ঘ ক্লান্ত নিরুদ্দেশ যাত্রার ভেতর হঠাৎ একটা গন্তব্যের নিশানা খুঁজে পেয়েছি।

গোপাল গভীর সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। অস্বস্তিবোধ করে সৌমেন। একটু হেসে বলে, কি দেখছিস অমন করে ? অবাক হচ্ছিস ?

তা একটু হচ্ছি ! লোটন আছে, না, পালিয়েছে ?

সৌমেন সামান্য হতাশ ভাবে বলে, বোকাটাকে অনেক করে বুঝিয়ে বলেছিলাম,বাইরের হালচালটা দেখে আয়, আর দশ জন কি করার চেষ্টা করছে দেখ ; অন্তত প্রাণে বাঁচবার শেষ চেষ্টাটা করে দেখ। কিন্তু ওর সেই এক কথা, তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবার শক্তি থাকলে একবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু এই বুড়ো হাড়ে তা যখন পারছি না, তোমাকে ফেলে আমি যেতে পারব না। আর দু'চার বছর পর তো এমনিতেই মরতাম, না হয় সবার সঙ্গে অপঘাতেই মরলাম।

গোপাল আস্তে বলল, তোকে একটা অনুরোধ করব সৌমেন ? রাখবি ?

সৌমেন ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, এ অবস্থায় রাখা সম্ভব হলে নিশ্চয়ই রাখব।

এ দু'দিন তুই আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবি চল। মা'ও বারে বারে বলে দিয়েছেন। এভাবে একেবারে খালি বাড়িতে একা লোটনের ভরসায় থাকাটা—

আস্তে মাথা নাড়ে সৌমেন।

তা হয় না গোপাল। আমি তোদের চিন্তার কারণ বুঝি ; কিন্তু এই রোগশয্যা, ঐ এক ফালি ছোট্ট আকাশ, জানলা দিয়ে গড়িয়ে আসা লতাটা, আর এ ঘরের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে এই দীর্ঘ

আট বছরে এমন নিবীড় ভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে এদের ছেড়ে যাবার কথা আমি ভাবতে পারি না আজ। পিসিমাকে বুঝিয়ে বলিস।

এই মুহূর্তে এই প্রশান্তি থেকে সৌমেনকে জোর করে সরিয়ে নেবার স্বপক্ষে গোপালের নিজের মনও সায় দিল না। যে নিজে ভয় পায় নি, নির্ভয় করার চেষ্টায় তার অস্বস্তি বাড়িয়ে লাভ কি ?

গোপাল আস্তে বলল, তাহলে থাক। তবে কোন অসুবিধে বোধ করলেই লোটনকে দিয়ে খবর দিস কিন্তু।

আড় চোখে সময় দেখল গোপাল। দৃষ্টি এড়ালনা সৌমেনের। একটু হেসে হাল্কা সুরে বলল, বুঝেছি, সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিড়িতে হবে ! আশ মিটিয়ে সংবাদ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিস, না ?

একটু হাসল গোপাল, না, মানুষ দেখে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা চলি। সময় করে আসব'খন আবার।

গোপাল উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ মনে পড়ায় বলে সৌমেন, ভাল কথা, একটু আগে অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ ইতু এসে হাজির। কেমন আছি খোঁজ করতে এসেছিল।

শুনে চিন্তিত হয় গোপাল। এর ভেতর একা বেরিয়েছে ইতু !

সৌমেন একটা অনুরোধ করল গোপালকে।

তুই যাবার আগে আমার একটা উপকার করে যাবি ভাই।

সৌমেনের চোখের দিকে তাকায় গোপাল।

আমার রং তুলিগুলি ঐ বাক্সটা থেকে বের করে দিবি ? আর ঐ ইজেলটা আমার পাশে এনে দে। বহুদিন পর আঙ্গুলগুলো আবার রং তুলির জন্য অস্থির হয়ে উঠছে।

গোপাল নিঃশব্দে টেবিলের ওপর থেকে রং তুলি এনে দিল। অন্য সাজসরঞ্জামও। তার পর কোণ থেকে ইজেলটা এনে ওর বাঁ দিকে বসিয়ে দিল। ডান অঙ্গে কিছুটা কম জোর পায় ও আজকাল। তারপর আস্তে জিজ্ঞেস করল, এবার তাহলে চলি ?

একটু হেসে মাথা নাড়ল সৌমেন।

বড় রাস্তার মোড়ে এক পরিচিত রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গোপালের। ভদ্রলোক ভীড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে অস্থির ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। কিছু খুঁজছেন যেন। হঠাৎ সামনে একটা প্রাইভেট গাড়ি আসতে দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন। কি যেন অনুরোধ করলেন। তার পর আবার সেই অস্থিরতা বহন করে বিরস বদনে স্বস্থানে এসে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোক কোন বিপদে পড়ে লিপ্ট চাচ্ছেন নাতো? গোপাল গাড়িটা একটু এগিয়ে নিয়ে ডাকল, মিঃ সান্যাল!

সান্যাল ওকে দেখে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এলেন।

আরে, আপনি! একটা লিপ্ট দেবেন ভাই?

কোনদিকে যাবেন?

সান্যাল বললেন, বুড়োদার ওখানে। ওঁর বাড়িতে বিরোধী, সরকারী, নির্দলীয় সব সদস্যদের একটা প্রীতি সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ওঁর একান্ত অনুরোধ যেন সম্ভব হলে সবাই যাই। সমস্ত দলাদলি হানহানির কথা ভুলে যেন এই শেষ অধিবেশনে এতদিনের পরিচিত মানুষগুলো একটু একত্র হয়ে আসি।

গোপাল সান্যালকে গাড়িতে তুলে নিল। নিজেও এই অভিনব অধিবেশনটা প্রসঙ্গে বেশ কৌতূহল বোধ করছে। সম্ভব হলে সকলেই আসবেন জানে। বুড়োদা বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য। নির্দলীয়। সরকার, বিরোধী সর্বদলীয় সদস্যদেরই তিনি প্রপিতামহ-স্থলভ স্নেহের চোখে দেখেন। অধিবেশন চলাকালে যা নিজের ন্যায্য মনে হয় অকুণ্ঠ উদাত্ত স্বরে বলে যান। কার পক্ষে কার বিপক্ষে গেল বিন্দুমাত্র কেয়ার করেন না। কিন্তু তা সত্বেও এই সর্বজ্যেষ্ঠ উদার স্নেহপ্রবণ সদস্যটির প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল। এবং দুর্বল। প্রায় সকলেই সপ্রীতি ঠাট্টায় ওঁকে অধিবেশন-রেফারী বলে অভিহিত করেন।

কৌতূহলটা সেজন্য নয়; কৌতূহল, প্রতিটি প্রশ্নে শাণিত প্রতিপক্ষ সদস্যদের বর্তমান অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখে আসা। তথ্য-তত্ত্ব-পরিসংখ্যা

কণ্ঠস্থ সদস্যদের আজের বক্তৃতাগুলো স্বকর্ণে শুনে আসা। প্রচলিত অভ্যাসে এখানেও আবার বিতর্ক বাধা দান গালাগালিতে মুখর হয়ে উঠবে না তো শেষ সম্মেলন ?

সান্যাল একসময় সামান্য ইতঃস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে ক্যামেরা নেই বুঝি ?

গোপাল একটু হেসে বলল, না। ফিল্মগুলো দু'দিনের ভেতর প্রিন্ট করানর সময় পাব না বলে আনি নি।

সান্যালের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মিন মিন করে বললেন, আপনিও কি বিশ্বাস কবেন ব্যাপারটা ঘটবে ?

গোপাল বোঝে, সান্যাল আশ্বাস চান, নিজে আস্থা হারিয়ে ফেললে মানুষ অন্যের কাছে আস্থার প্রার্থী হয়। গোপাল অভয় দেবাব ভঙ্গীতে বলল, আমারও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

কিছুক্ষণের ভেতরই বুড়োদাব বাড়ি পৌঁছে গেল ওরা। এখনও শহরে বনেদী ঐতিহ্য বহন করে যে কয়টা বাড়ি অবশিষ্ট আছে, এ বাড়ি তারই একটি।

বিরাট হলঘরটা জুড়ে দামী কার্পেট বিছান হয়েছে। এক কোণে শ্বেত পাথবেব একটি টেবিল। পরিচিত সদস্যদেব অনেককেই উপস্থিত দেখল গোপাল। কিন্তু ভিন্ন রূপে

সরকার আর বিপক্ষ দল বলে আজ আর কোন ভেদাভেদ নেই। পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছেন। ক্ষমা চাচ্ছেন। অপরাধ স্বীকার করছেন। অধিক বয়স্ক কয়েকজন এক কোণে গোল হয়ে বসে গড়গড়ার ধোঁয়ার আমেজে স্মৃতি রোমন্থন করছেন।

বুড়োদা একসময় উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের সামনে এগিয়ে গেলেন। বারকয়েক কথা শুরু করতে গিয়েও পারলেন না। শেষ পর্যন্ত আবেগ সংবরণ করে শুরু করলেন, বন্ধুগণ! চির বিদায়ের আগে একবার পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়েব জন্য, পুরাতন বাদ বিসংবাদ ভুলে পরস্পবের কাছে হৃদয় উন্মোচনেব জন্য, আজ তোমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে

ছিলাম আমি। এটা সভা নয়, অধিবেশনও নয়। একটা মিলন-মজলিস মাত্র। সুতরাং কোন আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুন মানার প্রয়োজন নেই। আমি সদস্যদের সবাইকেই তাদের যদি কিছু বলবার থাকে একে একে বলবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দীর্ঘদিনের বন্ধনে তোমাদের নিয়েই আমার দ্বিতীয় সংসার গড়ে উঠেছিল। আমি 'তুমি' বলছি বলে কিছু মনে করনা ; বয়সের কথা ভেবে চিরদিনই তাই ইচ্ছে হত, কিন্তু—

সদস্যরা সমস্বরে জানালেন, তারা কিছু মনে করছেন না। বরং ভীষণ ভাল লাগছে তাদের।

বুড়োদা আবেগের প্রতিবন্ধকতায় বেশী দূর এগোতে পারলেন না। আস্তে বসে পড়লেন। এরপর সকলেই পরস্পরকে অনুরোধ করতে লাগলেন কিছু বলবার জন্য।

শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষীয় একজন উঠে দাঁড়ালেন। তিনিও আবেগে থেমে থেমে নাতিদীর্ঘ একটি ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে করজোড়ে স্বীকার করলেন তিনি, বিপক্ষ দল যে সমস্ত অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে করেছেন এতদিন, তার সব সত্যি না হলেও, বেশ কিছু হয়তো সত্যি ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভরসায় সত্যিই অনেক সময় কেয়ার করেন নি তাঁরা সে সব সমালোচনা। যে অনির্বাণ আদর্শ সামনে রেখে একদিন দেশ সেবা শুরু করেছিলেন তাঁরা, ইদানিং অনেকেই তা থেকে বিচ্যুত হচ্ছিলেন।

আসন নেবার আগে পুনরায় তিনি করজোড়ে আন্তরিকতাব সঙ্গে বিপক্ষের বন্ধুদের কাছে ও দেশবাসীর উদ্দেশে ক্ষমা চাইলেন।

অভ্যেসবশতঃ একজন অন্যমনস্ক বিপক্ষ সদস্য শেম-শেম বলে বাধা দিতে যাচ্ছিলেন বোধ হয়, হঠাৎ খেয়াল হতে মাথা নিচু করে অনুচ্চস্বরে বললেন, মাপ করবেন।

এরপর একজন বিপক্ষ সদস্য উঠে দাঁড়ালেন। এবং হাত জোড় করে বললেন, ক্ষমা বোধ হয় আমাদেরও চাওয়া উচিত। আজ স্বীকার করতে বাধা নেই, দলরক্ষার জন্য, আসন রক্ষার জন্য, সবকারের অনেক

কাজেই আমাদের প্রতিবাদ করতে হত। গালাগাল করতে হত। তিলকে তাল বানিয়ে হৈ চৈ করতে হত! রাজ্য চালনার গুরু দায়িত্বের বোঝা মাথায় না থাকাতেই অস্বীকারের ভঙ্গীতে এদিক ওদিক অত সহজে মাথা নাড়তাম। আপনারা আমাদের ক্ষমা করুন।

হঠাৎ প্রায় কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ালেন একজন সদস্য। বন্ধুগণ! বিবেকের দংশনে আজ আমি একটি অপরাধ স্বীকার করতে চাই। শেষ দিনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমিই প্রথম জুতো ছুঁড়েছিলাম। আমার দু'পায়েই জুতো থাকায় কেউ ধরতে পারে নি কার জুতো। এমন কি শকুন-চোখ কাগজের রিপোর্টাররাও না। আসার সময় বাটার বি-পেয়ার দোকান থেকে একজোড়া স্যাণ্ডেল কিনে এনেছিলাম আমি। রাজনৈতিক কাগজ-পত্রের সঙ্গে পোর্টফোলিওর ভেতর ছিল সেটা। আজ এত কথা বলতে হচ্ছে আমার অনুতাপের জ্বালায়। জুতোটা আমারই এককালের শিক্ষক মহাশয়, বাবার বন্ধু, সদস্য মহাশয়ের মাথায় গিয়ে পড়েছিল বলে।

বুড়োদা হাত তুলে ক্রন্দনরত সদস্যকে থামালেন। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, আমি নিরপেক্ষ বলেই বলবার সাহস পাচ্ছি' তোমরা উভয় দলই, —অবশ্য তাই বা বলি কেন ? আমাদের নির্দলীয়তাও তো অনেক ক্ষেত্রেই ছিল গাছের খাওয়া তলের কুড়োনর নীতি।—আসলে নির্মোহ আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে আমরা সকলেই বোধ হয় সমান অপরাধী। রাজনীতি নিয়ে বহু ক্ষেত্রে জুয়ো খেলেছি আমরা। কিন্তু আমরা, মানুষ, সকলেই মূলত মহৎ বলেই, এভাবে মুক্ত কণ্ঠে অপরাধ স্বীকার করতে পারছি আজ। আজ নতুন করে আর আলোচ্য কিছু নেই বোধ হয়। তাই, এস নিজেদের আত্মার সদগতির জন্য, সমস্ত মানব জাতির আত্মার মুক্তি কামনায়, আমরা সমবেতভাবে নামকীর্তন করি।

সমস্ত সভাকক্ষ মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকল। তরুণ সদস্য দু' চার জন প্রথমে একটু ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু এক সময়, প্রথমে গুণ

গুণ করে কুণ্ঠিত স্বরে, এবং ক্রমে মুক্ত উদাত্ত স্বরে সকলে সমবেতভাবে গাইতে শুরু করলেন। বিরাট সভাকক্ষ নাম সংকীর্তনে মুখর হয়ে উঠল। গোপাল অভিভূত হয়ে দেখল অনেক সদস্যের গাল বেয়ে ধারে ধারে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। যে রকম তদ্গতভাবে গাইছেন সব তাতে কখন থামবেন, বা আদৌ থামবেন কিনা কে জানে। ওঁদের নিজেদের এবং সমগ্র মানব জাতির আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল গোপাল।

বেরিয়ে আসতে আসতে একটা পুরনো প্রশ্ন আবার নতুন করে মনে এল ওর। এঁদের রাজনৈতিক আচরণের জন্য এঁরা অনেকেই আজ অনুতপ্ত। তাহলে কি বাজনীতি মানেই স্ববিরোধিতা? অথচ রাজনীতির উৎস তো জীবনদর্শন প্রসঙ্গে স্ববোধের অনমনীয় অনুসরণ। তাহলে কি ইতিহাসের এমন দু-একটা পর্ব আসে, যখন রাজনীতি এবং নীতির, সঠিক মানবতা বোধের, সামঞ্জস্য বিধান কষ্টকর?

গাড়ির ভীড় থেকে জীপটা বের করে আবার পথে নামে গোপাল। আবার সেই থমথমে ভীড়। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঢেউয়ের মুখে উৎকণ্ঠ জনতা।

কিছু দূর এগিয়েই সামনের একটি বাড়ির রেডিওতে গোলটেবিল বৈঠকের সংবাদ শুনে জীপ থামায় গোপাল। কান পেতে উৎকণ্ঠভাবে সংবাদটা শোনার চেষ্টা করে।

ঃ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানান যাচ্ছে, কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রশ্নে সদস্যদের মতানৈক্যের দরুণ প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে মতৈক্য স্থাপনের আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আশা করা যাচ্ছে, আর কয়েক ঘণ্টাব ভেতরই দ্বিতীয় বৈঠক শুরু হবে।

বাইরে জমায়েত শ্রোতাদের ভেতর প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দিল। সূক্ষ্ম প্রশ্নগুলো কি হতে পারে তা নিয়ে নিজেদের ভেতর বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। কয়েকজন হাত পা ছুঁড়ে নৈর্ব্যক্তিক অশ্লীল গালাগাল

শুরু করল।

গোপালের নিজের মনটাও দমে যায়। এদের সূক্ষ্ম প্রশ্নগুলোর কি কোনদিনই সমাধান হবে না? প্রতিটি প্রশ্নে মতভেদের শেষ হবে না? অথচ মুষ্টিমেয় এই রাষ্ট্রনেতাদের কী অধিকার আছে সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে এই পাশা খেলার?

রেডিওটা একটু থেমেই ছোট্ট একটা স্থানীয় সংবাদ দিল। আসন্ন বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে সরকার জেলখানা থেকে সমস্ত কয়েদীকে মুক্তি দেবার- সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিছুক্ষণের ভেতরই সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

এ সংবাদে একটা মিশ্র-প্রতিক্রিয়া হল গোপালের। মানুষ ক্রমশঃই ধৈর্যের শেষ সীমায় পেঁাছাচ্ছে। আজের ভেতরই একটা সমাধান না হলে অবস্থা কোন্ চরম পর্যায়ে পেঁাছাতে পারে ভাবতে পারছে না ও। এর ভেতর কিছু অপরাধপ্রবণ কয়েদীকে ছেড়ে দেওয়া কি খুব সমীচীন হবে? অবশ্য পর মুহূর্তেই মনে হল, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, সমাজের নিরাপত্তার কথা ভেবে, হয়তো এদের সংশোধনের জন্য বন্দী রাখা উচিত ছিল। কিন্তু সমাজই যদি রাষ্ট্র এবং পৃথিবীসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে জীবনের শেষ মুহূর্তকটা এদের বন্দী রেখেই বা লাভ কি? এবং নির্মোহভাবে বিচার করলে একজন মানুষের আর একজন মানুষ প্রসঙ্গে এ অধিকারও বোধ হয় এ মুহূর্তে নেই। কারণ মানবিকতাই যদি বিচার্য হয়, তাহলে ঐ গোলটেবিল বৈঠকের অন্তত বেশ কয়েকজন সদস্যকে আজ বিনা দ্বিধায় ঐ খালি কারাগারগুলোতে এনে বন্দী করে রাখা যায়।

ঘড়িতে সময় দেখল। সেন্ট্রাল জেল এখান থেকে খুব দূরে নয়। ছোট্ট একটা কৌতূহলে জেলের দিকে রওয়ানা হল গোপাল।

সেন্ট্রাল জেলের সামনে পেঁাছে দেখল জেলের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কয়েদীরা কেউ গেট পেরিয়ে বাইরে আসছে না। জমাট বেঁধে ওপারেই দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন হতভম্ভ ভাব। শেষ পর্যন্ত

একজন জেলারকে জিজ্ঞেসই করে বসল, বাবু, সত্যি ছেড়ে দিচ্ছেন তো, না কি, পরে আবার ধরে এনে প্যাঁদাবেন !

জেলার কোন উত্তর না দিয়ে গেটের চাবিটা গায়ের জোরে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের মনে সামনের দিকে হাঁটা দিলেন। এবার কিছুটা সাহস বাড়ল কয়েদীদের। গুটিগুটি পায় বেড়িয়ে এল সব। সভয়ে এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিল। আবারও কয়েক পা গুটিগুটি এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ দল বেঁধে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল সব।

এত আতঙ্কের ভেতরও হাসি পেল গোপালের। শূন্য জেলখানাটার দিকে ফিরে তাকাল। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটা ঘরের লোহার গরাদের ওপাশে একটা পা তুলছে।

কৌতূহলে এগিয়ে গেল গোপাল। এক বৃদ্ধ কয়েদী নির্লিপ্তভাবে শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানছে। আর পায়ের ওপর পা রেখে দোলাচ্ছে।

গোপাল ভেতরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি গেলে না ?

একটু হাসল বুড়ো। সেই দশ বছর বয়স থেকে এটাই প্রায় বাড়িঘর হয়ে গেছে বাবু। কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। তা ছাড়া মাত্র দু'দিনের জন্য এই গোলমালের ভেতর বেরিয়েই বা লাভ কি ? ভেতর-বার সব সমান।

গোপালের এই মুহূর্তে ওকে একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিক বলে মনে হচ্ছিল।

গোপাল ফিরতেই ওকে ডাকল কয়েদী। অনুরোধের সুরে বলল, দরজাটা একটু বন্ধ করে দিয়ে যান বাবু। খোলা থাকলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।

লোহার দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এল গোপাল। জনশূন্য নিঃশব্দ জেলখানাটাকে একটা ভৌতিক প'ড়ো বাড়ি বলে মনে হচ্ছিল।

যদিও অশোক আছে, তবু বৈঠকের ওখানে একবার যাওয়া প্রয়োজন। অবশ্য মনে মনে ঠিক করে ফেলল ও, যদি কোন ভেতরের

সংবাদ আচমকা জানতে-টানতে পারে তাহলে সংবাদটা অশোকের নামেই পাঠাবে।

যেতে যেতে দেখছিল, অভ্যস্ত দৃশ্যগুলো সব কেমন পাল্টে যাচ্ছে। দোকানপাট প্রায়ই বন্ধ। স্টক একচেঞ্জ স্তব্ধ। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি খাঁ খাঁ করছে। সিনেমা থিয়েটার হলের দরজা বন্ধ। কিন্তু গাড়ির মিছিল লেগে গেছে মন্দির মসজিদ চার্চের সামনে। ভুলেও যারা ধর্মের কথা কোনদিন ভাবে নি, বিলাস ব্যসনেই দিন কেটেছে যাদের, তাদের-ভীড় শুরু হয়েছে ধর্মস্থানগুলোতে।

বড় বাজারের কাছে এসে দূর থেকে একটা লোককে পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে দেখে একটু থামল গোপাল। শ'খানেক ঘিয়ের টিন একখানে সাজিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে তিলক কাটা অবাঙ্গালী এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী পাগলের মত বুক চাপড়াচ্ছে আর চীৎকার করছে, হামাকে মেরে ফেলুন। হামাকে খুন করুন। এই বেইমানের কল্‌জে উপড়ে লিন। পন্দের সাল হামি ঘিউতে ভেজাল দিয়েছি, ওষুধ ভেজাল করেছি, হাজার হাজার লোক খুন করেছি। হামার কল্‌জে উপড়ে লিন। হামাকে শাস্তি দিন। না হোলে হামার গোতি হোবে না।

লোকটাকে দেখে ঘৃণা নয়, করুণা বোধ করে গোপাল। এগিয়ে যেতে যেতে একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে। Hell's flames are loosed, and judgements passed. Too late for mercy now!

গোলটেবিল বৈঠকের সামনে ভীড় আরো বেড়েছে। অবশ্য এখনও ভীড়ের অধিকাংশই শিক্ষিত সচেতন শ্রেণীর মানুষ। সাধারণ মানুষের কাছে এসব শীর্ষ সম্মেলন বড় আকারের একটা মজলিস মাত্র। যেখানে রাজনৈতিক বিষয়ের আড়ালে সাধারণ বুদ্ধির অগম্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক হয়। কূটনৈতিক বৈদগ্ধ্যের মল্লযুদ্ধ চলে। এবং সর্বশেষ ফলশ্রুতি যেটুকু বা লভ্য হয়, বিভিন্ন কৌণিক-বিশ্লেষণে তার সঠিক অর্থোদ্ধারে আসল প্রসঙ্গটি আরো জটিল হয়ে ওঠে। অথবা,

যদি বা সহজ সরল সর্ববোধ্য কোন দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত গৃহীতও হয়, সম্মেলনের পর বছর ঘুবতে না ঘুরতে উভয় পক্ষ থেকেই সে চুক্তিভঙ্গের পারস্পরিক অভিযোগে সমস্যাটা জটিলতর হয়ে ওঠে। স্বভাবতই, এসব সম্মেলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব একমাত্র সংবাদপত্র, জননেতা ও রাজনীতি সচেতন মানুষের কাছেই সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রথম বৈঠকের ব্যর্থতায় বাইরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমেই অবিশ্বাস বাড়ছে। ব্যর্থতার সম্ভাব্য কারণ নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক চলছে। এবার কিছু রাজনৈতিক নেতাকেও চোখে পড়ল গোপালের। সাংবাদিকরা ব্যস্ততায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এর ভেতব থেকেই অশোককে খুঁজে বের করল ও। অশোকের চোখে মুখে কেমন একটা নৈরাশ্যের ছাপ। অবশ্য, বৈঠক প্রসঙ্গে ও যা সংবাদ দিল তাতে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল গোপাল। অত্যন্ত কড়াকড়ির ভেতর বৈঠক শুরু হলেও বৈঠককে বেহুলার লৌহবাসরের মতই, একেবারে নিবন্ধ্র রাখতে পারেন নি কর্তৃপক্ষ। সেই রন্ধ্র পথেই নাকি কিছু ভেতরের গোপন সংবাদ বেরিয়ে এসেছে। বৈঠকের শুরুতেই উভয় শক্তিজোট নাকি এই সঙ্কটের জন্য পারস্পরিক দোষারোপে মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৫২এর জেনোয়া থেকে সাম্প্রতিক মস্কোর নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের নজির পর্যন্ত তাতে ছোঁড়াছুঁড়ি হয়। শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ জোটের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্বে এলেও, এই সংকট প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ পর্যন্ত সেই পুরোন প্রশ্নে এসেই দাঁড়ায়, ওদের নামিয়ে আনতে পারলে এই মুহূর্তে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ মেনে নেওয়া হবে কিনা। অর্থাৎ সিসিফাসের ঠেলে তোলা পাথর গড়িয়ে এসে আবার পাহাড়ের সেই পাদদেশেই অনড় হয়েছে।

উৎসাহে প্রায় লাফিয়ে ওঠে গোপাল। ইটস্ এ গ্রেট নিউজ! এক্ষুণি কাগজে গিয়ে রিপোর্টটা দিয়ে আসুন।

অশোক কিছুটা নিবাসক্তভাবে বলল, কতটা অথেন্‌টিক্ জানি না, তবে নিউজটা গ্রেট বুঝছি। কিন্তু নিউজটা আপনার হাত দিয়ে যাওয়াই ভাল।

গোপাল সামান্য বিস্মিত হয়।

কেন? সংবাদটাতো আপনারই পিক্-আপ।

একটু হাসল অশোক। বলল, কিন্তু আজ স্বীকার করছি, সাংবাদিক হিসেবে আমার চেয়ে আপনি ভাল পিক্-আপ। আমি আর অফিসে যাচ্ছি না।

কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল অশোক। একটা বিষণ্ণতা নেমে এল ওর চোখে। গভীর আবেগে ও থেমে থেমে বলল, আমি সব কিছুর ওপরই আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। সব কিছুই এখন হাতের বাইরে। জীবনে অনেককে আঘাত দিয়েছি, অনেক কর্তব্য করি নি। বারে বারে সেগুলো মনে পড়ছে। অবশ্য আপনাকে বলতে আপত্তি নেই আজ, একটি মেয়েকে ভালবাসতাম আমি। কিন্তু নিজের উপার্জনের কথা, পরিবারের আপত্তির কথা চিন্তা করে কোনদিনই ওর ভালবাসার পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারি নি। বাড়িতে মাঝে মাঝে রীতিমত পীড়ন চলত মেয়েটির ওপর। ও অনেক সময় অধৈর্য হয়ে অনুরোধ জানাত, আমাকে তুমি নিয়ে চল। এ যন্ত্রণা থেকে যে কোন নরকে নিয়ে চল, আমি রাজী আছি। কিন্তু নিজের দুর্বলতার জন্যই পারি নি আমি। কিন্তু আজ, অন্তত এই দু'দিনের জন্যও, ওকে আমি ওর যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে আনব। জানি না কোথায়, কিন্তু এমন কোথায়ও নিয়ে যাব, যেখানে দু'দিনের স্বর্গ রচনা করতে পারি আমরা।

শেষের দিকে অশোকের গলা কেঁপে আসছিল। নিজেকে কোন রকমে সামলে ও হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। তার পর দ্রুত পায়ে ভীড়ের ভেতর মিশে গেল।

গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এবার নিজের দিকে ফিরে তাকায় গোপাল। আমি কি অস্বাভাবিক? না হলে সবার ভেতর যখন এই ঘটনার স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে তখন আমি কি করে এত নির্বিকার, সচেতন থেকে যাচ্ছি? না কি, আমার স্বাভাবিক

অনুভূতিই স্থূল? অথবা, পিনাকী চৌধুরীরাই নয়, অজান্তে এ যুগে আমরা অনেকেই পরবাসী?

বৈঠক প্রাসাদের এ্যাম্প্লিফায়ার ঘোষণা করল: প্রথম বৈঠক থেকে আশানুরূপ ফলাফল না পাওয়া গেলেও সদস্যরা নিরাশ হন নাই। ইতিমধ্যেই পরবর্তী বৈঠক শুরু করার মত কয়েকটি সাধারণ সূত্র প্রসঙ্গে সদস্যরা মতৈক্যে পৌঁছেছেন। কিছুক্ষণের ভেতরই পরবর্তী অধিবেশন শুরু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। জনসাধারণকে মনোবল না হারানর জন্য, এবং সম্মেলন স্থানে অহেতুক ভীড় সৃষ্টি না করার জন্য অনুরোধ জানান যাচ্ছে।

প্রথম অধিবেশনের সংবাদটা এই মুহূর্তে পত্রিকায় পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। সংবাদটা কতদূর সত্যি অথবা পুরোটাই স্পেকুলেশন কি না জানে না, তবু সংবাদটায় একটা চমক আছে। এখন চমক ছাড়া পত্রিকাকে জিইয়ে রাখা মুস্কিল। আগে পত্রিকা তার পরতো পলিসি! না কি আদর্শটাই ধ্রুব, পত্রিকাটা বাহন মাত্র হওয়া উচিত?

জীপটা নিয়ে অফিসের দিকে রওয়ানা হয় গোপাল। যাওয়ার আগে ফোনেও জানিয়ে দেয় সংবাদটা।

আবার সেই ভীড়। সেই উত্তেজনা। সেই অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। মাঝে মাঝে, সতর্ক থাকা সত্ত্বেও, এই আতঙ্ক নিজের ভেতর সক্রামিত হবার আভাস পাচ্ছে যেন। ঠিক আতঙ্ক না হলেও, একটা নৈরাশ্য। অনাস্থা।

যেতে যেতে হঠাৎ ইতুকে ফুটপাথে দেখে বিস্মিত হয় গোপাল। গাড়ি থামায়। ইতুর সঙ্গে জয়ার দাদা। ইতু গোপালকে দেখে থেমে পড়ল। কী যেন বলল জয়ার দাদাকে। তার পর দু'জনেই এগিয়ে এল গাড়িটার দিকে।

গোপাল প্রথমে বিস্মিত, কিন্তু, এখন বিরক্ত হল। এ আঘাতে ইতু ওর খোলসের বাইরে আসুক এ গোপালের কাম্য ছিল, কিন্তু সেটা যেন সহজ আগমন হয়, ধূমকেতুর মত আবির্ভাব না হয়, সেটাও কাম্য

ছিল ওর। কিন্তু গোপাল অনভ্যস্ত ইতুকে এই বিশৃঙ্খলার ভেতর ও-রকম একটি ছেলের সঙ্গে দেখে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল।

কিন্তু ইতু বেশ সহজ ভাবেই এগিয়ে এল। ছোট্ট একটা তৃপ্ত হাসি নিয়ে বলল, দাদা বাড়ি ফিরছ ?

গোপাল সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করল, তুই কোথায় গিয়েছিলি ?

একটা কৃতিত্বের খুশী নিয়ে বলল ইতু, প্রথমে সৌমেনদার ওখানে গিয়েছিলাম। একেবারে ভয় পায়নি দেখলাম। আমাকে দেখে অবাক। তার পর কাছাকাছি দু' এক বন্ধুর বাড়ি সেরে জয়াদের বাড়ি গিয়েছিলাম ওদের খোঁজ খবর নিতে।

জয়ার দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমি বললাম একা যেতে পারব, তবু আমাকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। তা, তুমি কি বাড়ি ফিরবে এখন ?

ঠিক এখনই বাড়ি ফেরার পরিকল্পনা ছিল না, তবু জয়ার দাদা ছেলেটি ওকে আদৌ উৎসাহিত করতে না পাবায় বলল গোপাল, হ্যাঁ, বাড়িই ফিরছিলাম। যাবি নাকি ?

ইতু জয়াব দাদাকে এটকু কষ্ট স্বীকাবেব জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে জীপে এসে উঠল। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বুঝল গোপাল, এমন আচমকা ওর কষ্ট লাঘব হওয়ায় আদৌ খুশী হতে পাবে নি ও। বরং গোপালেব ওপর মনে মনে বিরক্ত হয়েছে। অন্য সময় হলে হয়তো বিরক্তিটুকু গোপন করার চেষ্টা করত, কিন্তু এই অনিয়মের অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে তার প্রয়োজন বোধ কবল না ও।

চঞ্চল কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে চারদিক দেখছিল ইতু। নবাগত পর্যটকের দৃষ্টিতে। মাঝে মাঝে ইতুকে আড়চোখে দেখছিল গোপাল। ব্যর্থ শিল্পকর্মের দিকে ক্লান্ত ক্ষুব্ধ শিল্পীর চোখে।

ইতু এক সময় বাচ্চা মেয়ের খুশীতে বলল, কেমন অদ্ভুত লাগছে সব, না ?

গোপাল গম্ভীর ভাবে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু তুই আর বাড়ি থেকে বেরোস না ইতু।

ইতু দাদার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, কেন ?

সামনে চোখ রেখেই বলে গোপাল, আমার ভয় হচ্ছে ছবিতে পর্যন্ত সমুদ্র না দেখেই তুই সত্যি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিস।

সামান্য গম্ভীর হয় ইতু। দাদার চোখে কথাটার মর্মার্থ খোঁজে। তারপর আস্তে বলে, ক্ষতি কি ? সমুদ্রের মেয়াদ যদি মাত্র দু'দিন হয়, তাহলে সেটাই স্বাভাবিক।

এবার ইতুর দিকে ফিরে তাকায় গোপাল। ওর চোখে কথাটার মর্মার্থ অনুসন্ধান করে।

পাড়ায় পৌঁছে দেখল গোটা পাড়াটা থমথম করছে। সংবাদের চেয়েও এখন আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে সবাই বেশী ভাবিত। আণবিক অস্ত্র সাংঘাতিক কিছু, এর চেয়ে বিস্তৃত বিবরণ এ প্রসঙ্গে জানেনা কেউ। এর বাস্তব রূপ, সম্ভাব্য পরিণতি অথবা প্রতিরক্ষামূলক বিধিব্যবস্থা প্রসঙ্গে কেউ কোনদিন মাথা ঘামায়নি। রাষ্ট্রই এসব সমস্যা প্রসঙ্গে মাথা ঘামাচ্ছে জেনে, অথবা, এই দানবীয় আণবিক শক্তিটি মানুষের চেতনায় কিছুটা রূপকথার দানোর মতই কল্পনাশ্রয়ী থেকে গেছে বলে। কিন্তু আজকের আঘাতে সবাই বুঝে ফেলেছে, এই অকল্পনীয় সংকটের মুখে রাষ্ট্র বা বিশ্ব কত অসহায়। নিরাশ্রয় মানুষ তাই নিজের কথা ভাবতে শুরু করেছে।

ফলে বাড়িতে খাল খুঁড়ছে অতি সাবধানী কেউ কেউ। গ্রামের দিকে পালানর কথা ভাবছে আর একদল। বালির বস্তাও নাকি সংগ্রহ করছে অনেকে। সবই পূর্ব-যুদ্ধের সীমিত অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু সঠিক পরিণতিটা যদি অনুমান করতে পারত, বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যতবাণী বিশ্বাস করত, তাহলে বোধ হয় এই বৃথা পরিশ্রমটুকু করত না কেউ। কারণ, সেই সম্ভাব্য দুর্ঘটনার পর একমাত্র জীবিত থাকবার সম্ভাবনা থাকবে কেন্নো কেঁচো শ্রেণীর কিছু প্রাণীর, যাদের অপরিসীম

অবজ্ঞায় আজ ঘৃণা করে মানুষ।

বাড়িটা থমথম করছে। কোন সাড়া শব্দ নেই। নিঃশব্দে ইতু ও গোপাল বাড়ি ঢুকল।

বাবা এখনও ফেরেন নি। মা পূজোর ঘরে বিগ্রহের সামনে ধ্যানস্থ। কৃষ্ণা চাদর মুড়ি দিয়ে মা'র খাটে শুয়ে। ইতুও ওর নিজের ঘরে চলে গেল। অথচ কারো ক্ষেত্রেই গোপালেব কিছু করার নেই। অসহায় দর্শকের ছাড়া নেবার মত কোন ভূমিকা নেই।

পা টেনে টেনে নিজের ঘরে এল গোপাল। টেবিলে ভাত ঢাকা আছে। বিচলিত মনেও নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছেন মা! এতক্ষণে যেন ক্ষিধেটা নতুন করে অনুভব করে গোপাল। টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়।

অন্যমনস্কে যাচ্ছিল, হঠাৎ একসময় খেয়াল হল, দরজায় দাড়িয়ে কৃষ্ণা। চোখে অদ্ভুত এক শূন্য দৃষ্টি। কপালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে এলোমেলো কিছু চুল। ওর চোখে চোখ পড়তে এগিয়ে এল কৃষ্ণা। গোপালের চোখে চোখ রেখে হঠাৎ ক্ষুব্ধ নালিশের সুরে প্রশ্ন করে বসল, আমি কি করব?

প্রশ্নটা তীব্রতার সামনে কিছুটা হকচকিয়ে যায় গোপাল। কিছু বলতে গিয়েও ইতস্তত করে।

অধৈর্য কৃষ্ণা প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। এই নিঃসঙ্গ পুরীতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। শুধু চিন্তা, শুধু চিন্তা করতে করতে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে নিজেব মনে কথা বলছি। অন্তত একজন কথা বলার মত কাউকে এনে দিন আমাকে।

গোপাল আস্তে চোখ নামিয়ে নেয়। চোখ দুটো ভারী হয়ে এসেছে ওর। নিঃশব্দে থালার ওপরই হাত ধুতে থাকে।

সেকি, আপনি খেলেন না?

সঙ্কোচে অনুতাপে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যেন কৃষ্ণা।

গোপাল হাত মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ায়।

ক্ষিদে পায়নি, খেতে ইচ্ছে করছিল না।

তার পর ওর দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন করে, আপনি বেরোবেন আমার সঙ্গে ?

সঙ্কুচিতভাবে বলল কৃষ্ণা, আমি সেজন্য বলি নি। বাইরে আরো ভয় করে। আচ্ছা আপনি যান, আমি বরং মা'র কাছে গিয়ে বসছি।

গোপাল কি বলবে ভেবে পেল না। এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে ও। হয়তো দু এক ঘণ্টা বাড়িতে থেকে কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলে ওর নৈঃসঙ্গ কাটাতে পারে। কিন্তু অতক্ষণ কি কথা বলবে ? কত কথা বলবে ? হয়তো অজান্তে এক সময় কথা হারিয়ে সেই ভয় ভয় নৈঃশব্দের ভেতরই তলিয়ে যেতে থাকবে দুজনে, যে নৈঃশব্দের সুযোগে ভারসাম্যহীন মনের সেই অনভিপ্রেত চিন্তাগুলো সরব হতে শুরু করে ; যাদের ভয় পায় গোপাল।

চিন্তাটা গোপালকে হঠাৎ নাড়া দেয়। চিন্তার ওপর দিয়ে কতগুলো এলোমেলো হাওয়া ডানা ঝাপটে যায় যেন। আড় চোখে কৃষ্ণার দিকে তাকায় একবার। এবং, এই প্রথম, যেন লক্ষ্য করে, কৃষ্ণা হাসলে ওর গালে টোল পড়ে। ওর ঠোঁট দু'টো ঈষৎ চাপা। ব্লাউজের রংটা হালকা মেরুন। অন্তর্বাসে টিপ বোতাম।

গোপাল দ্রুত চোখ নামিয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। কোন তরিৎ সিদ্ধান্ত জানানর সুরে বলে ফেলে, তাই ভাল। আপনি মা'র কাছেই যান।

বলে আর দাঁড়ায় না গোপাল। ব্যস্ততার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যেন আশ্রয়ের ব্যাকুলতায়ই আবার সেই ভীড়ে ভেসে পড়ে।

বড় রাস্তার মুখে এসে অনেকক্ষণ পর মনে পড়ায় ঘড়িটা দেখে নেয় একবার। বেলা চারটে।

যেতে যেতে কালকের যজ্ঞ স্থানটার কথা মনে পড়ে গোপালের। গাড়ির মুখ ঘোরায় ও।

বিরাট বিরাট লাল শালুর ওপর উজ্জ্বল অক্ষরে 'বিশ্বশান্তি যজ্ঞ'—

প্যাণ্ডেলের মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে। প্যাণ্ডেলের বাইরেও থই থই করছে লোক। রাস্তায় গাড়ির মেলা। অসংখ্য এ্যাম্‌প্লিফায়ার মন্ত্রোশ্চারণে মুখর। ততোধিক মুখরতায় ভলেন্টিয়াররা কর্মব্যস্ত।

প্যাণ্ডেলের ভেতরেও লোকে লোকারণ্য। প্রদেশ বা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সে ভীড়। কেন্দ্র স্থলে বিরাট আরম্বর সহকারে যজ্ঞ চলছে। লকলকে অগ্নিশিখা মাঝে মাঝে উদ্দাম হয়ে উঠছে ঘৃতাহুতিতে। চন্দন কাঠের গন্ধে ভরে গেছে মণ্ডপ। চতুস্পার্শে বেষ্টিত বেদীতে বিভিন্ন বর্ণের চন্দন-চর্চিত পুরোহিতরা কর্মব্যস্ত। তাঁদের দুর্বোধ্য মন্ত্রোশ্চারাণে গমগম করছে যজ্ঞস্থান। ভীড়ের ভেতর থেকে ঘন ঘন নয়া পয়সা থেকে হাজার টাকার নোট পর্যন্ত বর্ষিত হচ্ছে যজ্ঞস্থানে। পুরোহিতদের সহকারীরা তৎপরতার সঙ্গে বড় বড় নোটগুলো আগুনের স্পর্শ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে।

এই পরিবেশে দাঁড়িয়েও হঠাৎ গোপালের মনে একটা অঙ্ক খেলে গেল। এদেশে এখন কত কাল টাকা ভেসে বেড়াচ্ছে? সঠিক অঙ্কটা জানা মুস্কিল, তবে একজন কংগ্রেস নেতার মতেই প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। এবং ভীড় সরিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে এত গাম্ভীর্যের ভেতরও একটা হালকা প্রশ্ন খেলে যায় মনে। ঘিগুলো আগমার্কা তো।

গাড়ির ভীড়ে প্রায় আধ মাইল দূরে জীপটা রেখে আসতে হয়েছিল। ভীড় ঠেলে ঠেলে জীপের কাছে পৌঁছাতে প্রায় মিনিট কুড়ি লেগে গেল। কিন্তু জীপে বসেও হঠাৎ সামনে একটা হুড়োহুড়ি দেখে নেমে আসতে হল ওর। দু'টো লোক, কোন্ পত্রিকার কে জানে, একটা টেলিগ্রাম এনেছে। কিন্তু মুখে টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম করে চেঁচালেও, গোপাল লক্ষ্য করল, হ্যাণ্ডবিলের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে ওরা কাগজগুলো। কোন্ পত্রিকা হঠাৎ এমন উদার হয়ে উঠল! কৌতূহলে এগিয়ে গেল গোপাল। ভীড়ের ভেতর মিশে গিয়ে প্রচণ্ড হুড়োহুড়ির ভেতর থেকে কোনক্রমে একটা কাগজ সংগ্রহ করে আনল। তাও আবার অক্ষত নয়। নিচের কোণের অংশটা ছেঁড়া।

একটু ফাঁকায় এসে বিরাট ঔৎসুক্যে কাগজটা পড়ার চেষ্টা করল
র।

টেলিগ্রামটার শীর্ষে সম্পূর্ণ নতুন একটি সংবাদপত্রের নাম—সুসমা-
। তার নিচেই পৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট সংবাদ শিরোনামা—বর্তমান
সংকট হইতে পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন।

এরপর বড় বড় হরপে পরবর্তী সংবাদ ঃ আশ্চর্য রক্ষাকবচ আবিষ্কার।
লয় হইতে দেড় হাজার বৎসর বয়স্ক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব।
মাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য—

কি করণীয় তা আর জানা হল না গোপালের। কারণ এর পরের
টুকুই ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

এভাবে প্রতারিত হয়ে মেজাজ খিঁচরে গেল। চুলটা হাত বুলিয়ে
করতে করতে জীপে এসে বসল আবার। ভীড় সরিয়ে এগোতে
করল।

বড় রাস্তার তুলনায় বরং গলিগুলো সুগম। প্রাইভেট গাড়ি যা
রটা চলছে তারাও গলি ধরে চলবার চেষ্টা করছে। গোপালও তাই
।। গাড়িতে 'প্রেস' লেভেল দেখে দু'চারজন কৌতূহলী হয়ে
াচ্ছিল ওর দিকে।

যেতে যেতেই রেডিও ঘোষণায় একটা অদ্ভুত সংবাদ পেল।

ঃ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানান যাচ্ছে যে, বিভিন্ন দেশের কিছু
তি গোপনে পাইলটদের কোটি কোটি টাকা ঘুষের প্রস্তাব
য়েছিল। অত্যন্ত ঘৃণা ও ক্ষোভের সঙ্গে সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান
ছেন পাইলটরা। জানিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের চোখের জল
রক্ত মেশান ও টাকা আপনারাই রাখুন! জীবনে দু'দিনের জন্য
উদার হবার চেষ্টা করবেন না।

ধনপতিদের কাছে আমাদের অনুরোধ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা
সমাধানের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, আপনারা কোন ব্যক্তিগত
ষ্টায় তাকে ব্যাহত করবেন না।

একটা অক্ষম ক্ষোভে মনটা রি রি করে ওঠে গোপালের। ও নিশ্চিত, এই দেশ বিদেশের ধনপতিদের ভেতর সেই দেশ বিদেশের অস্ত্রশস্ত্র-কারখানার মালিকরাও নিশ্চয়ই আছেন, যারা পর্দার আড়াল থেকে আবহমানকাল নিরস্ত্রীকরণে বাধা দিয়েছে। পণ্ডিত নেহেরু যে আন্তর্জাতীক চক্রে সম্বন্ধে বলেছিলেন, এরা নরহত্যার পাইকারি ব্যবসাদার। এরা দেশ প্রেমকে ক্ষেপিয়ে তুলে কাজ হাসিল করে। মৃত্যুকে নিয়েই এদের খেলা!

ঈশ্বর মানে না, তবু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে ইচ্ছে হয় গোপালের, সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসের পরও যদি দৈবাৎ দু'চারজন বিকৃত বিকলাঙ্গর প্রাণে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, তাহলে এরাই যেন বেঁচে থাকে। গলিত বিকৃত দেহাবশিষ্ট নিয়ে সেই নিঃসঙ্গ অভিশপ্ত গ্রহে যেন এরা দীর্ঘজীবি হয়!

গলি থেকে বড় রাস্তায় নামতে হল আবার। কিছুদূর এগিয়ে একটা জনাকীর্ণ চৌমাথায় পার্থব সাক্ষাৎ পেল। পাগলের মত চীৎকার করে উদ্দাম জনতাকে আয়ত্তে আনাব চেষ্টা করছে এখনও পার্থরা। পার্থব সঙ্গে এবার কিছু শ্রমিক যুবক ও বিদেশী তরুণকেও দেখা গেল। সংকল্পে ঋজু চেহারা। আশায় উজ্জ্বল দৃষ্টি। আপ্রাণ বোঝানর চেষ্টা করছে ওরা, এ-রকম অসহায় ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করা কাপুরুষতা। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলে বাঁচার একটা শেষ পথ খুঁজে বেব করা সম্ভব। গোল টেবিল বৈঠকে রাষ্ট্রনেতাদের মাধ্যমে নয়, আমাদের দাবী সরাসরি পৌছে দেবার অধিকার দিতে হবে আমাদের। শেষ চেষ্টার সুযোগ দিতে হবে আমাদের।

কিন্তু সামান্য দু'চারজন ছাড়া কেউ কান দিচ্ছে না ওদের কথায়।

ঘটনার উত্তাল স্রোতে ভাসতে ভাসতে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল গোপাল, পার্থদের দেখে আবার সজাগ হল। একটা দীর্ঘ ক্লান্ত যাত্রা পথে বহুদূরের একটা আশ্রয়ের আভাস বলে মনে হচ্ছিল ওদের।

অফিসের সামনে এসে সামান্য অবাক হয় গোপাল। অত্যন্ত সামান্য কিছু লোক ভয়ার্ত নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় দরজার সামনে বসে। কোন দাবী নেই, উত্তেজনা নেই। নিজেরাও বোধ হয় জানে মিথ্যে প্রত্যাশা, তবু পুরনো অভ্যেসে অবিশ্বাস্য অপ্রত্যাশিত কোন সংবাদের আশায় বসে এখনও।

অফিস আরো ফাঁকা হয়ে গেছে। অত বড় হলঘরটায় মাত্র ছয়সাত জন বসে কাজ করছে। নিজের মনে ফোনটা বেজে যাচ্ছে, কারো ধরবার তাড়া নেই। টেলিপ্রিন্টার সংবাদ ঢেলে যাচ্ছে, কারো দেখবার উৎসাহ নেই। এখন একটি মাত্র সংবাদের জন্য সবাই উৎসুক। পাইলটদের নেমে আসার সংবাদ। তাছাড়া সব সংবাদই এখন গৌণ, অবান্তর। আসল এবং একমাত্র সংবাদটুকুর জন্য কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী না থাকলেও চলছে, যেহেতু, প্রতিমুহূর্তে রেডিও সে-সংবাদ দিচ্ছে।

গোপাল নিঃশব্দে সম্পাদকের ঘরে এল। একা বসে বসে প্রুফ্ দেখছিলেন তিনি। গোলটেবিল বৈঠকটা প্রসঙ্গে যে সংবাদ জানিয়েছিল গোপাল সেটাকেই বিরাট শিরোনামায় প্রথম সংবাদ করা হয়েছে। ওঁকে প্রুফ্ দেখতে দেখে করুণা বোধ করে গোপাল।

গোপালকে দেখে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকালেন সম্পাদক।

ওদিককার আর কোন সংবাদ আছে?

গোপাল আস্তে মাথা নাড়ে। না। অবশ্য ওখান থেকে বেশ কিছুক্ষণ আগে এসেছি। এখন ওখানেই যাচ্ছি আবার।

সম্পাদক স্তিমিত স্বরে বললেন, যাও, তবে খুব তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন নেই। কারণ কাগজের অবস্থা ভাল নয়। যারা এখনও আছে তারা নেহাৎ কাগজকে ভালবেসেই আছে বোধ হয়। কিন্তু মাত্র এ'কজন দিয়ে কাগজ চলে না। তাছাড়া সবচেয়ে সমস্যা হয়েছে মেসিনম্যান নিয়ে।

গোপাল ওর অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেই প্রশ্ন করে বসল, কাগজ

চলছে কেমন ?

সম্পাদক অন্তরঙ্গতার সহজ সুরে বললেন, চলছে ; লোকে খুব উৎসাহ বোধ না করলেও হাতের কাছে পেলে কিনছেও। কিন্তু ওদিকটা আদৌ ভাবছিনা এখন। কেমন যেন একটা জেদ, একটা নেশার ঝোঁকেই পত্রিকা বের করে যাবার চেষ্টা করছি।

তার পর একটু থেমে বললেন, তবু এ-কাজটুকু নিয়ে আছি বলে, না হলে বোধ হয় এতক্ষণে পাগল হয়ে যেতাম।

গোপাল আস্তে বলল, আমি প্রুফ্‌টা দেখে দেব ?

গোপালের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন সম্পাদক। তার পর একটু করুণ হেসে বললেন, তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝি ; নেশা। যে নেশা প্রতি যুগে কিছু বোকা লোকের থাকে বলেই পৃথিবীটা বেচাকেনার হাট বাজার হয়ে ওঠেনি এখনও। তোমরা হয়তো শুনলে হাসবে, এ নেশা একদিন আমারও ছিল। কিন্তু ক্রমে সহজলভ্য অর্থ, ক্ষমতা, প্রভুত্বের নেশা কখন যেন ও নেশাটাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। হয়তো এরকম একটা পরিস্থিতি না এলে সেটা কোনদিনই এভাবে অনুভব করতে পারতাম না।

গোপাল কথা না বাড়িয়ে প্রুফ্‌টা নিয়ে চলে এল। হলঘরে এসে দেখে পিনাকী চৌধুরী ফোনের সামনে বসে ফোন করছে। সামনে এক গাদা ফোন নাম্বার লেখা একটা ফুলস্কেপ কাগজ। অন্তরঙ্গ সুরে কাকে যেন ফোন করছে। তার এবং আরো অনেকের খোঁজ খবর নিচ্ছে।

গোপাল একটা ফাঁকা টেবিলে গিয়ে বসল। কিন্তু প্রুফ্‌টা দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করল, ওর দেওয়া সংবাদের ওপরও আর একটু রং চড়ান হয়েছে। প্রথম যে যে কারণে বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে তার সব চেয়ে বড় কারণ নাকি, পাইলটদের কোন উপায়ে নামিয়ে আনতে পারলে, ঐ বোমাগুলোর ভাগবাটোয়ারা। বিশ্বস্ত সূত্রে উভয় শক্তিজোট অনুমান করছে পাইলটদের সঙ্গে বেজোড় সংখ্যার বোমা আছে ! ওরা নেমে এলে শক্তিজোট দু'টো সমান দু'ভাগে বোমাগুলো ভাগ করে নেবার পর বেজোড়

সংখ্যাটা কার হেপাজাত যাবে। সেটাই নাকি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

সংবাদটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না গোপাল। এখন অবশ্য কোন সংবাদেরই অথেন্‌টিসিটি নিয়ে মাথা ঘামানর মত উৎসাহ বা মনের ধৈর্য নেই কারো তবু সজ্ঞানে, বিশেষ করে এ সময়ে, এমন একটা মিথ্যে সংবাদ দিতে মনটা বেঁকে বসল ওর। প্রুফ্‌টা নিয়ে সম্পাদকের ঘরে গেল আবার।

সম্পাদক আরো দু'তিন জন স্টাফের সঙ্গে কি নিয়ে যেন আলোচনা করছিলেন। গোপাল একটু ইতস্তত করে বক্তব্যটা পেশ করল। সম্পাদক গম্ভীরভাবে বললেন, যে পথে তোমাদের খবরটুকু এসেছিল সম্ভবত সেই পথেই এটাও বাইরে এসেছে। একটু আগেই সুপ্রকাশ বাবু ফোনে জানালেন কথাটা।

সুপ্রকাশবাবু! গোপাল বিস্মিত হয়। ওদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের মালিক এ-সংবাদটা জানিয়েছেন! এ অফিসে বসে যার নাম, নিন্দাসূচক প্রসঙ্গ বাদে, উচ্চারণ করাও প্রায় অবৈধ!

সম্পাদক বোধ হয় ওর সংশয়টা টের পান। আস্তে বলেন, কাল রাত্রে বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকরা নিজেদের ভেতর একটা আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সঙ্কটের গুরুত্ব অনুভব করে শেষ পর্যন্ত সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, প্রতিযোগিতা বা ব্যবসার কথা ভুলে এখন সমবেত প্রচেষ্টায় ভয়ার্ত মানুষকে সর্বশেষ এবং সঠিক সংবাদ পরিবেশন করে যাওয়াই সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত। কোন কাগজ কোন সংবাদই আর এক্সক্লুসিভ করে রাখবে না। সুপ্রকাশবাবুর পার্সোনাল ফ্রেণ্ড একজন ফরেন জার্ণালিষ্ট ভদ্রলোক এই কন্‌ফারেন্স কাভার করতে এসেছেন, সংবাদটা তারই সূত্রে পাওয়া নাকি।

গোপাল নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার পর প্রুফ্‌টা দেখে সম্পাদকের নির্দেশ মত সোজা মেসিন রুমে দিতে যায়।

বিরাট রোটারী মেসিনটার সামনে জনকয়েক মাত্র নিঃশব্দে কাজ করে

যাচ্ছে। হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তারা। গোপাল কিছুক্ষণ চুপ করে দৈত্যাকার মেসিনটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এতদিন ওর কর্তব্য ও অধিকারের নির্ধারিত সীমারেখার বাইরে থাকায় এত নিবিড় অন্তরঙ্গভাবে যেন কোনদিন দেখে নি যন্ত্রটাকে। যন্ত্রটাকে আজ ওর ক্লান্ত বিমর্ষ কোন সহকর্মী বলে মনে হচ্ছিল।

একজনকে অতিরিক্ত মাত্রায় হিমসিম খেতে দেখে এগিয়ে গেল গোপাল।

আমি কোন সাহায্য করতে পারি?

লোকটি ভাবলেশহীনভাবে বললে, করুন।

গোপাল এগিয়ে গেল। বিরাট একটা তৃপ্তি বোধ করছিল ও এই নতুন কাজে। কিছুক্ষণ সাহায্য করল ওকে। তারপর, জামা কাপড়ে কিছু তেল কালি মেখে, কিছুক্ষণ বাদে নিজের টেবিলে ফিরে এল আবার। পরবাসী চৌধুরী তখনও সমানে ফোন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনকে। হয়তো বছর ক'য়েকের ভেতর যাদের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখে নি ও, তাঁদেরও।

পরিবর্তিত মুখ দেখতে দেখতে এর ভেতরই অভ্যস্ত গোপাল এতে বিস্মিত হল না। শুধু একবার মনে হল, জীবনে কত সাজানো, আরোপিত দর্শন নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। এ ধরণের কোন আঘাত না এলে যাকে আজীবন নিজস্ব জীবন দর্শন ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে মানুষ।

এক কোণে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছিলেন প্রৌঢ় সাব-এডিটার মাইতিবাবু। একটু রূঢ় ভাবেই ডাকলেন হঠাৎ পিনাকী চৌধুরীকে।

এই যে ভাই, রাজ্য শুদ্ধ সবাইকেই তো ফোন করলেন। এবার একটু এদিকে আসুন। একা এতগুলো নিউজ সামলান যায়?

পিনাকী চৌধুরী উঠে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। মাইতিবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি কাজ করতে আসি নি, ফোন করতে এসেছিলাম। তা ছাড়া, এখন কাজ করার মত মনের অবস্থা নেই।

সব ভুল হয়ে যাবে।

মাইতিবাবু চটে বললেন, আমরা পারছি কি করে ?

পিনাকী চৌধুরী সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে আস্তে বলল, আমিও তাই ভাবছি !

বলে নিরাসক্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ও। গোপাল এগিয়ে আসে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সহজভাবে বলে, আমি হাত লাগালে আপত্তি আছে ?

মাইতিবাবু চোখ তুলে তাকান। চোখে বিরক্তি, ক্ষোভ ও আতঙ্কের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রন। খিটখিটে স্বরে বললেন, আপত্তি কিসের ? এখনও এসব বৈষ্ণব বিনয়ের মেজাজ আছে আপনাদের ?

গোপাল কোন উত্তর না দিয়ে টেলিপ্রিন্টার-নিউজের কয়েকটা টুকরো নিয়ে গিয়ে পাশের টেবিলে বসে। অনুবাদ করতে শুরু করে।

একটু বাদেই সম্পাদকের ঘর থেকে একজন সহকর্মী বেরিয়ে এসে ওকে খবর দিল, আপনাকে এক্ষণি একবার ডাকছেন উনি।

গোপাল তাড়াতাড়ি উঠে সম্পাদকের ঘরে গেল। সম্পাদক ওকে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ঘরের ট্র্যানজিস্টারটা চাপা ক্ষোভে সরব হয়ে ওঠে।

ঃ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানান যাচ্ছে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

এটুকু বলেই হঠাৎ ঘোষক তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে প্রায় চীৎকার করে উঠল, কেন, কেন এরা নিজেদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছে না। সমস্ত পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ে জুয়ো খেলার কোন অধিকার নেই এদের। মানুষ বাঁচতে চায় ; সমস্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে শান্তিতে বাস করতে চায়। তারা না পারলে সরে আসুন, সাধারণ মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক—

কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ স্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা ছোট্ট ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল ও-প্রান্ত থেকে। বোঝা গেল, জোর করে

ঘোষককে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে মাইকের সামনে থেকে।

সমস্ত ঘরের ওপর গভীর নৈস্তব্ধ নেমে আসে। কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন। এতক্ষণে ছোট্ট একটা ভয় ভয় অনুভূতি টের পায় গোপাল। নির্দিষ্ট কিছুর ভয় নয়, অস্পষ্ট একটা অনিশ্চয়তার ভয়।

সম্পাদক গভীর চিন্তায় কপাল চেপে ধরে বসেছিলেন। এক সময় ক্লান্ত দৃষ্টিতে গোপালের দিকে তাকালেন। নিষ্প্রাণ স্বরে বললেন, একটু আগেই সুপ্রকাশবাবু ফোন করেছিলেন। ওঁর সেই ফরেন-জার্নালিস্ট বন্ধু দেশে ফিরছেন। ভদ্রলোক নিজেদের পত্রিকার প্লেনেই এসেছিলেন। তিনি নাকি প্রয়োজন হলে এখানে আটকে-পড়া অন্য প্রদেশের তু' একজন যাত্রীকে পথে নামিয়ে দিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন। তুমি তোমাদের বাড়িতে আটকে-পড়া এক মহিলার কথা বলেছিলে না? একবার ট্রাই করে দেখতে পার!

গোপাল তক্ষুণি বেরিয়ে এল অফিস থেকে। অফিসের জীপটা নিয়ে দ্রুত বাড়ির দিকে রওয়ানা হল। জানে না প্লেনটা কোথায় যাবে, পথে কোন কোন জায়গা পড়বে, তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। কৃষ্ণার জন্য হয়তো এই-ই শেষ চেষ্টা।

পথে বহু জায়গায় বাধা পেয়ে, থেমে, শেষ পর্যন্ত যখন বাড়ি পৌঁছাল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

জীপ থেকে লাফিয়ে নেমে দ্রুত পায় বাড়ি ঢুকতেই বৈঠকখানার দরজার মুখে হঠাৎ তুজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা। মধ্যবয়সী তুই ভদ্রলোক। বোধ হয় বেরুচ্ছিলেন ঘর থেকে। গোপালকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন ওঁরা। বেশ সহজ ভঙ্গীতে একজন বললেন, আপনার বাবার কাছে এসেছিলাম। তিনি বাড়ি নেই শুনে চলে যাচ্ছিলাম। তা, আপনাকে পেয়ে ভালই হল।

ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল গোপাল, কেন বলুন তো?

বিনা ভূমিকায় জড়তাহীন কণ্ঠে বলল ওঁরা, আপনাদের বাড়িটা বিক্রী করবেন কি না জানতে এসেছিলাম।

এবার রীতিমত বিস্মিত হয় গোপাল।

কেন, কিনবেন ?

পেলে কিনতাম। নগদ টাকায়। শুধু রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ওপর একটা সই করে দিলেই হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কোন জবাব দিতে পারে না গোপাল। অদ্ভুত এক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু ওঁদের দিকে। বুকের ভেতর একটা উদগত ঘৃণা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে টের পায়। তারপর, প্রায় নিজের অজান্তেই, ও হঠাৎ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে, বেরিয়ে যান, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান এখান থেকে। নাহলে লাথি মেরে বের করে দেব ঘর থেকে।

লোক দু'টো হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে থতমত খেয়ে যায়। তারপর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

একসঙ্গে দু'টো তিনটে করে সিঁড়ি টপকে ওপরে আসে গোপাল। বাবার ঘর খালি। মা'র ঘরেও নেই কেউ। তাড়াতাড়ি পূজোর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মা চোখ বুজে আসনে বসে। মা'র পেছনে কৃষ্ণা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসে গভীরভাবে কী যেন ভাবছে। সুদূর অন্যমনস্ক দৃষ্টি।

চৌকাঠের সামনে এসে ও কৃষ্ণাকে ডাকল।

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন তো, এখনি একবার এয়ারপোর্টে যেতে হবে।

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ায়। ক্লান্ত দূরাগত স্বরে জিজ্ঞেস করে, কেন ?

গোপাল চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বলল, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবার জন্য। এক্ষুণি তৈরী হয়ে নিন।

কৃষ্ণা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মা'র ঘরে গিয়ে মুহূর্তের ভেতর তৈরী হয়ে নিল।

গোপাল বাইরে অপেক্ষা করছিল। বলল, চলুন।

কৃষ্ণা সিঁড়ির দু'টো ধাপ নেমেই দাঁড়িয়ে পড়ল। কি যেন

মনে পড়েছে। বলল, একটু দাঁড়ান। দ্রুত পায়ে ও পূজোর ঘরের দিকে ফিরে গেল।

মিনিট কয়েক অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে গোপাল ডাকতে গেল কৃষ্ণাকে। কিন্তু পূজোর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মা ও কৃষ্ণা পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

গোপাল গভীর আবেগে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ওর ঠোঁট ছু'টো কেঁপে উঠল একবার। গলার কাছে ভার ভার অনুভব করল।

সচেতন হয়ে নিজেকে সামলে নিল গোপাল। সভয়ে লক্ষ্য করল, আবেগ, উত্তেজনা, সব কিছুর ওপরই ও শাসন হারিয়ে ফেলছে। অনুভূতিগুলো অনভিপ্রেত স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে।

কিছুটা অকম্পিত আদেশের স্বরে ডাকে ও. আর দেরী করবেন না, সময় নেই।

কৃষ্ণা মা'কে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। গভীর দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকিয়ে থেকে মা'কে প্রণাম করে ফিরে আসে।

মা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। নিঃশব্দ। নিস্পন্দ।

এ ছু'দিনের ঘনিষ্ঠ আশ্রয় ছেড়ে কৃষ্ণা নিঃশব্দে এসে গোপালের সঙ্গে জীপে ওঠে। গোপালের পাশে বসে। এখন আর কাঁদছে না কৃষ্ণা। কেমন যেন নিরস ভাবলেশহীন মুখে নিঃশব্দে বসে আছে।

গলিটা পেরিয়ে আসতে আসতে লক্ষ্য করল গোপাল পাড়ার অনেকেই বোধ হয় পালাতে শুরু করেছে। বেশ কিছু বাড়িতে তালা ঝুলছে। মিঠুদের ঘরের রাস্তার দিকের দরজা জানলা সব বন্ধ। ওরাও পালাল নাকি? মিঠুর ফোলা ফোলা গাল মিষ্টি মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই সোহাগী স্বর, কাকু, তিকিত্ ?

এবার এগোতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে শহরের। ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে মানুষ। কোথায়ও

আস্থা খুঁজে পাচ্ছে না। অসহায় মানুষ এবার যেন অনিবার্য অন্তিমকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর উষ্ণ শ্বাস অনুভব করছে শরীরে। কিন্তু সে অক্ষম, অসহায়, নিরাশ্রয়।

অক্ষম ক্ষোভ, অবরুদ্ধ আক্রোশ, অবদমিত লিপ্সা সমস্ত শাসন ভেঙ্গে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে। অন্য দিন সন্ধ্যার মায়াবী শহর এক মর্মান্তিক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় যেন থরথর করে কাঁপছে।

কোন রকমে পথ করে করে এগিয়ে যাচ্ছিল জীপটা। এখন আর কারো কোন কৌতূহল নেই। সমীহ করে পথ ছাড়ছে না কেউ, নেহাৎ অবজ্ঞা ভরেই যেন করুণা করে পথ দিচ্ছে।

গভীর অন্যমনস্কতায় স্টিয়ারিংএ বসে গোপাল। দ্রুত পরিবর্তন-শীল ঘটনাগুলোকে যেন পুরো চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছে না। ঘটনার গতির সঙ্গে চিন্তার সমতা রক্ষা করতে পারছে না।

বিহ্বল অসহায় ভঙ্গীতে গোপালের গা ঘেঁষে বসে কৃষ্ণা। গভীর আতঙ্কের সঙ্গে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে ও।

প্রচলিত নিয়ম কানুনের তেমন ধার ধারছে না মানুষ। ছোট ছোট অশালীন দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ছে। অবরুদ্ধ ক্ষোভ, আক্রোশ, সঠিক প্রকাশ রন্ধ্র খুঁজে না পেয়ে মাঝে মাঝে অহেতুক উচ্ছৃঙ্খলতায় ফেটে পড়ছে। ফুটপাথের লোহার রেলিং উপরে ফেলছে। অকারণে লাইট পোস্টের বাল্‌বগুলো ভাঙ্গছে। ডাষ্টবিনগুলো লাথি মেরে মেরে উল্টে ফেলছে রাস্তার ওপর। কেউ নিষেধ করছে না। কেউ গায়ে মাখছে না। গোপাল বুঝতে পারে, যে কোন মুহূর্তে ধৈর্যের শেষ সীমায় উপনীত ঐ নিরাসক্ত দর্শকরাও এই উশৃঙ্খলতায় মেতে উঠতে পারে। একটা ভয়াবহ আরণ্যক জীবনে ফিরে যেতে পারে আজের সভ্যসমাজ।

অতি সাহসী, অথবা অতি হিসেবী দু'চারজন এখনও দোকানপাট খোলা রেখেছে। সংখ্যায় তার ভেতর রেষ্টুরেণ্ট, হোটেলই বেশী। প্রচুর ভীড় সেখানে। দোকানের সামনেও রেডিও সংবাদ প্রত্যাশী জনতার

ভীড়। এখনও যারা একটা ফয়সালার শেষ আশাকে খড়কুটোর মত আঁকড়ে ধরে আছে।

কিছু দূর এগিয়ে রাস্তায় উলটানো একটা ডাষ্টবিনের ওপর দাঁড়িয়ে একটি লোককে পাগলের মত হাত পা ছুড়তে দেখল গোপাল। চলমান ভীড় ঔৎসুক্যে মাঝে মাঝে থামছে। কিন্তু কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না ওর চীৎকারকে।

চোখ দু'টো উত্তেজনায় জ্বলছে। উষ্কখুষ্ক চুলগুলো মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে। জামার সমস্ত বোতাম খোলা। পকেটটা ছিড়ে ঝুলছে। অপ্রকৃতিস্থ ভঙ্গীতে সমানে চীৎকার করে যাচ্ছে লোকটি।

ওদের টেনে হিঁচড়ে বের করে আন। আমাদেব সামনে এসে বলুক ওরা, কোন প্রশ্নে ওদের মতদ্বৈধতা। কাদের স্বার্থে ওরা একমত হতে পারছে না। সাধারণ মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে জুয়া খেলবার অধিকার ওদের কে দিয়েছে। ঐ নরখাদকগুলো আমাদের কেউ না। ঐ বৈঠক বোমা ফেলে চুরমার করে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হোক, আমাদের হয়ে কথা বলবাব অধিকার ওদেব নেই আমাদের মৃত্যুব ওপর মাতব্বরি করার ওরা কে?

পার্থর কথা হঠাৎ মনে পড়ে গোপালেব। কে জানে, হয়তো শহরের আর এক প্রান্তে পার্থরাও এখন নিষ্ফল আবেদনে এরকমই চীৎকার করে বেড়াচ্ছে। নির্দিষ্ট পতাকা বিহীন পার্থদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা নাতুলতা হয়ে ভেসে যাচ্ছে উন্মত্ত জনস্রোতের মুখে।

যেতে যেতে ঐ সাময়িক অপ্রকৃতিস্থ লোকটার শেষ প্রশ্নটা ঘুরপাক খেতে থাকে মনে—ওরা কে?

ওরা কে! প্রচলিত সমাজ কাঠামোর অভ্যস্ত মানুষ হিসেবে বহুদিন পর প্রশ্নটা এমন সজীব তীক্ষ্ণ হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই প্রাগৈ-তিহাসিক যুগের একক বিচ্ছিন্ন মানুষ ইতিহাসের স্রোত বেয়ে নামতে নামতে ক্রমে একদিন যূথবদ্ধ হল। পরস্পর নির্ভরতা বাড়ল তার। সমাজবদ্ধ হল। জটিলতা হল জীবন। বহুমুখী হল সমস্যা। তখন

নিজেদের সুখ সমৃদ্ধি শান্তি নিরাপত্তার কথা ভেবেই মানুষ সৃষ্টি করল নিরাবয়ব কিন্তু অমিত শক্তিশালী, রাষ্ট্রের। নিজেদের ঐচ্ছিক নির্বাচনে নিযুক্ত করল রাষ্ট্রের কর্ণধার। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে একদিন লক্ষ্য করল মানুষ, নিজেদের সৃষ্ট যন্ত্রই মাঝে মাঝে নিজেদের স্বার্থের সমৃদ্ধির শান্তির সহজ প্রশ্নে জটিল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। মাঝে মাঝে সে যন্ত্র বীভৎস হুঙ্কারে ওর সহজ অধিকারকে আতঙ্কিত করছে। অথচ অপরিহার্য নিয়মে সেই যন্ত্রকে তার প্রতিনিয়ত শক্তি যুগিয়ে যেতে হবেই। স্বেচ্ছায় যেন এমন একটি আমোঘ নিয়ম সে সৃষ্টি করেছে, যে নিয়মে প্রতিদিন তিল তিল করে এক এক ফোটা বুকের রক্ত দিয়ে একটি ঐন্দ্রজালিক পাত্র তার পূর্ণ করে যেতে হবে, কিন্তু সে পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে তার মুখের কাছে ফিরে এলে তা অমৃত না বিষ, কিসে পূর্ণ থাকবে জানে না সে। বিষ বহন করে আনলেও যা প্রত্যাখ্যানের একক শক্তি তার সীমিত। সমবেত শক্তি লাভ আয়াস সাধ্য। বিপদজ্জনক। সে-সব মুহূর্তে সেই বিষপাত্র হাতে নিয়ে অক্ষম ক্ষোভে, ধিক্কারে মানুষ এভাবেই বোধ হয় অদৃশ্য ভাগ্যের কাছে এই নিরুত্তর প্রশ্নই তুলে ধরে, আমার সৃষ্ট যন্ত্রকে আমারই বিরুদ্ধে আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করছে যারা, তারা কারা?

গোপাল স্থির নিশ্চিত, পৃথিবীর সাধারণ মানুষ আজ যুদ্ধ চায় না। মৃত্যু চায় না। যুগ যুগ ধরে ঋষি, কবি, শিল্পীরা নিটোল সুন্দর কবিতার মত যে নিরুপদ্রব জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছে মানুষকে, সেই জীবন চায়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, বিশ্বব্যাপী জীবনধ্বংসী প্রস্তুতির জন্য সেই মানুষেরই আবার অজান্তে শক্তিও যুগিয়ে যেতে হয়। যে প্রস্তুতির জন্য বর্তমান বিশ্বে প্রতি মিনিটে খরচ হচ্ছে পাঁচশ সত্তর হাজার পাউণ্ড। যে মারণ-যজ্ঞ আয়োজনে দু'কোটির বেশী মানুষ আজ সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত। দু'শ কোটির বেশী মানুষ লিপ্ত সামরিক বৃত্তিতে। বৈজ্ঞানিক কর্মীদের শতকরা পঁচাত্তর জন সংযুক্ত সামরিক ক্ষেত্রে। অথচ পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা পনের ভাগ আজও বুভুক্ষু। শতকরা তিরিশ ভাগ

অপুষ্টি জনিত রোগে আক্রান্ত। এবং যাকে রোধ করার জন্য একক শক্তিতে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছিলেন জে, ডি, বার্ণাল, আমাকে মাত্র তিন মাস সময় ও সুযোগ দেওয়া হোক, পৃথিবী থেকে চিরতরে খাদ্য সংকট দূর করব আমি।

গোপাল জানে, পৃথিবীব প্রতিটি প্রান্তে আশায় উদ্ভাসিত মানুষ সোল্লাসে এই চ্যালেঞ্জকে সমর্থন জানিয়েছে। তাই হোক, পৃথিবী ক্ষুধা রোগ মুক্ত হোক। কিন্তু তা হয় নি। তা হতে দেওয়া হয় নি। কাব স্বার্থে? তারা কারা? ওরা কে!

হঠাং সামনের দোকানের বেডিও গম্ভীব আবেগে ঘোষণা শুরু করল। উংকণ্ঠায়, আগ্রহে গাড়িব ব্রেক কসল গোপাল। গভীর ঔংসুক্য নিয়ে কান পেতে থাকল।

ঃ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানান যাচ্ছে গোল টেবিল বৈঠক সর্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্তে পৌছেছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দল মত নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতিটি বাষ্ট্র একটি সমবেত কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

ঘোষক সামান্য থামলেন। গভীর আগ্রহে উংকণ্ঠায় থমথম করছে নিঃশব্দ জনতা। একটা অনুচ্চাব প্রত্যাশায় চিকচিক করছে চোখ।

ঘোষক আবার শুরু করলেন। আবেগে থমথম করছে গলা।

ঃ এই মাত্র বৈঠক থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলের কথা ভেবে, মানব জাতির ভবিষ্যতেব কথা চিন্তা কবে, পাইলটদের বিরত হবার জন্য বিনীত অনুবোধ জানালেন। তাঁবা নেমে এলে পৃথিবীর শান্তিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সমবেত প্রচেষ্টাব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তাঁদের। মানুষের যুগ যুগ চেষ্টায় যে মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি গড়ে উঠেছে তাকে রক্ষা করার জন্য তাঁদের মানবিক দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। আশা করা যাচ্ছে কিছুক্ষণের ভেতরই তাঁদের পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের কথা আমরা শুনতে পাব।

ঘোষক আবার থামলেন। রুদ্ধ উত্তেজনায় মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে

থাকল জনতা। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মৃত মিছিলের মত। একটি কথা নেই। একটি শব্দ নেই। পরস্পরের দিকে আতঙ্কে চোখ তুলে তাকাচ্ছেনা পর্যন্ত কেউ। এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি বছর।

আচমকা সবাইকে চমকে দিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠল রেডিও।

ঃ ওঁরা মানলেন না। ওঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন এই সমবেত প্রার্থনা। একান্ত অনীহার সঙ্গে পাইলটরা জবাব দিয়েছেন, পৃথিবীর মঙ্গলের কথাটা শুনতে শুনতে পৃথিবী আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মিথ্যে ভাঁওতার প্রতি তাঁদের আর কোন মোহ নেই। সহনীয় মৃত্যুর জন্য পৃথিবীকে প্রস্তুত হতে অনুরোধ করেছেন তাঁরা।

এই প্রথম একটা গভীর আতঙ্ক গোপালের শিরা-উপশিরাকে সজাগ করে প্রবাহিত হল। উত্তেজনায় ষ্টিয়ারিংটাকে শক্ত হাতে মুঠি করে ধরে ও একবার। কৃষ্ণা হঠাৎ ওর কাঁধে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সচেতন হয় গোপাল। গাড়িটাও মুহূর্তে সজীব হয়ে ওঠে।

আশাকে খড়কুটো করে যারা এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল, প্রচণ্ড উত্তেজনায় এবার ভেঙ্গে পড়ল তারা। একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক প্রচণ্ড ঝড়ের মত টালমাটাল করে দিল জনতাকে। চীৎকার, কান্না, হুট্টগোলে মুখর হয়ে উঠল রাস্তা।

রেডিও আবার সরব হল।

ঃ বৈঠকে উপস্থিত সর্বরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা জনসাধারণকে মনোবল না হারাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁরা পুনর্বার অনুরোধের জন্য মনস্থ করেছেন। অথবা অন্য কোন সর্বসম্মত পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য আলো-চনায় প্রস্তুত হচ্ছেন। যে কোন উপায়েই হোক এই সংকট থেকে তাঁরা পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারবেন বলে এখন পর্যন্ত স্থির নিশ্চিত। জনসাধারণকে স্ব স্ব রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা।

কিন্তু এই স্তোকবাক্য জনসাধারণের উত্তেজনাকে, আতঙ্ককে কিছুমাত্র নিরোধ করতে পারল বলে মনে হল না।

এয়ারপোর্ট লোকে লোকারণ্য। রাণওয়েতে কোন যাত্রী প্লেন নেই। দু'তিনটা ছোট বিদেশী প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। সে প্লেনের সামনে হুড়োহুড়ি চলছে। ট্রাম-বাসের মত বাদুড় ঝুলছে তাতে মানুষ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল গোপাল। এর ভেতরই সেই বিদেশী সাংবাদিকের প্লেনটা আছে কিনা কে জানে। হয়তো আছে, না হলে এ ভীড় কেন? কিন্তু তিনি কোথায়?

হঠাৎ এয়ারপোর্টের এতক্ষণের নিস্তব্ধ মাইক ঘোষণায় মুখর হয়ে উঠল।

ঃ একটি জরুরী ঘোষণা। আপাতত বিমানঘাটি থেকে কোন বিমান বাইরে যেতে পারবে না। সরকারী জরুরী নির্দেশে সমস্ত বিমান চলাচল পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া হল। জনসাধারণকে বিমানঘাটি ত্যাগ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যাচ্ছে।

গোপাল কৃষ্ণার দিকে ফিরে তাকায়। আস্তে বলে, আর অপেক্ষা করে বোধ হয় লাভ নেই।

কৃষ্ণা নিরুত্তর। ওর শূন্য দৃষ্টি কেমন যেন ঋজু হয়ে আসছে। কৃষ্ণাকে নিয়ে আবার এসে জীপে ওঠে গোপাল।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এবার বিপরীতমুখী কিছু গাড়ি চোখে পড়ল। দেখেই বুঝল গোপাল, শহরতলীর দিকে পালানর হিড়িক শুরু হয়েছে। বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে পায়ে হেঁটেও পালাচ্ছে কিছু লোক। গোপালের মায়া হয়। হয়তো ওরাও জানে বৃথা, তবু লেলিহান অগ্নিবলয়ের ভেতর দাঁড়িয়ে মানুষ যুক্তি হারায়। অলীক পথেও বাঁচবার চেষ্টা করে।

কিছুটা এগিয়ে ছোট্ট একটা উত্তেজিত ভীড়ের ভেতর আটকে গেল জীপটা। একদল অল্পবয়স্ক ছেলে-ছোকরা বিপরীতমুখী ক'টা গাড়িকে

ঘিরে ধরেছে।। গালাগাল দিচ্ছে। ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে।

হঠাৎ সামনের একটা দামী গাড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হয় গোপাল। একই গাড়ির ভেতর নিরক্ত ফ্যাকাশে মুখে যে পাঁচ ছ'জন বসে আছেন গোপাল চেনে তাঁদের। অহি-নকুল সম্পর্কিত প্রতিদ্বন্দ্বী তুই রাজনৈতিক দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতা তাঁরা। ধারালো বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিদগ্ধ সমাজেও যাঁরা স্বনামধন্য।

তাঁদের গাড়িটা ঘিরে-ধরা বালখিল্যদের সুভাষিত মন্তব্যগুলোও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

কি দাদা, সব একাই পালাচ্ছেন ? আমরা মানুষ না ?

গাড়ি আছে বলেই পালিয়ে বাঁচবেন সেটি হচ্ছে না ; নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন।

করজোড়ে বোঝানর চেষ্টা করছেন নেতারা।

বিশ্বাস কর ভাই, পালাচ্ছি না।

এই একটু আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নিতে যাচ্ছিলাম।

অপরপক্ষের শ্লেষ মেশান জবাব এল, তা আমরাই কি পর দাদা ? আমাদেরও একটু খোঁজ খবর নিন।

একজন নেতা অভিনেতা-সুলভ হাসবার চেষ্টা করলেন। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমরা তো আছিই। চিরদিনের মত আজও আপনাদের সুখে-দুঃখে আপনাদের সঙ্গেই আছি।

কিন্তু নিচের তরুণ পদাতিকদের তুড়ীয় মেজাজের মুখে ভেসে যায় সে আশ্বাসবাণী।

ওসব ছেঁদো কথা রাখুন দাদা। ভালোয় ভালোয় নেমে আসুন না।

টেনে নামা, টেনে নামা মক্কেলদের।

এরই ভেতর টায়ারে অবরুদ্ধ বাতাসের সরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল। বিজয়োল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল ধূলোয় দাঁড়ান মানুষের বাচ্চাগুলো।

এত উত্তেজনার ভেতরও ছোট্ট একটা কৌতুক বোধ করে গোপাল। কিন্তু সামনের থেমে থাকা গাড়িটা চলতে শুরু করায় এ দৃশ্যের শেষ না দেখেই ওদের এগিয়ে যেতে হয়। পেছনের গাড়িগুলো তারস্বরে হর্ণ দিচ্ছে।

কিছুটা এগিয়েই টের পায় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। সচেতন পর্যবেক্ষণে মনে হল গোপালের, মানুষ মোটামুটি চার ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বিস্ময়ে আতঙ্কে হতবাক একদল গৃহের গুহায় আত্মগোপন করেছে। সমস্ত বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আপন প্রিয়জনের নিবিড় সান্নিধ্যে অপ্রতিরোধ্য ভাগ্যের জন্য প্রতীক্ষা করছে। আর একদল বহিশক্তির ওপর আস্থা হারিয়ে মন্দির মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অন্য একদল অক্ষম আক্রোশে মাঝে মাঝে ধ্বংসকামী হয়ে উঠছে। হাতের কাছে যা পাচ্ছে ভেঙ্গে চূরমার করছে। ক্রমশঃ প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠছে। শেষ দল অবদমিত পিপাসায় জীবনপাত্রের গরল সুধার শেষ বিন্দু পর্যন্ত আকণ্ঠ পান করে যাবার নেশায় উন্মার্গ হয়ে উঠেছে। রুচি মানছে না। আব্রু মানছে না। রিপুর সমস্ত লাগাম খুলে দিয়ে উদ্দাম তারা।

এ-দৃশ্যগুলোর সামনে গোপাল অস্বস্তি বোধ করছিল। কৃষ্ণার কথা ভেবে সঙ্কোচ বোধ করছিল। মাঝে মাঝে দু'এক মুহূর্তে নিজেকেও দুর্বল মনে হচ্ছে।

এক সময় বলল তাই, চলুন, আপনাকে তাহলে আবার বাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে আসি।

কৃষ্ণা গম্ভীর স্বরে বলল, বাড়ি না।

গোপাল ওর দিকে ফিরে তাকায়। তাহলে কোথায় যেতে চান বলুন?

কৃষ্ণার দৃষ্টি কেমন যেন দুর্বোধ্য হয়ে এসেছে। টেনে টেনে জবাব দিল ও, যেখানে হোক, কিন্তু ঐ চার দেওয়ালের নির্বাসনে আর নয়। আমি মৃত্যুর আগেই তাহলে পাগল হয়ে যাব বোধ হয়।

তারপর হঠাৎ আবেগে ওর হাত চেপে ধরে বলল, আপনি পারবেন না? জীবনের বাকী সময়টুকু আপনার সঙ্গে রাখতে পারবেন না? আপনার কোন কাজে আমি অসুবিধে ঘটাব না। বিরক্ত করব না।

গোপাল গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকায়। এই নিঃসঙ্গ মেয়েটির জন্য মায়া হয় ওর। তবু ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

আপনার এ সময় বাইরে থাকাটা বোধ হয় খুব সমীচীন হবে না। তা ছাড়া এখন বাইরে যা অবস্থা তার অনেক কিছুই আপনি হয়তো ঠিক সহ্য করতে পারবেন না।

কৃষ্ণা গোপালের চোখে চোখ রেখে কেমন অদ্ভুতভাবে যেন নিঃশব্দে হাসল।

তবু জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তে এটাই জীবন-সত্য। মরতেই যখন হবে জীবনের সুশ্রী কুশ্রী দু'টো দিককেই দেখে যাই না কেন!

গোপাল তীক্ষ্ণভাবে ওর এই অপরিচিত দৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিল।

কৃষ্ণা হঠাৎ দুর্বোধ্য এক হেঁয়ালী অনুকম্পায় ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, আপনার ভয় করছে?

কৃষ্ণার ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠল একবার। অসহ্য একটা অস্বস্তি বোধ করে গোপাল। কৃষ্ণা কী বলতে চায়? এ কি ওর অভিমান? ক্ষোভ? আত্মোপলব্ধি? অথবা অমৃতের আকাঙ্খায় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আত্মা আত্মঘাতী গরল পানে অধীর হয়ে উঠেছে? নিজের অজান্তেই দেহের শিরা উপশিরাগুলো একবার আচমকা ঝাঁকি দিয়ে ওঠে গোপালের! মুহূর্তের জন্য একটা অবোধ্য উত্তেজনা ওর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। তবু সেই আচ্ছন্নতায় পুরো ডুবে যাবার আগে ও প্রায় চীৎকার করে জিজ্ঞেস করে, আপনি কী বলতে চান? স্পষ্ট করে বলুন।

কিন্তু কৃষ্ণা উত্তর দেবার আগেই আচমকা রাস্তার আলোগুলো সব নিভে গেল। সেই ভৌতিক অন্ধকারের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল মারমুখী

এক উন্মত্ত জনতা। লুটপাট হানাহানিতে লণ্ডভণ্ড করে তুলল চারদিক। অসহায়ের চীৎকার, আর্তের ক্রন্দন আর আক্রমণকারীদের উল্লাসে নরক হয়ে উঠল সেই অন্ধকার অংশ। কৃষ্ণা আতঙ্কে চীৎকার করে জড়িয়ে ধরল গোপালকে। কিন্তু গোপাল কোন অভয়বাণী উচ্চারণের আগেই মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

যখন জ্ঞান হল গোপালের, তখন রাস্তার আলো আবার জ্বলেছে। চারপাশে তাণ্ডবের স্বাক্ষর ছড়িয়ে। দু'একটা গাড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ে আছে। রাস্তায় মিলিটারী টহল দিচ্ছে।

গোপালের মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এক মিলিটারী অফিসার। চেতনায় ফিরে আসতে এতক্ষণ যিনি সাহায্য করছিলেন। গোপাল বুঝল আঘাত তত গুরুতর নয়। বোধ হয় আঘাতটা আচমকা বলে এবং প্রচণ্ড উত্তেজনা ও ক্লান্তির মুখে ছিল বলেই সহ্য করতে পারে নি। আস্তে উঠে বসল ও।

অফিসার ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কিছু খোয়া যায় নি তো?

গোপাল নিজের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল, ঘড়ি আর পেনটা। কিন্তু আমার সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি কোথায়?

অফিসার ভদ্রলোক কৃষ্ণার পুরো বিবরণ শুনলেন, কিন্তু কোন হদিস দিতে পারলেন না। ওকে সামান্য আশ্বাস দেবার সুরে বললেন, অনেকেই প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারেন পালিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, ভদ্রমহিলা হয়তো কোন রকমে বাড়িও চলে যেতে পারেন।

গোপাল চাপা আতঙ্কের সঙ্গে বলল, কিন্তু সে যে এখানকার পথঘাট কিছুই ভাল করে চেনে না। আপনারা একটু খুঁজে দেখতে পারেন না?

ভদ্রলোক হতাশভাবে বললেন, কা'ন্ট হেল্প। এই বিশৃঙ্খলার ভেতর আমাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। আপনি বরং বাড়ি গিয়ে

দেখুন। একা যেতে পারবেন তো?

গোপাল গাড়িতে স্টার্ট দিল। মোটামুটি সব কিছু পরীক্ষা করে নিল একবার। তার পর বলল, পারব।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয় গোপাল। পথের চার পাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। শহরে ঢুকে লক্ষ্য করে, বিশেষ বিশেষ কতগুলো জায়গায় মিলিটারী পাহাড়া বসেছে।

কৃষ্ণা বাড়ির ঠিকানাটা জানে নিশ্চয়ই। অবশ্য নাও জানতে পারে। যদি না জানে তাহলে কি করে ফিরবে ও? কার সাহায্য চাইবে? এ অবস্থায় অপরিচিত বিপদগ্রস্থ কারো জন্য এগিয়ে আসার সৌজন্যবোধ কি অবশিষ্ট আছে কারো?

বাড়ির সামনে মিলির গাড়িটা দাড়িয়ে আছে। সামান্য বিস্মিত হয় গোপাল। মিলি এ অবস্থায় বেরিয়েছে? বেরুতে দিয়েছে ওর বাবা? কিসের প্রত্যাশায় এসেছে মিলি? কৃষ্ণা প্রসঙ্গে আরো কিছু উপদেশ দেবার জন্য? নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় ও।

নিচের বৈঠকখানায় নিঃশব্দে বসে ছিল মিলি। ঝড় পেরিয়ে আসা চেহারা। চোখে উত্তেজনা। অস্থিরতা।

ওর সামনে এসে দাঁড়ায় গোপাল। তুমি!

একটু চমকে তাকায় মিলি। তার পর সামান্য শ্লেষের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, তোমার তো সময় নেই, তাই আমারই আসতে হল। সে কোথায়?

অনুমান মিথ্যে নয় তাহলে? মনটা ঘৃণায় রি রি করে ওঠে গোপালের। মিলির চোখে চোখ রেখে দাঁতে চেপে বলে ও, সেই কথাটা জানতে এত দূর এসেছ?

গোপালের দৃঢ়তার সামনে স্তিমিত হয়ে আসে মিলি। ওর চোখের দৃষ্টি ক্রমে আতুর হয়ে ওঠে। অসহায় স্বরে বলে, এতদূর কেন এসেছি তুমি বুঝছ না?

গোপাল দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, ঠিক বুঝছি না।

দু'চোখে করুণ আর্তি নিয়ে বলে মিলি, না এসে উপায় ছিল না। কাল থেকে নিজের মনের সঙ্গে আমি আপ্রাণ লড়েছি। কিন্তু তোমার কাছে হেরে গেলাম। আজ আমি সেই হার স্বীকার করতে এসেছি।

হঠাৎ গোপালের দু'হাত চেপে ধরে মিলি। আবেগে ভেঙ্গে পড়ে। তোমার কাছে আমার শেষ প্রার্থনা, চল এই মুহূর্তে এই অভিশপ্ত শহর থেকে আমরা পালিয়ে যাই। না হলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব গোপাল।

প্রস্তাবটায় মিলিকে স্বার্থপর মনে হয় গোপালের। আগের শ্লেষ নিয়েই বলে, বড় দেরীতে সিদ্ধান্তে এলে মিলি!

মিলি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এবার। আমি জানি তোমার অভিযোগের সঙ্গত কারণ আছে। বাবার আভিজাত্যবোধ, ব্যক্তিত্ব আর স্নেহের দাবীর সামনে আমি কিছুতেই নিজের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি নি এতদিন।

ক্ষুব্ধ অভিমানে বলে গোপাল, তোমার বাবা যেদিন আমার আর্থিক অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে তোমার সামনেই আমাকে অপমান করলেন সেদিনও না!

সে জন্য যে কোন শাস্তি তুমি আমাকে দিতে পার, আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার ভালবাসায়—

গোপালের কেমন যেন জেদ চেপে যায়। মিলির এই অসহায়ত্বকে পীড়ন করে অবোধ্য একটা তৃপ্তি পায় ও। নিজেকে সংযত করতে পারে না। ব্যঙ্গের সুরে বলে, শুনতে বেশ ভাল লাগছে। কিন্তু যদি বলি, আজ মৃত্যু অনিবার্য না জানলে সেই ভালবাসার স্বীকৃতি এই দরিদ্র সাংবাদিকের ঘরে না পৌঁছে শেষ পর্যন্ত কোন অভিজাত প্রাসাদে গিয়েই পৌঁছাত, তাহলে মিথ্যে বলা হবে?

মিলি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তুমি আমাকে এতটুকু বিশ্বাস কর না? কতখানি বিশ্বাস করতাম সে কি তুমি জান না!

মিলি ওর হাত চেপে ধরে। সেই আশ্বাসেই এসেছিলাম। তোমার কাছে আজ অসঙ্কোচে নিজেকে সমর্পন করছি গোপাল। তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

গোপাল নিজেও যেন বোঝে না, ওকে পীড়ন করে কিসের এ তৃপ্তি! তীব্র আঘাতের একটা নেশায় পেয়ে বসে ওকে। ভুরু কুঁচকে বলে ও, সেটুকুই বোধ হয় আসল প্রস্তাব। সেজন্য এত দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না।

মিলি মাথা তুলে সোজা ওর চোখে চোখ রাখে। সে চোখে বিস্ময়, ভয়।

তুমি আমাকে এত বড় অপমান করতে পারলে?

সামান্য হেসে বলে গোপাল, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালে মানুষের কাছে প্রেমের চেয়েও প্রয়োজনটাই বড় হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। সে কথা স্বীকার করতে এত সঙ্কোচ বোধ করছ কেন?

মিলির স্বর দৃঢ় হয় এবার। দৃষ্টি স্থি হয়ে আসে।

তাই যদি হত, তাহলে এই মুহূর্তে এখানে না থেকে কোন অভিজাত প্রাসাদেও থাকতে পারতাম আমি। এখন পর্যন্ত তুমিই নিশ্চয়ই একমাত্র জীবিত পুরুষ নও।

গোপাল অম্লান বদনে বলে, সেটুকু হয়তো তোমার রুচির, সংস্কারের অবশিষ্টাংশ। মানুষ আত্মহত্যা করার মুহূর্তেও উলঙ্গ হয়ে মরতে সঙ্কোচ বোধ করে।

চরম আঘাতে মিলি যেন পাথর হয়ে যায়। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গোপালের দিকে। একরাশ জটিল চিন্তা-তরঙ্গের উত্তাল ছায়া পড়ে চোখে। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে দৃষ্টি। আবেগে থরথর করে কেঁপে ওঠে ঠোঁট দু'টো।

তার পর, আচমকা বুকের আঁচলটা ছুড়ে ফেলে দু'হাতে ব্লাউজটা ছিড়ে ফেলতে ফেলতে চীৎকার করে ওর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে মিলি। তাহলে তাই হোক, একটি প্রেমের কথাও উচ্চারণ না করে তুমি আমার দেহ

নাও, যেমন খুশী ভোগ কর, অপমান কর। কিন্তু তার পর, তার পর তুমি আমাকে গ্রহণ কর গোপাল।

মিলির আচমকা উষ্ণ আলিঙ্গনে মুহূর্তের জন্য শিরা উপশিরায় সেই ভয় ভয় উত্তেজনাটা ছড়িয়ে পড়ে গোপালের। সাজানো চিন্তাগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় ও মিলিকে। চেয়ারে বসে পড়ে দু'হাতে মাথা ঘষটাতে ঘষটাতে অস্ফুটে বলতে থাকে, তুমি যাও, তুমি বাড়ি যাও মিলি। আমি পারব না। আমি আর পারছি না।

কিছুক্ষণের ভেতরই নিজেকে সংযত করে গোপাল। সংহত চেতনায় ফিরে আসে। আস্তে মাথা তুলে তাকায়। ঘর খালি। মিলি চলে গেছে। ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। মিলি চলে গেল!

কৃষ্ণাও হারিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই বাড়ি ফেরে নি। তাহলে এ গোলমাল শুনে নিচে আসত। কৃষ্ণাও কি ঈর্ষা করত মিলিকে?

ক্লান্ত পা টেনে টেনে নিঃশব্দে ওপরে ওঠে ও। জনশূন্য নিস্তব্ধ বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে।

বাবার ঘর খালি। বাবা ফেরেন নি এখনও। কিন্তু বাবার জন্য দুশ্চিন্তা নেই ওর। বাবা অভিমান করে, আঘাত পেয়ে বাড়ি ছাড়েন নি। অনুতাপের আত্মদহনে শুদ্ধ হয়ে পথে নেমেছেন। হয়তো পথে পথে এ-দুদিনের শান্তির আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গের সামান্য টাকা ক'টি বাবা নিজের জন্য নিয়ে যান নি, জানে ও। হয়তো পথে পথে বিলিয়ে দিয়েই শান্তির আশ্রয় গড়ে নিচ্ছেন।

পূজোর ঘর শূন্য। বুকটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে গোপালের। মা কোথায়? মা'র ঘরের দিকে তাকায় ও। ঘরের দরজা বন্ধ। কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। কৌতূহলে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় গোপাল।

আলমারির পূর্ণাবয়ব আয়নার সামনে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে

মা পরনে বিয়ের রাতের ঝলমলে লাল বেনারসী। সারা অঙ্গে ঝকমকে গয়না। তন্ময় হয়ে নিজের অপরিচিত প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আছেন মা।

হঠাৎ এক সময় প্রতিবিম্বের ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠল। সমস্ত শরীরটা ফুলে ফুলে উঠল একবার। তার পর নিঃশব্দ কান্নায় দু'হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন মা।

আবেগে গলাটা আটকে আসছিল গোপালের। দাঁতে ঠোঁট চেপে নিঃশব্দে সরে এল ও জানলা থেকে। এই পুঞ্জীভূত বঞ্চনার সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবার মত কোন সান্ত্বনা নেই ওর কাছে।

নিজের ঘরের সামনেও একবার গিয়ে দাঁড়াল ও। কেউ নেই। শুধু ইতুর ঘরটা বাকী। তার পর নিশ্চিত জানা, কৃষ্ণা ফেরে নি। তার পর ?

ইতুর ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু ইতু ঘরে নেই। ছাদে নেই। সারা বাড়িতেও না। তাহলে কি বাড়ি নেই ইতু ? স্নেহে, সহানুভূতিতে বুকটা কেঁপে উঠল একবার। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল ও। মা'র ঘরের দিকে আসতে আসতে দেখল, মা পূজোর ঘরে বিগ্রহের সামনে বসে। পরনে পট্টবস্ত্র। নিরাভরণ পাষাণ মূর্ত্তির মত ধ্যানস্থ মা।

তবু উত্তেজনায় ডাকল একবার, মা।

কোন উত্তর নেই।

মাগো !

কেন সাড়া নেই।

নিঃশব্দে চৌকাঠের সামনে থেকে ফিরে আসে গোপাল। জানে বৃথা, তবু এখন ওর একমাত্র করণীয় কৃষ্ণাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা। ইতুকে ফিরিয়ে আনা।

নিঃশব্দে আবার নেমে আসে গোপাল। এই শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ থেকে শব্দের পথে এসে দাঁড়ায়।

মিঠুদের ঘর বন্ধ। ওরা কি চলে গেল ? না কি, চার দেওয়ালের

গুহার আশ্রয়ে অস্তিমের জন্য প্রতীক্ষা করছে? কাল সকালেও কি রোজের অভ্যেসে দরজায় এসে হাত পেতে দাঁড়াবে মিঠু, কাকু তিকিত্ ?

ভীষ্মদার ঘরে তালা ঝুলছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। জানলার কাঁচের ভেতর দিয়ে বইঠাসা আলমারিটা দেখা যাচ্ছে। সারা জীবনের একমাত্র সঙ্গী দর্শনের বইগুলো। যুগব্যাপী মানব চৈতন্যের শুভ চিন্তার স্বাক্ষরগুলো।

বোধ হয় সহজাত অভ্যেসেই একবার থানায় গেল। থানা প্রায় শূন্য। একা অফিসার বসে থানা আগলাচ্ছেন। ঘরের এক কোণে অনেকগুলো রাইফেল স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। বোঝা যায়, তুলে নেবার লোক নেই।

অফিসার ভদ্রলোক চিনতেন গোপালকে। সামান্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখনও সংবাদ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? ধন্য আপনারা!

অনেকক্ষণ পর যেন সচেতন হয় গোপাল, ও সাংবাদিক। নিজের পরিচয়ের তৃপ্তিটা আবছা অনুভব করে। তাই আসল উদ্দেশ্যটা সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করে, নতুন কোন সংবাদ আছে?

কি সংবাদ চান বলুন। গোটা পৃথিবীটাই এখন সংবাদে।

গোল টেবিল বৈঠকের?

কী যেন গোপন শলা-পরামর্শ চলছে ভেতরে। বাইরে প্রচণ্ড উত্তেজিত জনতা প্রতীক্ষা করছে।

শহরের অবস্থা?

খুব সামান্যই জানবার সুযোগ পাচ্ছি। দু'তিন জায়গায় মিলিটারীর গুলি চালাতে হয়েছে। অবশ্য ডাইরেক্ট ভায়লেন্সের কেস ছাড়া অন্য কোথায়ও মিলিটারী হস্তক্ষেপ করছে না। চোখ বুজে থাকছে।

গোলাল জিজ্ঞেস করল, কেউ মারা গেছে?

অফিসার বললেন, জনা পাঁচেক।

এবার নিজের প্রসঙ্গে আসে গোপাল। কৃষ্ণার সব বিবরণ দিয়ে পুলিশের সাহায্য চায়। অফিসার ভদ্রলোক সরাসরি জানিয়ে দিলেন,

এ প্রসঙ্গে বর্তমানে পুলিশের করণীয় কিছু নেই।

গোপাল জানত। এ জন্য আদৌ ক্ষুণ্ণ হ'ল না ও। থানা থেকে বেরিয়ে এসে আবার জীপে উঠল। অফিসের কথা মনে পড়ল এবার। অনেকক্ষণ অফিসে যাওয়া হয় নি। কোন সংবাদ নেবারও সুযোগ পায় নি। পত্রিকা বেরুবে ত আর? পত্রিকার চিন্তায় অন্য চিন্তাগুলো পূর্বের তীব্রতা হারাল।

পত্রিকা আফিসের সামনে আর ভীড় নেই। এতক্ষণ সংশয়ের দোলায় তুলছিল বলেই বোধ হয় সংবাদের প্রয়োজন বোধ করছিল মানুষ। কিন্তু সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে এখন। মৃত্যুশয্যায় সংবাদের গুরুত্ব আর কতটুকু!

একটা ভৌতিক শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে অফিসটা। জনমানব শূন্য। কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে এই মুহূর্তে যেন প্রাণচঞ্চল কর্মকেন্দ্রটি থেকে সমস্ত জীবিত প্রাণীকে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। কেমন গা ছমছম করে ওঠে গোপালের। বুকটা মুষড়ে ওঠে।

সম্পাদকের ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। গোপাল ক্লান্ত পায়ে সেদিকে এগোয়।

শোন!

আচমকা গম্ভীর ডাকে চমকে ওঠে গোপাল। ফিরে তাকায়। এক কোণে একটা চেয়ারে দলা পাকিয়ে বসে সেই মাইতিবাবু। বিচিত্র আলো আঁধারের বৃত্তে কেমন যেন রহস্যজনক মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে। গোপাল এগিয়ে যায় সেদিকে।

গভীর শ্লেষের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন মাইতিবাবু, তুমি আবার মরতে এসেছ কেন? বাড়ি ঘর নেই?

গোপাল মাইতিবাবুর দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আপনিও তো যান নি?

মাইতিবাবু খেঁকিয়ে ওঠেন। যাই নি পেটের দায়ে। বাড়িতে এক গাদা পুষ্যি। শুয়োরের বাচ্চাগুলো ভাত না পেলে আমাকেই

ছিঁড়ে খায়। যদি কিছু না হয় তাহলে চাকরি তো যাবেই, কুলে এসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডটাও মারা যাবে। চেনো তো মালিক শালাকে! তাই এখানে বসেই মরতে এসেছি। কিন্তু তোমরা তো বয়সের ছেলে, তোমাদের ভাবনাটা কি শুনি ?

গোপাল কোন উত্তর দেয় না। বোঝাবার বৃথা চেষ্টা করে না যে, ভাবনায় নয়, ভালবাসায়ই এখনও জড়িয়ে আছে ও। বোঝে, এ মাইতি-বাবুর নালিশ নয়, দারিদ্র্য নিষ্পেষিত আত্মার অক্ষম আত্মধিক্কার। নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে আসে তাই। পায়ে পায়ে সম্পাদকের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

দু'হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারের ওপর অসহায়ভাবে ভেঙ্গেচুরে বসে আছেন সম্পাদক। দরজার শব্দে মুখ তুলে তাকালেন। নিঃশব্দে হাত দিয়ে সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। গোপাল বসল।

আস্তে টেনে টেনে বললেন সম্পাদক, আর সংবাদের প্রয়োজন নেই গোপাল। তোমার নিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ।

তার পর একটু করুণ হেসে বললেন, তোমার উন্নতি ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিলাম। মনে থাকে না!

গোপাল কি বলবে হাতড়ে পায় না। মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকে।

তার পর একসময় সম্পাদকের দিকে চোখ তুলে সহানুভূতির সঙ্গে বলে ও, আপনিও বাড়ি চলে যান না।

সম্পাদক গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে টেনে টেনে বললেন, তা হয় না। এই বাড়ির প্রতিটি ইটের সঙ্গে আমার গায়ের রক্ত মেশানো। প্রতিটি যন্ত্র আমার স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত। আজ বুঝছি আমার প্রিয় পরিজন এরাই। এদের ফেলে যাব কোথায় ? বরং তুমি যাও। বাড়ি যাও। সম্ভব হলে, কর্মচারী হিসেবে নয়, সহকর্মী হিসেবেই একটু যোগাযোগ রেখ।

গোপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়। একটু

ইতস্তত করে বলে, আমার বোনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আর সেই মেয়েটিকে। আমি একটু জীপটা নিয়ে যেতে পারি?

সম্পাদক স্নেহের সুরে বললেন, পার। নিজের অধিকারেই পার। কারণ এখন পর্যন্ত তুমি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছ। না হলেও পারতে।

গোপাল নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

সমস্ত কর্তব্য শেষ। এখন থেকে শুধুই দর্শক।

সিঁড়ির মুখে এসে গোটা অফিসটার ওপর একবার আতুর দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় গোপাল। নিকটতম আত্মীয় বিয়োগের বিষণ্ণতায় মনটা মুষড়ে ওঠে। অভ্যস্ত নিয়মে যুক্ত থাকায় এতদিন যেন ঠিক উপলব্ধি করতে পারে নি, ওর অস্তিত্বের শিকড় এ দালানের ইটকাঠের সঙ্গে কত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। শোকাতুর শ্মশানযাত্রীর মত ক্লান্ত পায়ে রেলিংটা ধরে ধরে নিচে নামতে থাকে ও।

গেট দিয়ে বাইরে বেরোবার মুখে হঠাৎ পেছনে ফোনটা বেজে ওঠে। শূন্য এনকোয়ারির ফোনটা নিজের মনে বেজে যাচ্ছে। আস্তে এগিয়ে যায় গোপাল। ফোনটা তুলে নেয়।

ও প্রান্ত থেকে গোলটেবিল বৈঠকের সংবাদ অনুসন্ধান করছেন একজন। গোপাল ক্লান্ত স্বরে জানিয়ে দেয়, নতুন কোন সংবাদ নেই।

ফোনটা রাখতে রাখতেই কোণের দিকে একটা শব্দ শুনে তাকায় ও। বিস্রস্ত বসন, প্রায় অচৈতন্য একটি মেয়েকে উদ্দাম রিপুর তাড়নায় দুটো পিশাচ যেন ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। চমকে ওঠে গোপাল। সহজাত মানবতাবোধ ওকে মুহূর্তের জন্য ঋজু করে তোলে। কিন্তু ও এগিয়ে যাবার আগেই লোক দু'টো টলতে টলতে পাশের দরজা দিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়। দ্রুত পায়ে মেয়েটির কাছে এগিয়ে যায় গোপাল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে সন্তর্পণে মাথাটা তুলে ধরে। কিন্তু ওর হাতের ওপরই হঠাৎ যন্ত্রণায় তীব্র একটা মোচড় দিয়ে নিঃসাড় হয়ে এক পাশে এলিয়ে পড়ল মাথাটা। গভীর আতঙ্কে মেয়েটির ওপর আরো ঝুঁকে পড়ে ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা

করে মেয়েটিকে। তার পর আস্তে মাথাটা আবার মাটিতে শুইয়ে দেয়। আবেগে উত্তেজনায় হাত দু'টো কেঁপে ওঠে একবার। কিন্তু কিছু করার নেই ওর। একক শক্তি আজ ওরই মত দুর্বল, অসহায়।

রিপুর রক্তাক্ত শিকার হতভাগ্য মেয়েটির দিকে আর্দ্র অতলস্পর্শী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় আবছা তিনটে মুখের আভাস ফুটে ওঠে যেন মেয়েটির মুখে। কৃষ্ণা, ইতু, মিলির। এই মুখ তিনটা আবার সচেতন করে তোলে গোপালকে। গোপাল উঠে দাঁড়ায়। মেঝে থেকে শাড়ীটা তুলে নিয়ে বীভৎস উলঙ্গ দেহটা ঢেকে দিয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে আসে ফোনটার কাছে। ফোনটা তুলে নিয়েই একটা মুখস্থ নম্বর ডায়াল করে।

ঃ করঞ্জিয়া লজ্? মিলি বাড়ি ফিরেছে?···ওঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না? ··আমি ··আমি · ।

পরিচয় না দিয়েই ফোনটা নামিয়ে রাখে গোপাল। কি হবে পরিচয় দিয়ে। আজ ও প্রান্ত থেকে কোন অপমানকর মন্তব্য এলে ও সহ্য করত না। তীব্রতর অপমান ফিরিয়ে দিত হয়তো। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে মিথ্যে কোন বাদানুবাদে মেতে উঠবার মন নেই ওর। শুধু সংবাদটা প্রয়োজন ছিল। মিলির সংবাদ।

রাত্রের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেন আরো উদ্দাম হয়ে উঠছে। একটা অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ছে মানুষ। হিংস্র সরীসৃপের মত অন্তিম মুহূর্তটা যতই এগোচ্ছে, ততই আতঙ্কে স্বরূপ হারিয়ে আরণ্যক হয়ে উঠছে সবাই।

শিথিল মুঠিতে ষ্টিয়ারিং ধরে বসে আছে গোপাল। যেন সারথি নয়, আরোহী মাত্র। এই চলমান যন্ত্রটার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে বসে আছে। অসহায়। নিরাসক্ত। নির্বিকল্প।

চলমান ঘটনাগুলোকে পুরো চেতনা দিয়ে অনুভব করতে পারছে না। অনুভূতিগুলো শ্লথ হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে দু'একটা ঘটনা হয়তো প্রত্যাশিত আবেগ বা উত্তেজনার সঞ্চার করছে, কিন্তু তাও দীর্ঘস্থায়ী

হচ্ছে না। কূলে বসে যেন মাঝ সমুদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গ সংঘাত দেখছে।

সমুদ্রের কথায় হঠাৎ নুলিয়া বালকদের কথা মনে পড়ে। সেই উত্তাল ঢেউয়ের ভেতর ছুঁড়ে দেওয়া পয়সাগুলো মুঠ করে তুলে আনার কথা। আমার যদি সেই শক্তি থাকত! যদি এই উত্তাল সমুদ্র থেকে মাত্র তিনটে মুখ খুঁজে বের করে আনতে পারতাম! কৃষ্ণা, ইতু, মিলি! আর যে মুখগুলো একান্ত নিবিড়ভাবে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাঁরা কেউ পীড়ন করছে না। মা, বাবা, সৌমেন—কেউ না। ওঁরা কেউ হারায় নি। ওঁরা কিছু হারায় নি।

কোন উত্তেজনা নয়, কোন উৎকণ্ঠা নয়, ছোট একটা কামনার হাত ধরে ঘটনার স্রোতে ভেসে বেড়ায় গোপাল। তরঙ্গের উত্থান পতনের দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলে।

চৌরঙ্গী এলাকা লোকে লোকারণ্য। কিন্তু, বোধ হয় শহরের স্নায়ুকেন্দ্র বলেই, মিলিটারী পাহারা কিছু কড়া। অবশ্য তারাও নিরাসক্ত দর্শকের মতই স্থানুর মত দাঁড়িয়ে। শুধু প্রত্যক্ষ ধ্বংসাত্মক কিছু ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে শাসন তুলে নিয়েছে ওরা।

সম্ভবত মিলিটারীর ভরসাতেই এখানে দু'চারটা অভিজাত হোটেল, বার, এখনও খোলা। কিন্তু ক্রেতাদের শ্রেণীভেদ ঘটেছে। অভ্যস্তদের চোখে পড়ছে না আজ। এতদিন বঞ্চিত অনভ্যস্তরা জীবনের শেষ সাধটুকু মিটিয়ে নিতে এসেছে। সে শক্তিটুকুও নেই, অথচ সামরিক শাসনকে অগ্রাহ্য করার সাহসও অর্জন করে উঠতে পারে নি, এমন বহু রিক্ত লুব্ধ উগ্র জনতা লেলিহান বাসনা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে।

জীপটা রাস্তার একপাশে রেখে নেমে আসে গোপাল। বসে থাকতেও ক্লান্ত লাগছে, একঘেয়ে লাগছে। একটু বিশ্রাম করতে পারলে হত। ময়দানের দিকে এগোয় গোপাল।

কিন্তু ময়দানের কাছাকাছি এসে থেমে পড়ে। ময়দানের আবছা আলোর আঙ্গিনা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অগুন্তি নিঃশব্দ মানুষের ভীড়। ছোট ছোট দ্বীপে যেন ভরে গেছে মাঠটা। রিপুর লাগাম ছেঁড়া জোড়া-

জোড়া স্ত্রী-পুরুষের নিজের হাতে গড়ে তোলা দ্বীপ। উৎপীড়ন না, নিষ্পেষণ না, পরস্পর-স্বীকৃত আদিম আসঙ্গ লিপ্সা। শেষ জীবন-সম্ভোগ।

নিঃশব্দে ফিরে আসে গোপাল। উদ্দেশ্যহীনভাবে ভীড়ের ভেতর মিশে যায়। ছেলেবেলায় ভাঙ্গা মেলায় যেভাবে নিজেকে ছেড়ে দিত।

এখনও মাঝে মাঝে রেডিও সংবাদ দিচ্ছে। সেই একই সংবাদের পুনরাবৃত্তি—গোলটেবিল বৈঠকে সমাধানের সূত্র খোঁজা হচ্ছে। সেই একই আশ্বাস—শেষ পর্যন্ত একটা সমাধান খুঁজে পাবেন বলে রাষ্ট্র-নেতারা স্থির নিশ্চিত। সেই একই অনুরোধ—মনোবল হারাবেন না।

মাঝে একবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন মনোবল দৃঢ় রাখবার জন্য। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য।

যে কোন প্রধানমন্ত্রীর এ অনুরোধ মানেই বিকল্প আদেশ। কিন্তু আদেশের সঙ্গে জড়িত থাকে তাঁর, প্রয়োজন বোধে, শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা। জনসাধারণ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা। এ ক্ষমতা জনসাধারণেরই উপহার, আবার আতঙ্ক। কিন্তু অনেক বড় আতঙ্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোটখাট আতঙ্কের কথা ভুলে গেছে বলেই বোধ হয় এ অনুরোধে কর্ণপাত করছে না কেউ। একই বিশৃঙ্খলতার স্রোতে নির্ভয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে জনতা।

মদের দোকানে, শুঁড়িখানায় আজ নতুন মুখের ভীড়। ভেতরের ভীড় উপচে বাইরে এসে পড়েছে। ফুটপাথে বসেও মদ খাচ্ছে অনেকে। সে ভীড়ে সমাজসেবী, দেশকর্মী, অধ্যাপক, শিক্ষক, এমন কি গৈরিক পোশাকধারীও আছেন। কিন্তু আজ তারা অসঙ্কোচ, বেপরোয়া।

হঠাৎ একজন পরিচিত ডাকসাইটে নেশারুর মুখোমুখি পড়ে গেল গোপাল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটো বসে গিয়েছে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল দৃষ্টি চোখে। কিন্তু আজ আর টলছেন না ভদ্রলোক।

সামনা-সামনি পড়ে যাওয়ায় গোপাল জিজ্ঞেস করল, আজ নতুনদের ভীড়ে ভেতরে জায়গা পান নি বুঝি ?

ভদ্রলোকের চোখে মুহূর্তের জন্য একটা গাঢ় অনুতাপের ছায়া পড়ল। গম্ভীরভাবে বললেন ভদ্রলোক, কাল থেকে ছেড়ে দিয়েছি। বলতে বলতেই হঠাৎ আবেগে গলা কেঁপে উঠল ভদ্রলোকের, জীবনটা শুধু নেশা করেই মাটি করলাম। কোন কর্তব্যই করলাম না। স্ত্রী পুত্র পরিবারের দিকে পর্যন্ত ফিরে তাকালাম না কোনদিন। ফি শনিবার আজকাল বাড়িও যেতাম না।

গোপাল গভীর দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভদ্রলোক নিজেকে সামলে নিয়ে গোপালের দিকে উৎসুক দৃষ্টি তুলে ধরেন। আচ্ছা, আপনারা তো সাংবাদিক। বর্দ্ধমানের দিকে কোন গাড়ি-টাড়ি যাবার সম্ভাবনা আছে কিনা বলতে পারেন ?

গোপাল আস্তে মাথা নাড়ে। কোন সম্ভাবনা নেই।

এখন হাঁটতে শুরু করলে কাল সকালের ভেতর পৌঁছান যাবে না ?

গোপাল চুপ করে থাকে।

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি আবার পাল্টে যায়। সেই শূন্যতা ফিরে আসে আবার। সেই উদ্‌ভ্রান্তি। নিজের মনেই বিড় বিড় করতে করতে এগিয়ে যান ভদ্রলোক, থাক, না থাক, চেষ্টা তো করি। একবার চেষ্টা করে দেখি।

ভীড়ের ভেতর না মিশে যাওয়া পর্যন্ত ভদ্রলোকের দিকে সহানুভূতির সঙ্গে তাকিয়ে থাকে গোপাল। উদ্দাম এক স্রোতের মুখে একটি ভিন্নমুখী স্রোত পথ করে করে এগিয়ে যাচ্ছে যেন।

ভদ্রলোক ভীড়ে হারিয়ে গেলে আবার সামনে পা বাড়ায় গোপাল। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ায়। শ্রদ্ধার শিকড়টা অনেক গভীরে ছিল বলেই বোধ হয় প্রচণ্ড আঘাত পায়।

ভীষ্মদা পূর্ণ মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছেন।

নিজের মনে কি যেন বকে যাচ্ছেন বিড় বিড় করে। সঙ্গে কেউ নেই। তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে যায় গোপাল।

ভীষ্মদা !

ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভীষ্মদা। কোন রকমে চোখ তুলে তাকালেন। সঙ্কোচ নয়, অনুতাপ নয়, একটা তীব্র প্রতিহিংসা যেন জ্বলছে অপ্রকৃতিস্থ চোখ দু'টোয়। চাপা জিঘাংসা।

শাণিত এক চিড় হাসি ফুটে উঠল ভীষ্মদার ঠোঁটে। A world of nothing at the world's last adge ! কার কবিতা ? বলতে পারলে না ? তোমরা কিচ্ছু পড় না।

গোপাল ভীষ্মদার হাত দু'টো চেপে ধরে। কিন্তু কিছু বলার আগেই ভীষ্মদা ব্যঙ্গের সুরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন, অবাক হচ্ছ, না ? ভাবছ তোমাদের ভীষ্মদা, সেই ভীষ্মদা—কিন্তু আমি তো অবাক হচ্ছি না। আজ বেশ পরিষ্কার বুঝছি, মানুষ মানুষই। সেই ম্যাসফিল্ডের কবিতাটা এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি, জান। We are neither saints nor philip Sidneys, but mortal men with mortal kidneys. কিন্তু বুঝতে অনেক দেরী হয়ে গেল। মিথ্যে সুনামের মোহের হাড়িকাঠে গোটা যৌবনটা বোকার মত বলি দিয়ে এসে বড্ড দেরীতে বুঝলাম।

গোপাল ভীষ্মদার দিকে অতল দৃষ্টি মেলে ধরে বলল, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনি বরং---

ভীষ্মদা ওর কথায় কান না দিয়ে নিজের মনেই বকে চললেন, শুনে আঘাত পাচ্ছ, না ? তা পাও ! দু'দিনের জন্য তো ? তার পর আঘাত যে দিল, যে পেল, কেউ নেই, স-ব ফক্কা !

গোপাল ভীষ্মদার হাত ধরে টানল এবার। না না, আঘাত পাব কেন ? আপনি আমার গাড়িতে চলুন।

ভীষ্মদা শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। আমাকে দেখে তোমার মায়া হচ্ছে, না ? বেশ, যাব। কিন্তু তার আগে আর একটু খেয়ে যেতে হবে যে।

চল না, এই স্মরণীয় রাতটা একটু সেলিব্রেট করা যাক।

এবার সামান্য শক্ত হয় গোপাল। ধমকের সুরে বলে, তাহলে আপনি থাকুন, আমি চলি।

ওর হাত চেপে ধরেন ভীষ্মদা। অনুরোধে ভেঙ্গে পড়েন প্রায়। অবাধ্য হচ্ছ কেন? চিরদিন তোমরা আমাকে মেনেছ। দেবতা দেবতা বলে হাততালি দিয়ে জীবনের সব ক্ষুধা-তৃষ্ণা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছ। আর আজ, একটা দিন, আমার একটা কথা রাখতে পারছ না?

গোপাল অনুরোধের স্বরে বলে, কিন্তু এর পর আপনি আর সামলাতে পারবেন না। বাড়ি পৌঁছাতে পারবেন না।

ভীষ্মদা জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, আমি জানি, তুমি আমাকে ঘৃণা করছ! কিন্তু আর মদ খাব না তো। মদের পয়সা আমি আলাদা করেই এনেছিলাম। এখন একটু খাব। একটা বড় হোটেলে খাব। কোনদিন হোটেল-রেষ্টুরেন্টের দিকে ফিরেও তাকাইনি, আজ একটু খেয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। খুব দামী আর টেস্টফুল একটা কিছু। তুমি তো ওসব জান-টান; একটু সঙ্গে যেতে পারবে না?

ভীষ্মদার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে করুণায় ওর মনটা ভিজে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শক্ত করে ভীষ্মদার হাত ধরল ও। বলল, বেশ, চলুন। কিন্তু তার পর আমার সঙ্গে যাবেন কথা দিন।

ভীষ্মদা ওর চোখের দিকে তাকালেন। সেই স্নেহের দৃষ্টির একটা আবছা আভাস দেখা গেল চোখে। স্তিমিত স্বরে টেনে টেনে বললেন, বেশ, যাব। কিন্তু বাড়িতে না। অন্য কোথায়ও। বাড়ি গেলেই ঐ বইগুলোর ভস্ম আবার হো হো করে হেসে উঠবে বোধ হয়। আমার ভয় করে।

সামান্য অবাক হয় গোপাল। বইগুলোর ভস্ম মানে?

কেমন ভয়ার্ত, করুণ হয়ে ওঠে ভীষ্মদার চোখ দু'টো। ফিসফিস করে বললেন, আমি পুড়িয়ে ফেলে এসেছি। তিল তিল করে বুকের রক্ত

দিয়ে সংগ্রহ করা আজীবনের রাশিকৃত বইগুলো আমি পুড়িয়ে এসেছি। ওগুলোর ভেতর একা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় মনে হল ওরা আমাকে দেখে হাসছে। ওরা সত্যিই হাসছিল গোপাল। আস্তে আস্তে একসময় ওরা বিদ্রূপের অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আমি অসহ্য যন্ত্রণায় দু'হাতে কান ঢেকে উঠে দাঁড়ালাম। তার পর আলমারিটায় আগুন লাগিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

অনেকক্ষণ পর গোপাল আবার একটা তীব্র আবেগের স্পন্দন অনুভব করে। ভীষ্মদার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহানুভূতিতে ওর শিথিল স্নায়ুগুলো আবার সজাগ হয়ে ওঠে। নিঃশব্দে ভীষ্মদার হাত ধরে এগোতে শুরু করে ও। ভীড় ঠেলে ঠেলে সামান্য এগিয়েই একটা বড় হোটেল পেল। শহরের শ্রেষ্ঠ নিলাভাথ। ভীষ্মদার হাত ধরে সতর্ক পায়ে ভেতরে ঢুকল গোপাল। তারপর দোতালায় উঠে গেল।

ভেতরে ভীষণ ভীড়। চেয়ার সব ভর্তি। হাতে ডিস নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও গোগ্রাসে গিলছে অনেকে। অনেকেরই চেহারা ও আচরণ দেখে বোঝা যায় এখানে আসার অবস্থা নয় তাদের। আজই প্রথম এসেছে। ভীষ্মদার হাতটা শক্ত করে ধরে গোপাল।

কিন্তু পা বাড়ানর আগেই নিচে প্রচণ্ড একটা হৈ চৈ-এর শব্দ শোনা গেল। একটা উদ্দাম হুঙ্কার ঝড়ের বেগে ওপরে উঠে আসছে যেন। ঘটনাটা ভাল করে বুঝে উঠবার আগেই সেই উত্তাল জনসমুদ্র দোতালায় এসে আছড়ে পড়ল। আজীবন বঞ্চিত, শোষিত অজস্র মানুষের ভীড় এসে ঝাপিয়ে পড়ল ভেতরে। মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল এক দক্ষযজ্ঞ। হাতের কাছে যে যা পারছে লুটে পুটে খাচ্ছে। চেয়ার টেবিল উল্টে ফেলছে। ভেঙ্গে তছনছ করছে। নিজেদের ভেতর কাড়াকাড়ি হানাহানি শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ সে উদ্দাম ভীড়ের ভেতর সেই অন্ধ ভিখারীটাকে চোখে পড়ল গোপালের। দীর্ঘ তিরিশ বছর হোটেলের নিচে ভিক্ষে করতে করতে পায়ের শব্দে ক্রেতাদের চিনত যে। সেই এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল ভীড়ের

ভেতর ও হাতড়ে হাতড়ে চীৎকার করে ফিরছিল, আমাকে একটা মুরগির রোষ্ট দেবে? কেউ আমার হাতে একটা মুরগির রোষ্ট দেবে? আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা, একটা মুরগির রোষ্ট!

কিন্তু কেউ ওর কথায় কান দিচ্ছে না। এই হল্লায় সে কথা কানে তুলছে না কেউ। মাঝে মাঝে লোকের ধাক্কায় টলে টলে পড়ছে ও। আবার কাউকে ধরে সামলে নিচ্ছে। গোপাল আতঙ্কে সহানুভূতিতে ভীড়ের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জনস্রোতে ততক্ষণে তলিয়ে গেছে অন্ধটি।

হঠাৎ নিচে গুলির শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তে ক্ষিপ্ত জনতার ভেতর একটা আতঙ্কের স্রোত বয়ে গেল। পালাতে শুরু করল সবাই। মুহূর্ত পূর্বে যে উদ্দাম জনস্রোত ভেতরে ছুটে এসেছিল, ক্ষিপ্রতর বেগে তারা এবার মরিয়া হয়ে বাইরের দিকে ছুটে আসতে লাগল। নিজেকে সামলে নেবার আগেই প্রচণ্ড ধাক্কায় একটা থামের ওপর ছিটকে পড়ল গোপাল। মানুষের পায়ের চাপে পিষে যাবার ভয়ে ও গড়িয়ে থামের কোণে সরে গেল।

মুহূর্তের ভেতর বিধ্বস্ত দোতলাটা জনশূন্য হয়ে গেল। একটা স্তব্ধ শ্মশানের মত শূন্য খাঁ খাঁ করতে লাগল হোটেলটা।

সিঁড়িতে বুটের শব্দ। মিলিটারী আসছে বোধ হয়। হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করে গোপাল। কষ্ট বোধ করে। কপালে যন্ত্রণা বোধ করছে। কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিল। হাতে রক্ত। কপালটা কেটে গেছে।

ও উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করতে করতেই কয়েকজন সশস্ত্র মিলিটারী এসে ছড়িয়ে পড়ে দোতলায়। গোপালকে দেখে একজন এগিয়ে আসে ওর দিকে। কলার ধরে টেনে তোলে ওকে।

গোপাল রুমাল দিয়ে কপালটা চেপে ধরে স্তিমিত স্বরে বলে, প্রেস।

অফিসারটি ঠিক যেন বুঝতে পারেন না। পকেট থেকে আস্তে পরিচয়-পত্রটা বের করে দেখায় গোপাল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ছেড়ে

দেন ওকে। সামনের দিকে এগিয়ে যান।

এখানে আর কিছু করণীয় নেই বলেই বোধ হয় একটু ঘুরে ফিরে নেমে যায় মিলিটারী। গোপাল একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। ভীষ্মদা নেই। আস্তে হলঘরটার দিকে এগিয়ে যায়। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ঘরটা। ঘরময় ভাঙ্গা টেবিল চেয়ার কাপ ডিস ছড়িয়ে আছে। জানলা দরজার কাঁচগুলো চূর্ণবিচূর্ণ।

হঠাৎ কোণের দিকে সেই ভগ্নস্তূপের ভেতর কেউ পড়ে আছে বলে মনে হল। - ছ'টো পা বেরিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেল গোপাল। কিন্তু সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেঝের ওপর পড়ে আছে সেই অন্ধ ভিখারী। মুখের কশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মাথাটা থেঁতলে গেছে। দৃষ্টিহীন চোখের ফ্যাকাসে মণিছুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

সামনে প্রসারিত হাতের মুঠে একটা থেঁতলে যাওয়া কাটলেট!

অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়য়ে থাকে গোপাল। চোখ ছ'টো জলে ভরে আসে। চোখের জলকে বাধা দেয় না গোপাল। এখনও চোখের জল ফুরিয়ে যায় নি এ যেন ওর সান্ত্বনা।

নিচে নেমে দেখল হোটেলের সামনেটা প্রায় ফাঁকা। মিলিটারী ঘিরে রেখেছে সামনেটা। কিন্তু চার পাশের জনস্রোত একই গতিতে প্রবাহিত। যেন সামনে কোন পাথরে বাধা পেয়ে স্রোতের ধারা কিছুটা ঘুরে গেছে মাত্র।

কিন্তু কাল হয়তো এই জীবন স্রোত স্তব্ধ হয়ে যাবে। বিদ্ধস্ত প্রকৃতির ধ্বংসস্তূপের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকবে জীবনের বিকৃত, গলিত ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু সেই বিরাট ধ্বংস নিয়ে কোন শোকগাথা রচিত হবে না, মহাকাব্য রচিত হবে না, কোন শিল্পীর তুলিতে রেখাঙ্কিত হয়ে থাকবে না তা ভবিষ্যতের মানুষদের জন্য। কারণ সে কাজের জন্য অবশিষ্ট থাকবে না একটিও মানুষ। সেই আদি অন্ধকার

অজ্ঞাত অতীত থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রবাহিত জীবন ধারার ঘটবে পূর্ণাবলুপ্তি। আবার সেই সৃষ্টির আদিতে ফিরে যাবে মানবহীন পৃথিবী। তাব পর জীবনের স্পন্দনহীন অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের মতই জ্যোতির্মণ্ডলে অনন্তকাল ঘুবপাক খেতে থাকবে নির্বিকারভাবে। আকাশ ভরা সূর্য তারাই শুধু থাকবে তখন, কিন্তু বিশ্ব ভরা প্রাণ নিঃশেষে মুছে যাবে সৃষ্টি থেকে।

জীপের কাছাকাছি এসে একটা উদাত্ত গানের রেশ শুনতে পায় যেন। সামান্য অবাক হয়। প্রজ্জ্বলিত রোমে এই নিরোটি কে?

কিছু দূরে একটা থেমে থাকা ভীড় দেখে কৌতূহলে এগিয়ে যায় গোপাল। ভীড়েব কেন্দ্রে একটা জীপ। জীপের ভেতর দাঁড়িয়ে পার্থরা। দৃঢ় ঋজুভঙ্গীতে পার্থদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকজন যুবক। যাদের এর আগেই পার্থর সঙ্গে দেখেছিল। একটি নিগ্রো তরুণ গায়ক আফ্রিকান ব্যাঞ্জো বাজিয়ে উদাত্ত স্বরে একটি লোকসঙ্গীত গাচ্ছে। কান পেতে গানটির কয়েকটি পদ ধরতে পারল ও। এব আগেও কোথায় যেন শুনেছে না হয় পড়েছে গানটা।

উই শ্যাল কাম ওভার, উই শ্যাল কাম ওভাব, উই শ্যাল কাম ওভার সাম ডে; ফ্রম ডিপ্ অফ্ মাই হার্ট আই ডু বিলিভ উই শ্যাল কাম ওভার সাম্ ডে।

আবেগ, আত্মপ্রত্যয় আর দরদে মর্মস্পর্শী কণ্ঠ। পূর্ণ বশীভূত না হলেও, উদ্দাম জনতার একটা অংশ সাময়িকভাবে থেমে পড়েছে। অবাক দৃষ্টিতে দেখছে ওদের।

এই জীবন-দরদী যোদ্ধা গায়কটিকে কি দেখেছে কোথায়ও? গোপাল স্মৃতি হাতড়ায। কোন ছবিতে? পেট্রিস লুমুম্বা, মার্টিন লুথার, জোমো কেনিয়াট্টার ছবির সঙ্গে? না কি ওয়াশিংটনের সেই ঐতিহাসিক নিগ্রো জনতার দি গ্রেট মার্চের ছবিতে? জীবন-দরদী শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান লোকসঙ্গীত শিল্পী পিট সিগারের পাশে কোন সঙ্গীতমুখর মুহূর্তে?

গান থামতেই সেই একই আবেদন নিয়ে চীৎকার করে ওঠে আবার পার্থ। এভাবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ নয়। সমবেত শেষ চেষ্টার জন্য আজ সাধারণ মানুষেরই সক্রিয় হতে হবে। সমস্ত রাজনীতি, জাতি, রাষ্ট্রের উর্ধে উঠে, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের পক্ষ থেকে, পাইলটদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগের জন্য গোলটেবিল বৈঠকের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। দলে দলে বৈঠকের সামনে গিয়ে হাজির হবার জন্য উত্তেজিত আন্তরিক আবেদন জানাল পার্থরা।

জনতা সংশয়ের দোলায় দুলছে। ঠিক যেন উপলব্ধি করতে পারছে না বক্তব্যটা। নিজেদের এই শক্তিব কথা বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

জীপটা আবার চলতে শুরু করল। অপরাজেয় জীবনের উদাত্ত সুরের রেশ ছড়াতে ছড়াতে দূরে মিলিয়ে গেল পার্থরা।

ওরা পারবে না। যত ভালবাসা, যত দরদই থাক, নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে আত্মঘাতী বেপরোয়া হয়ে ওঠা মানুষকে এতটুকু সময়ের ভেতর আর ফেরাতে পারবে না ওরা। না পারুক, তবু অন্তিম মুহূর্তে অন্তত নিজেদের কাছে সঙ্কুচিত থাকতে হবে না ওদের। অসহায় আত্মসমর্পণের গ্লানি নিয়ে মরতে হবে না। মানুষের শেষ হিসেব-নিকেস তো নিজের কাছেই।

বেশ কিছুক্ষণ গানের রেশটা মনে ছড়িয়ে থাকে গোপালের। সেই রেশ এক সময় ওকে সৌমেনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আসন্ন মৃত্যু প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টি ধারা। তবু কোথায় যেন এই নিগ্রো সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে শিল্পী সৌমেনের একটা মিল খুঁজে পায়। কিন্তু ঠিক ধরতে পারে না কোথায় মিল। চিন্তাটা অস্বস্তি ঘটায়। শেষ পর্যন্ত মনে হয়, বোধ হয় আস্থার মিল। নিজের আত্মোপলব্ধ আস্থাই বোধ হয় এই অস্থির উচ্ছৃঙ্খলতার ভেতর ওদের যার যার দর্শনে স্থির রেখেছে। প্রশান্ত রেখেছে।

সৌমেনের ওখানে একবার যাওয়া প্রয়োজন। ইতুর যদি একটা

হদিশ পাওয়া যায়। জয়াদের বাড়িটাও তো ওদিকেই। যদি হঠাৎ সৌমেনের চেনা হয় বাড়িটা তাহলে জয়াদের ওখানে হয়ত কোন সংবাদ পাওয়া যেতে পারে ইতুর।

বাড়িটাকে বাইরে থেকে প'ড়ো মনে হচ্ছিল। নিচের দোকানপাট সব বন্ধ। ওপরের একটি মাত্র জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে, অন্য ঘরগুলো অন্ধকার। অন্যরা হয় পালিয়েছে, নয়, অন্ধকারে আত্মসমর্পণ করে অসহায় অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণছে।

ইজেলের অর্ধসমাপ্ত একটা ছবির ওপর সন্তর্পণে তুলি বোলাচ্ছে সৌমেন। চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি। রোগ পাণ্ডুর মুখের ওপর ছড়িয়ে গভীর প্রশান্তি। ছবির ওপর তৃপ্ত তুলি বোলাতে বোলাতে, যেন একান্ত পাশের কোন প্রণয়ীর সঙ্গে কথা বলছে, এমন আলতো ভঙ্গীতে গুন গুন করছে ও ঃ অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ। অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও। ওগো একি প্রণয়েরই ধরণ।

গোপাল নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়ায়। অপলক দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার পটভূমি থেকে দূর আলোর আভাসে প্রশান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে এক যাত্রী। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ফরাসী ইম্প্রেসনিজমের অপূর্ব মিশণে প্রাণবন্ত ব্যঞ্জনায় মূর্ত ছবিটি। কেমন যেন একটা শান্ত বিষণ্ণতায় মন ছেয়ে দেয় ছবিটা।

কি দেখছিস ?

গোপাল ছবিতে চোখ রেখেই বলে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করার অবিশ্বাস্য শক্তিকে।

একটু হাসল সৌমেন। উপেক্ষা ভাবছিস কেন, আবাহনও তো ভাবতে পারিস ?

গোপাল ফিরে তাকায় সৌমেনের দিকে। গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ওর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে, ধর, শেষ পর্যন্ত যদি সেরকম কিছু না ঘটে, ছবিটা শেষ করতে পারবি ?

সৌমেন সামান্য গম্ভীর হয়। দৃষ্টি আরো গভীর হয়ে আসে।

আস্তে বলে, কেন নয়? মৃত্যুকে তো আমি আমার রোগমুক্তির উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করি নি, ধ্রুব আশ্রয় হিসেবেই চিনতে পেরেছি। তর্ক করে হয়তো সব বোঝাতে পারব না, কিন্তু যুক্তির ওপরেও কিছু অনুভূতি থাকে মানুষের।

অন্য দিন হলে হয়তো অস্বীকার করত গোপাল। তর্ক করত। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ অলক্ষ্যে কি করে মানুষের দর্শনকে প্রভাবিত করে সে তত্ত্বের আলোচনায় নামত। কিন্তু সৌমেনের দিকে তাকিয়ে আজ কথাটা অস্বীকার করতে মন চাইল না ওর। তর্কের মানসিক সুক্ষ্মতাও অবশ্য পূর্ণ-বিধ্বস্ত।

আস্তে জিজ্ঞেস করে গোপাল, লোটন কোথায়?

চোখের ইশারায় কোণের দিকে দেখিয়ে দিল সৌমেন। এতক্ষণ ইজেলের ছায়ায় আবছা অন্ধকার কোণে যে বস্তুটিকে কাপড় চোপড়ের বস্তা মনে হচ্ছিল, ভাল করে লক্ষ্য করল গোপাল, সে লোটন। একটা ভীত আহত জন্তুর মত কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে ওখানে। মৃত্যু ওকে কোন আশ্রয়ের আশ্বাস দিতে পারে নি, কিন্তু স্নেহের বন্ধন কেটে পালিয়েও যেতে পারেনি সৌমেনকে ফেলে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে গোপালের। একই মৃত্যু-আতঙ্ক মানুষের ওপর কত বিচিত্র রঙের তুলির রেখা টেনে যাচ্ছে। সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন-অন্তরালে!

ইতু আর এসেছিল?

নাঃ। কেন, ও বাড়ি নেই?

আস্তে মাথা নাড়ে গোপাল। জয়াদের বাড়িরও কোন হদিস পেল না ওর কাছে। ইতুর জন্য উদ্বেগটা আবার নতুন করে অনুভব করে। উদ্বেগটা আস্তে আস্তে আতঙ্কে এসে পৌঁছায়।

সৌমেনের হাতের ওপর হাত রাখে গোপাল। আস্তে বলে, তাহলে আসি। এই বিপর্যয়ের ভেতরও অন্তত একজনকে দেখে গেলাম যে ভাল আছে।

নিঃশব্দে ফিরে আসে গোপাল। আবার সেই পথ। সেই আতঙ্ক। সেই উত্তেজনা। সেই উচ্ছৃঙ্খলতা।

পথে নামলেই চিন্তাগুলো যেন আরো বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। গুছিয়ে ভাবতে পারছে না। কোন প্রসঙ্গেই চিন্তা স্থির রাখতে পারছে না। রাজ্যের প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, আত্মজিজ্ঞাসা।

ঘটনাকে এখনও পুরো বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, এ হতে পাবে না। এ ঘটতে পাবে না। অসম্ভব। কিন্তু কেন অসম্ভব তারও কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। এও যেন সৌমেনের সেই যুক্তির ওপরের কিছু অনুভূতি। অথচ মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতায় মানুষ আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যে কোন মানুষের সাময়িক উন্মত্ততা অথবা ভুলের ফলেও যে কোন ছোটখাট ধ্বংস তো যে কোন মুহূর্তেই ঘটতে পারত। মনে পড়ে গোপালের, কয়েক বছর আগেই একবার র‍্যাডারে পাখির ছায়াকে সোভিয়েত রকেট মনে করে মার্কিন বিমানঘাটি থেকে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে সোভিয়েতের দিকে প্লেনের অভিযান শুরু হয়েছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে ভুল ধরা পড়ায় প্লেনগুলোকে ফিরিয়ে আনা হয়। যদি ভুল ধরা না পড়ত তাহলে বহুক্ষেত্রেই সেই ভুলের ফসল হতে হত সাধারণ মানুষের। কাজেই এ ধরনের ধ্বংসের সম্ভাবনা তো প্রতি মুহূর্তেই ছিল।

বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু এই ঘটনার আবর্তে বিধ্বস্তও হতে হচ্ছে। কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে আসছে ক্রমে। বশীভূত হচ্ছে। মাঝে মাঝে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করছে।

অন্যমনস্কভাবে যেতে যেতে হঠাৎ একসময় সামনের দিকে চোখ পড়ায় পুরো শক্তি দিয়ে ব্রেক কষে ও। জীপটা ঝাঁকি দিয়ে থেমে পড়ে। ঐ ভীড়ের ভেতরই চীৎকার করে ওঠে গোপাল, ইতু!

কিন্তু দূরের গাড়িটা ততক্ষণে এগিয়ে আর একটা গলির ভেতর ঢুকে গেছে। সে গাড়ির ষ্টিয়ারিং-এ বসে জয়ার দাদা। লাস্যময়ী ভঙ্গীতে ওকে জড়িয়ে ধরে বসে ইতু। এলোমেলো চুলগুলো হাওয়ায়

উড়ছিল। অবান্তর বুকের আঁচলটা জানলা দিয়ে ঝুলছিল।

জীপ থেকে লাফিয়ে নামে গোপাল। ভীড় ঠেলে ঠেলে উত্তেজনায় গলিটার দিকে দৌড়াতে থাকে। কিন্তু বৃথা। গাড়িটা নেই। ইতুরা এতক্ষণে আরো অনেক দূর চলে গিয়েছে বোধ হয়।

মাথা নিচু করে জীপে ফিরে আসে গোপাল। উত্তেজনায় বুকটা এখনও ওঠা-নামা করছে। অনেকক্ষণ পর চেতনায় এত তীব্র নাড়া লাগল যেন। আবেগে গলাটা বন্ধ হয়ে আসছে। আতঙ্কে মেয়েটা এত দূর চলে যাবে ভাবতে পাবে নি ও। ইতুটা বোকা। ইতুটা বড় অসহায়।

তবু জীপটা নিয়ে আশেপাশে কিছুটা ঘুরে বেড়ায়। যদি খুঁজে পায়, নিজের কাছে টেনে আনবে ইতুকে। বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে বোঝাবে, ভুল পথে জীবনকে খুঁজছিস তুই। তোকে এ পথে আমি জীবনকে চিনতে বলিনি।

একটা রাস্তার বাঁক ঘুরতেই আবার ব্রেক কষতে হল গোপালের। বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল বলেই হৈ-চৈটা টের পায় নি। অথবা হল্লাটাই এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে বলে সচেতন হয়নি।

প্রতিহিংসায় হিংস্র ক্রুদ্ধ এক জনতা সামনের একটা বাড়ি আক্রমণ করেছে। ভেঙ্গে তছনছ করছে বাড়িটা। লোহার সদর দরজাটা ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে ভীত জন্তুর মত সাহায্যের জন্য, মার্জনার জন্য চীৎকার করছেন এক ভদ্রলোক।

সেই হিংস্র আক্রমণের মুখে হঠাৎ সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল লোহার গেটটা। উদ্দাম তরঙ্গের মত ভেতরে ঢুকে গেল জনতা। তার পর, একটু বাদেই, সেই উত্তাল স্রোতের মুখে ভাসতে ভাসতে ভীত জন্তুর মত বাইরে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক। তখনও আর্ত চীৎকার করছেন তিনি, আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে বাঁচান। আমি তো কোনদিন কোন ক্ষতি করিনি আপনাদের।

ঐ ভীড়ের ভেতরই পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করছিল আর একটি লোক। শীর্ণ, রুগ্ন চেহারা। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

আমি সাক্ষী। আমি দীর্ঘ তিরিশ বছর ঐ খুনীটার চাকরি করেছি। ওষুধে ভেজাল দিয়ে লাখ লাখ মানুষ খুন করেছে ও। এতদিন ভয়ে বলতে পারি নি। আমি সাক্ষী।

মুহূর্তের মধ্যে উন্মত্ত, হিংস্র প্রতিহিংসার আবর্তে তলিয়ে গেলেন সেই আতঙ্কিত মালিক। একটা উদ্দাম সাইক্লোন বয়ে গেল যেন বাড়িটার ওপর দিয়ে। তার পর, সে ঝড় থামলে, বিজয়োল্লাসে জনতরঙ্গ অন্য খাদে বয়ে গেলে, সেই জনহীন শ্মশানে মাত্র একটি মানুষকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মাটির সঙ্গে থেঁতলান।

লোকটির জন্য কোন সহানুভূতি বোধ করে না গোপাল। কিন্তু ভীত হয়। যে আড়াল-শক্তিতে এই সামাজিক কীটগুলো শক্তিশালী ছিল, সে পটভূমি আজ বাতিল হয়ে গেছে। তাই জবাবদিহির জন্য সরাসরি আজ এতদিনের নিগৃহীত মানুষের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে এদের। কিন্তু এতদিনের নিপীড়িত, প্রবঞ্চিত নিরুপায় মানুষের অবরুদ্ধ ক্ষোভ যেভাবে জীঘাংসায় আত্মপ্রকাশ করছে, তার ব্যাপকতা সমাজকে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আসন্ন অন্তিম যদি অনিবার্য হয় তাহলে কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু না হলে এর সুদূর প্রসারী ফল সমাজকে বিষাক্ত করে তুলবে। অবশ্য শুধু এ ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রচলিত ধ্যানধারণা মূল্যবোধগুলো যেভাবে তছনছ হয়ে যাচ্ছে তাতে সমাজের স্বস্থানে ফিরে আসা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

হঠাৎ এক সময় এই লোকটার স্মৃতি ওকে করঞ্জিয়ার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। স্বার্থের দিক দিয়ে করঞ্জিয়ারাও সাধারণ মানুষের স্বজন-নয়। ওদেরও তো জনতা জবাবদিহির জন্য টেনে বের করতে পারে। ঠিক এই মুহূর্তে করঞ্জিয়ার কথা ভাবছে না ও, কিন্তু সেই প্রতিহিংসার

আগুন থেকে কি মিলিও আত্মরক্ষা করতে পারবে? কিন্তু ওর তো কোন অপরাধ নেই।

মিলির জন্য কেমন যেন একটা আতঙ্ক বোধ করে। এতক্ষণে, এই প্রথম, মনে হয়, মিলির ওপর অবিচার করেছে ও।

মিলির ভালবাসা, মিলির আতঙ্কের চেয়েও নিজের অভিমানকে বড় করে তুলে মিলিকে কত বড় বিধ্বংসী বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে তা এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পারে।

মুহূর্তে সিদ্ধান্তে আসে গোপাল, মিলির পাশে গিয়ে দাঁড়ান প্রয়োজন। আহত ভীত মেয়েটাকে অভয় দেওয়া প্রয়োজন। না হলে হয়তো কৃষ্ণার মত হারিয়ে যাবে মিলি! ইতুর মত আত্মঘাতী পথে নেমে যাবে।

জীপেব মুখ ঘুবায় গোপাল। আজ নির্ভয় ও। সম্পর্কেব প্রতি-বন্ধকতা, জটিলতা মুক্ত মানুষ আজ জীবনেব প্রতিক্ষেত্রে নিজের পরিচয় নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। যে কোন দাবীই হোক, নিজেব দাবীটুকু নিয়ে মানুষ আজ একক সত্তায় ঋজু। স্পষ্ট। অনমনীয়। কবঞ্জিয়াকে আজ আব ভয় নয়, অনুকম্পা কবে ও।

করঞ্জিয়া তখন পাগলেব মত পাযচারী কবছিলেন ঘরের ভেতর। অবরুদ্ধ আহত জন্তুব মত ভীত, আতঙ্কিত। অক্ষম ক্ষোভে, ক্রোধে ফুঁসছেন। কিন্তু হাল ছাড়েন নি তিনি। জীবনেব সমস্ত সঞ্চয়ের বিনিময়েও বাঁচার শেষ চেষ্টার জন্য অস্থিব ভাবে মাথা কুটছেন। এই জতুগৃহ থেকে মুক্তির একটা ক্ষুদ্র রন্ধ্রের আভাসও পেয়েছেন। সঠিক সংবাদটুকুর জন্য অস্থির উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করছেন। ঘন ঘন ফোনের দিকে তাকাচ্ছেন।

শ্রান্ত পা টেনে টেনে ঘবে ঢুকল দত্ত। স্মৃতি-ভ্রষ্টেব মত শূন্য দৃষ্টি তুলে করঞ্জিযাব দিকে তাকাল। বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করল, আমাকে

ডেকেছিলেন ?

কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন করঞ্জিয়া। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ আগেই ডেকেছিলাম। কোথায় গিয়েছিলে ?

আস্তে জবাব দিল দত্ত, বাড়ি গিয়েছিলাম।

আচমকা বাঘের মত গর্জে উঠলেন করঞ্জিয়া, বাট আই অর্ডার্ড ইউ নট্ টু লিভ দিস হাউজ !

দত্ত ওঁর চোখে চোখ রেখেই আস্তে বলল, কিন্তু আদেশ অন্যায় হলে—

হোয়াট্! উত্তেজনায় চীৎকার করে ওঠেন করঞ্জিয়া। স্পর্দ্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেছে দেখছি। এখনও পেটে লাথি মারলে আমার ভাত বেরিয়ে আসবে। এ্যাণ্ড ইউ, আনগ্রেটফুল ক্রিচার্স—

সাট্ আপ স্কাউণ্ড্রেল ! অপ্রত্যাশিত ভাবে আচমকা চীৎকার করে ওঠে দত্ত। মুহূর্তের ভেতর পাল্টে গেছে ওর চেহারা। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

ক্রিচার আমরা নই, ক্রিচার আপনারা। যারা অর্থের দম্ভে দু'মুঠো ভাতের বিনিময়ে মানুষের বিবেককে, স্বাধীনতাকে আজীবন পায়ের তলে পিষে রাখতে চান। শক্তির দম্ভে গরীবদের পশু বলে গণ্য করেন। কিন্তু শেষ বিচারের দিনটা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে তা বোধ হয় ভাবতে পারেন নি আপনারা।

আচমকা বলেই হঠাৎ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন করঞ্জিয়া। কিন্তু এবার রাগে অপমানে কাঁপতে শুরু করেন তিনি। উত্তেজনায় কথা হাতড়ে পাচ্ছেন না যেন।

দত্ত যাবার জন্য ফিরে দাঁড়াতেই হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন করঞ্জিয়া, থামো !

ঘুরে দাঁড়ায় দত্ত। জীবনে এই প্রথম মাথা তুলে জড়তাহীন স্পষ্ট স্বরে জানায় ও, আপনার আদেশের জন্য নয়, শুধু জানিয়ে যাবার জন্য থামলাম, আমি চলে যাচ্ছি। জীবনের বাকী মুহূর্তগুলো অন্তত আমি

স্বাধীনভাবে থাকতে চাই। কিন্তু যাবার আগে শুধু একটা কথা জানিয়ে যেতে চাই। আই ফিল্ পিটি ফর ইউ!

বলেই ঘুরে দাঁড়ায় দত্ত। ঋজু পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। জীবনে এই প্রথম একটা আস্ত স্বাধীন মানুষের দৃপ্ত পরিচয় নিয়ে বেরিয়ে যায় করঞ্জিয়া লজ থেকে।

রাগে, ক্ষোভে, অপমানে থর্থর্ করে কাঁপতে থাকেন করঞ্জিয়া। উন্মত্তের মত মাথার চুলগুলো মুঠ করে চেপে ধরেন। একটা বাতিল মানুষের মত ঘাড় গুজে বসে পড়েন চেয়ারে।

হাতের পাশের ফোনটা বেজে ওঠে। চমকে ওঠেন করঞ্জিয়া। গভীর প্রত্যাশায় ফোনটা দ্রুত তুলে নেন। তার পর ওপাশের কণ্ঠস্বর শুনেই কোন জবাব না দিয়ে নামিয়ে রাখেন ফোনটা। প্রত্যাশিত ফোনটার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

বাইরে মাঝে মাঝে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সন্ত্রস্ত পশুর মত কান খাড়া করছেন করঞ্জিয়া। ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছেন। নিজের বাড়িটা-কেই একটা বদ্ধ খাঁচা বলে মনে হচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে একটা নিষ্ঠুর লোহশলা এসে যেন ওকে ইঁদুরের মত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে পারে। পালানর পথ নেই। বাধা দেবার শক্তি নেই। সমস্ত স্নায়ুগুলো আতঙ্কে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর আবার ফোনটা বেজে ওঠে। হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নেন আবার। ও প্রান্তের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনায় হাত কেঁপে ওঠে! কতগুলো সংযত সাঙ্কেতিক ভাষায় সংবাদ আদান প্রদান করেন করঞ্জিয়া।

ঃ হ্যাঁ, করঞ্জিয়া বলছি। ...সব ঠিক? ...ওখান থেকেই ফ্লাই করছে? কেউ টের পায় নি তো? ...এ্যাট্ ওয়ান্স স্টার্ট করছি... হ্যাঁ, হ্যাঁ দু'টো সিট।

ফোনটা টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেলে উত্তেজিত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যান করঞ্জিয়া। দু'টো তিনটে করে সিঁড়ি টপকে দোতালায় উঠে যান। নিজের ঘরে গিয়ে আলমারিটা খুলে ভেতর থেকে

একটা ছোট এ্যাটাচি-কেস টেনে বের করেন। তার পর মিলিকে ডাকতে ডাকতে মিলির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান।

ঘর খালি। মিলি কি ফেরে নি এখনও? উত্তেজনায় আতঙ্কে প্রতিটি ঘরে, বারান্দায় ছুটাছুটি করতে থাকেন করঞ্জিয়া।

মিলি। মি-লি। মি-লি-ই!

স্মৃতিভ্রষ্টের মত মিলি তখন পথে পথে ঘুরছে।

উত্তেজনার মুখে একাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। পথের অবস্থা ভাবে নি তখন। সম্ভাব্য বিপদের কথা মনে পড়ে নি একবারও। এক-মাত্র সংকল্প ছিল, যেমন করেই হোক গোপালের কাছে পৌঁছাতে হবে। শেষ বিদায়ের আগে ওর কাছে এত দিনের হিসেবটা বুঝিয়ে দিতে হবে। নিজেকেও এই ঋণের যন্ত্রনা থেকে বাঁচাতে হবে। মৃত্যুর আগে সেই হবে ওর শেষ সার্থক বাঁচা।

কিন্তু অমিল হিসেবের বোঝা নিয়ে ফিরে আসতে হল। মিথ্যে, বাতিল অস্তিত্বটা নিয়ে পথে নামতে হল। পথের ভয়ঙ্করতা বিপর্যস্ত স্নায়ুকে সম্পূর্ণ গ্রাস করল এবার। চিন্তাগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে আসছে। পূর্বাপর চিন্তা করতে পারছে না। ঘটনার তরঙ্গগুলো স্নায়ুর ওপর আছড়ে পড়েও ওকে সজাগ করতে পারছে না। বরং একটা ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা শিথিল করে আনছে চেতনাকে। মাঝে মাঝে সভয়ে অনুভব করছে শুধু, ও পথ হারিয়ে ফেলছে। চেনা পথগুলো যেন দূরে সরে সরে যাচ্ছে! বাড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ, এই মুহূর্তে বাড়ি যেতে চায় ও। এই ভয়ঙ্কর বাস্তব থেকে পালিয়ে নিজের পরিচিত গুহায় ফিরতে চায়।

নিঃশেষিত শক্তিকে সংহত করে, বহু পথ ঘুরে, শেষ পর্যন্ত বাড়ির পথ খুঁজে পায় মিলি। আবার ভুলে যাবার আগেই গাড়ির গতি বাড়ায়। এবং শেষ পর্যন্ত অনেক বিপজ্জনক বাধা পেরিয়ে কোন রকমে

বাড়ি পৌঁছায়।

গাড়ি থেকে টলতে টলতে নামে মিলি। পরিচিত বাড়িটাও কেমন যেন আবছা আবছা মনে হচ্ছে। বারান্দা দিয়ে উঠতে উঠতেই সেই শৈশবেব ভয় জড়ানো স্বরে ডাকে ও, বাবা!

নিচের ঘর ফাঁকা। ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে আসে ও।

বাবা! বাবা তুমি কোথায়?

বাবার ঘর শূন্য। আতঙ্কে শিউরে ওঠে মিলি। পাগলের মত চীৎকার করে ডাকে, বা—বা!

শূন্য বাড়িটায় ভৌতিক প্রতিধ্বনি তুলে ঘুরে বেড়ায় চীৎকারটা।

হরি—হ—ব!

কোন সাড়া নেই। আতঙ্কে কেমন বিহ্বল হয়ে আসে মিলির চোখ। ভয়ার্ত অসহায় শিশুর মত চারদিকে চোখ বুলিয়ে আবার ও চীৎকার করে ওঠে, বাবা, আমাকে বাঁচাও!

আর্ত চীৎকারটাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে বাড়িটা। দু'হাতে মুখ ঢেকে টলতে টলতে নিজের ঘরে আসে মিলি। টেবিলটার কোণ ধবে কোন রকমে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া চিঠিটার দিকে নজর পড়ে। বাবার চিঠি! হুমড়ি খেয়ে পড়ে ও চিঠিটার ওপর।

স্নেহের মিলি,

আচমকা পালানর একটা শেষ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম। তুমি বাড়ি ছিলে না। অথচ অপেক্ষা করারও সময় ছিল না। জানি না সেখানেও বাঁচতে পারব কি না, তবু এখানে আতঙ্কে মরে যাচ্ছিলাম আমি। প্রেসারের ট্রাবলসটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল। এ মুহূর্তে তোমাকে আর কি লিখব ভেবে পাচ্ছি না। তবু, যদি পার, অন্তত শহর ছেড়ে চলে যেও।

ইতি—

তোমার বাবা।

অপলক দৃষ্টিতে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকে মিলি। আতঙ্ক না, আবেগ না, উত্তেজনা না—অনুভূতি শূন্য স্থির দৃষ্টিতে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে অদ্ভুত একটা হাসির আভাস দেখা দেয় ওর ঠোঁটে। তার পর একসময় মিলি শব্দ করে হেসে ফেলে। ক্রমশঃ বাড়তে থাকে হাসিটা। শেষ পর্যন্ত এক সময় অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে ও। হাসতে হাসতে বুকের আঁচল খসে পড়ে! অপ্রতিরোধ্য হাসিতে গড়িয়ে পড়ে বিছানার ওপর।

নিচ থেকে হঠাৎ এক সময় গোপালের দ্বিধাহীন ডাক শোনা যায়, মিলি! মিলি ফুলে ফুলে হাসতে থাকে বিছানায়।

দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে আসে গোপাল। দরজার সামনে এসে একান্ত আহ্বানের সুরে ডাকে, মিলি!

মিলির হাসি থামে না।

কেমন যেন সন্দেহ ঘনায় গোপালের চোখে। দ্রুত পায়ে মিলির সামনে এসে দাঁড়ায় ও। উত্তেজিতভাবে চাপা চীৎকার করে ডাকে, মিলি, আমি গোপাল।

মিলি হাসতে হাসতে ফিরে তাকায়। ভাষাহীন শূন্য দৃষ্টি।

দু'হাতে ওকে টেনে তোলে গোপাল। অবশিষ্ট শক্তিকে জড়ো করে ঝাঁকি দেয় কবার।

মিলি! কি হচ্ছে মিলি? মিলি, দেখ আমি এসেছি। আমি গোপাল।

মিলি অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে গোপালের হাতের ওপর। হাসতে কষ্ট হচ্ছে ওর। তবু থামতে পারছে না।

আতঙ্কে গোপালের বুক শুকিয়ে আসে। একটা অসহ্য অনুতাপে গলাটা কেঁপে ওঠে। আচমকা পাগলের মত প্রচণ্ড শক্তিতে জড়িয়ে ধরে ও মিলিকে।

মিলি, তাকিয়ে দেখ আমি এসেছি। আমি থাকব, তোমার কাছে

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকব। ভয় নেই তোমার। মিলি, তাকিয়ে দেখ।

কিন্তু মিলির হাসির তরঙ্গে এ আশ্বাস মিথ্যে হয়ে ভেসে যায়। অসহায় ক্লান্ত গোপাল আস্তে ওকে বিছানার ওপর বসিয়ে দেয়। হঠাৎ বিছানার ওপর পড়ে থাকা চিঠিটা চোখে পড়ে। আস্তে তুলে নেয় চিঠিটা।

নিচে হরিহরের গলা শোনা যায়। মিলির হাসির শব্দ ওর ক্ষুব্ধ অভিমানকে আহত করেছে। অনুযোগ করতে করতে ওপরে উঠে আসছে হরিহর।

বেশ মেয়ে যা হোক, আমি সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে মরছি আর তুমি এখানে—

দরজার সামনে এসে থেমে পড়ে হরিহর। অবাক হয়ে মিলিব দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পর সামনে এসে সন্দেহ-কুটিল চোখে মিলিকে আর একবার তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে যেন।

মিলি ফুলে ফুলে হাসছে বিছানায় শুয়ে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় গোপাল। আবার স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে আসছে। মাথাটা শূন্য হয়ে আসছে।

অসহায় ভীত দৃষ্টিতে ওর দিকে চোখ তুলে তাকায় হরিহর, আপনি যাচ্ছেন ?

গভীর দৃষ্টিতে হারহবের দিকে তাকায় গোপাল। হরিহরের মুখে লোটনের মুখের আভাস। সেই দৃষ্টি। আচমকা একবার মনে হয় গোপালের, এই অনিবার্য ধ্বংসের পর একটি মাত্র লোকও যদি বেঁচে থাকে পৃথিবীতে, তাহলে সেই অভিশপ্ত লোকটি যেন লোটন বা হরিহর না হয়।

নিঃশব্দে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসে গোপাল। একটা তাড়িত জন্তুর মত এসে জীপে বসে। তার পর, এই অভিশপ্ত বাড়িটা থেকে পালিয়ে গিয়ে আবাব জনতার আবর্তে আত্মসমর্পণ করে।

এতক্ষণে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব মনে হয় গোপালের। সব কর্তব্য

শেষ। এখন শুধু প্রতীক্ষা। সেই অন্তিম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষায় থাকা।

জীপটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। প্রথমে সাধারণ কৌতূহল, তার পর সাংবাদিক কর্তব্য এবং সর্বশেষে মানবিক দায়িত্ব জীপটাকে অপরিহার্য করে তুলেছিল। কিন্তু সব প্রয়োজন আজ নিঃশেষিত। বাহনটাকে এবার অবান্তর বোঝা বলে মনে হচ্ছে। একটা দুর্বহ সঙ্গী।

ভীড়ের স্রোত কেটে কেটে অফিসের পথে এগোয় গোপাল।

অফিসের সামনে পৌঁছে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অফিসটার দিকে তাকিয়ে থাকে। রূপকথার অভিশপ্ত প্রাসাদের মত থমথম করছে জনশূন্য অফিসটা।

আস্তে জীপ থেকে নেমে আসে। সিঁড়িব মুখে এসে কেমন যেন ভয় ভয় করে। একটা অজ্ঞাত রহস্যপুরীতে প্রবেশ করছে যেন।

পা টেনে টেনে দোতলায় ওঠে। হলঘর শূন্য। নিঃশব্দে সম্পাদকের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় একবার। ঘর খালি। আশে-পাশের দু'চারটা ঘরে খোঁজ করে। সেখানেও নেই।

হঠাৎ মেসিনরুমের দিক থেকে একটা যান্ত্রিক শব্দ এসে চমকে দেয় ওকে। পরিবেশটাকে আরো ভৌতিক করে তোলে। গা ছমছম করে গোপালের। তবু সাহসে ভর করে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় মেসিনরুমের সিঁড়ির মুখে।

কিন্তু নিচের দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে। বিরাট দৈত্যাকৃতি নিস্পন্দ রোটারী মেসিনটার গায়ে হাত বোলাচ্ছেন সম্পাদক। যেন বিদায় মুহূর্তে সস্নেহে আদর করছেন সন্তানকে। কখনও এ সুইচ্ টিপছেন। কখনও ও সুইচ্ টিপে দেখছেন। সন্তানের সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেখছেন যেন।

ওঁর এ-মুহূর্তের এই তন্ময়তা, তৃপ্তি ভাঙ্গতে মন চাইল না গোপালের। অন্তিম মুহূর্তে যে যার কাম্য আশ্রয় খুঁজে নিক। সৃষ্টির আদিতে ফিরে মানুষ আবার একক সত্তার দ্বীপ গড়ে তুলুক।

নিঃশব্দে ফিরে আসে গোপাল। মৃত প্রিয়জনের মত কর্মকেন্দ্রের শবটাকে পিছে রেখে পথে এসে দাঁড়ায়। জনতার উত্তাল তরঙ্গে সঁপে দেয় নিজেকে।

প্রতি মুহূর্তে পথের চেহারা পাল্টাচ্ছে। এতক্ষণ পর্যন্ত যারা নিজেদের শাসনে রেখেছিল, আস্তে আস্তে তাদের ভেতরও উন্মত্ততা সংক্রামিত হচ্ছে। উদ্দেশ্যহীন ধ্বংসে মেতে উঠছে মাঝে মাঝে। অকারণ হানাহানি করছে নিজেদের ভেতর।

এর ভেতরই একবার রেডিও ঘোষণা শোনা গেল। গোলটেবিল বৈঠক থেকে সম্মিলিত অনুরোধ জানান হয়েছে আবার। নেমে আসার জন্য যে কোন সর্ত তাঁরা জানাতে পারেন। সমগ্র বিশ্ব তা মেনে নিতে প্রস্তুত। পাইলটরা কোন সর্ত জানান নি, শুধু অনুরোধ জানিয়েছেন, অবশিষ্ট সময়টুকু তাঁদের যেন আর বিরক্ত না করা হয়। বাকী মুহূর্ত ক'টি তারা শান্তিতে বিটোফেন, সেক্সপিয়র আর রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে কাটিয়ে, তার পর শেষ ধ্বংসযজ্ঞে নিজেরাও আত্মাহুতি দেবেন।

এ সংবাদে ন্যূনতম কোন প্রতিক্রিয়াও নিজের ভেতর অনুভব করল না গোপাল। চেষ্টা করেও স্নায়ুকে সজীব রাখতে পারছে না। কেমন যেন অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়ছে। আতঙ্ক বা আশ্বাস, কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারছে না ওকে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ভীড়ের ভেতর ঘুরতে থাকে ও। কেন ঘুরছে জানে না। কোন গন্তব্যস্থান খুঁজে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে আবছা-ভাবে কতগুলো মুখ শুধু স্মৃতিতে ভেসে উঠছে। মা, ইতু, মিলি, কৃষ্ণা, ভীষ্মদা, সৌমেন অথবা সেই অন্ধ ভিখারীটির মুখ। কিন্তু সে স্মৃতিও মনের ওপর কোন রেখাপাত করতে পারছে না। শ্লথ চেতনার ওপর আলতোভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে শুধু।

ক্রমশঃ একটা নিস্তল শূন্যতায় নেমে যেতে থাকে গোপাল। নিজেকে মাঝে মাঝে অশরীরী বলে মনে হতে থাকে। যেন জাগতিক সব অনুভূতির উর্ধ্বে একটা নির্মোহ অশরীরী সত্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুন্নন।

একটা দূরাগত স্বরের মত কানে আসে ডাকটা।

শুনছেন ?

গোপাল থামে এবার। সামনের দিকে তাকায়। একটি মেয়ে ভয়ার্ত স্বরে ডাকছে ওকে।

চারপাশে এবার চোখ বুলিয়ে নেয়। একটা অল্প আলোর গলির ভেতর দাঁড়িয়ে ও। বড় রাস্তার মত ভীড় নেই, কিন্তু বেশ কিছু লোক দ্রুত পায়ে যাতায়াত করছে এদিক ওদিক। সামনের ছ'সারে বেশীর ভাগ বাড়িরই দরজা বন্ধ। খোলা দরজা ছ'একটা বাড়ির ভেতর থেকে হুল্লোড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেয়েটি একটা আধ-ভেজান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে করুণ ভয়ার্তস্বরে ডাকল আবার, শুন্নন না।

এ ডাকের গভীরে যে আকর্ষণ তা উপেক্ষা করতে পারে না গোপাল। আস্তে ওর দিকে এগিয়ে যায়।

ভেতরে আসুন।

মেয়েটির বিহ্বল ভয়ার্ত চোখের দিকে ভাল করে তাকায় এবার। একটা অসহায় আর্তি থরথর করে কাঁপছে সে চোখে। ওর অসহায়ত্ব গোপালের ভেতরও সংক্রামিত হতে থাকে। একটা আশ্রয়ের, সাময়িক বিস্মরণের প্রয়োজন বোধ করে। মেয়েটি ওর হাত ধরে ওকে ভেতরে নিয়ে যায়। মেয়েটির শীর্ণ হাত ছ'টো কাঁপছে।

উঠানের চারপাশে ঘোরানো ঘর। কোন ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কোনটার খোলা। খোলা দরজার ঘরে ঘরে মেয়ে। কেউ কাঁদছে। কেউ ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে খাটের কোণে। কেউ বা বোবা শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে আছে।

গোপাল বোঝে এবার, কোথায় এসেছে। কিন্তু কোন বিকার বোধ করে না। আকর্ষণও না।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়। ভয়ার্ত শিশুর চোখ তুলে তাকায় ওর দিকে। আস্তে বলে, আপনি থাকুন। আমার ভয় করছে। আমি কিছুতেই একা থাকতে পারছি না।

শিরা উপশিরায় সেই শিরশিরে উত্তেজনাটা আবার টের পায় গোপাল। নিজের শ্লথ চেতনাকে সংহত করে মেয়েটির চোখের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তাকায়। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার পর আস্তে আস্তে সে নিবিড় দৃষ্টি নিচে নামতে থাকে।

দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ। পীনোন্নত বক্ষ। সংহত শ্রোণী। সুঠাম জঙ্ঘা।

মেয়েটি হঠাৎ চাপা আর্তনাদ করে ওঠে। না না, আমি সেজন্য আপনাকে ডাকি নি। ও পাপ আর নয়। আর তো পেটের ভাবনা নেই। আমি শুধু একটা লোক চাচ্ছিলাম। একটা শক্ত লোক, যে আমাকে অভয় দিতে পারে।

সুঠাম জঙ্ঘা। সংহত শ্রোণী। পীনোন্নত বক্ষ। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ।

মেয়েটির চোখে চোখ রেখে আস্তে উঠে দাঁড়ায় গোপাল। লুব্ধ পদক্ষেপে ওর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

মেয়েটি দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে পাগলের মত চীৎকার করে ওঠে, না, না, না!

গোপাল হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েটির আতঙ্কিত অস্বীকারের জন্য নয়, সামনের জানলা দিয়ে পাশের ঘরে একটা অভাবিত বিস্ময়ের দিকে চোখ পড়ায়।

দরজার মুখে ছাতি মাথায় দাঁড়িয়ে নিধু ঠাকুর। গায়ে এখনও নামাবলী। চোখে সলজ্জ, বিব্রত দৃষ্টি। ঘরের বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলানো মেয়েটা অবাক চোখে পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে আছে।

নিধু ঠাকুর ছাতিটা বন্ধ করে আর একটু এগিয়ে চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কাঁপা কাঁপা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরাই তো ইয়ে, না? মানে—

মেয়েটি হঠাৎ বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। তার পর উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসে নিধু ঠাকুরের দুই পা জড়িয়ে ধরে পায়ে মাথা ঘষটাতে লাগল।

হ্যাঁ ঠাকুর, আমরা পতিতা। আজীবন পাপের ভেতর ডুবে ছিলাম ঠাকুর। আশীর্বাদ করুন যেন মৃত্যুর পর ভগবান ক্ষমা করেন। পায়ে ঠাঁই দেন।

পুরোহিত সামান্য চমকে উঠলেন। কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। কিন্তু সামলে নিয়ে উদার হস্তে ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, সেজন্যই তো এসেছিলাম মা। তোমাদের কথা ভেবেই তো আর ঘরে থাকতে পারলাম না। কোন ভয় নেই। পাপীতাপীদেরই ঠাকুর আগে পায়ে ঠাঁই দেন।

মেয়েটিকে অভয় দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন নিধু ঠাকুর। কিন্তু এবার আর ছাতাটা খুললেন না। বোধ হয় স্বপরিচয়ে ফিরে গেলেন বলেই আড়ালের দরকার হল না।

স্বপরিচয়ে! গোপাল আস্তে আস্তে আবার নিজের চেতনায় ফিরে আসে। জীবন প্রসঙ্গে আমারও তো কিছু সংস্কার ছিল, বিশ্বাস ছিল। যা আমার নিজস্ব পরিচয়। শেষ মুহূর্তে সে বিশ্বাসচ্যুত হয়ে আমি কি কোন ধ্রুব আশ্রয় পাব? যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত কিছু না ঘটে, তাহলে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ দিন আমি কোন্ পরিচয়ে বাঁচব?

মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও স্বপরিচয়চ্যুত হতে চায়নি এমন কিছু আবছা মুখ ইতিহাসের পাতা থেকে ওর স্মৃতির সামনে এসে দাঁড়ায়।

গোপাল মেয়েটির দিকে ফিরে তাকায়। পাছে আবার সময়ের শিকার হয়ে বসে সেই আতঙ্কে দৃষ্টি ওর চোখেই আবদ্ধ রাখে। তার পর, একটা দুর্জয় ভয়ের সামনে থেকে পালিয়ে যাবার মত দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। রাস্তার ভীড়ে মিশে যায় আবার।

অনেকক্ষণ পর আবার যেন কিছুটা গুছিয়ে চিন্তা করতে পারছে।

অবশ্য একটা দুরূহ অঙ্কের মত স্নায়ুকে সংহত করতে হচ্ছে সেজন্য। তবু পারছে।

ক্লান্ত লাগছে। আর পথে পথে ঘুরে কি হবে? অনিয়ন্ত্রিত সময়ের শিকার হয়ে যন্ত্রণা বাড়ানো ছাড়া? নিয়তির হাতে অসহায় পুতুল হয়ে ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া? বরং যা হবার তাই হোক—।

যা হবার তাই হোক! যা হবার তাই হোক! কোথায়? কোথায় যেন কথাটা শুনেছে না?

গোপাল স্মৃতি হাতড়ায়। সময়ের শিকার হবার হাত থেকে পালানোর একটা সহজ পথ পেয়ে যায় যেন হঠাৎ। স্মৃতির আড়ালে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে ও।

যা হবার তাই হোক / ঘুচে যাক সর্ব শোক / সর্ব মরীচিকা /

তার পর? তার পর?

নিবে যাক চিরদিন / পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ / মর্ত জন্মশিখা।

মনে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের। জীবনের এমন কি কোন মুহূর্ত নেই, যে মুহূর্তে ও বুড়োর শরণাপন্ন হয়ে বিফল হতে হয়!

সব তর্ক হোক শেষ / সব রাগ, সব দ্বেষ / সকল বালাই / বল শান্তি, বল শান্তি, / দেহ সাথে সব ক্লান্তি / পুড়ে হোক ছাই।

ভীড়কে ভয় করছে এখন। ভীড়ের উন্মত্ত কোলাহলের, উচ্ছৃঙ্খলতার, কেমন যেন একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। আস্তে আস্তে বশীভূত করে ফেলে অন্যকে। নিজের স্রোতে টেনে নেয়। উদ্দাম স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে চলে।

কিন্তু এখন বাড়ি ফেরা প্রয়োজন। ক্লান্ত লাগছে। নিরাশ্রয় মনে হচ্ছে নিজেকে।

সামনে একটা ফাঁকা গলি পেয়ে ঢুকে যায় গোপাল। দূরাগত স্রোতের গর্জন ভেসে আসছে, কিন্তু স্রোত নেই এখানে।

গোপাল পা টেনে টেনে সামনের দিকে এগোতে থাকে। এলোমেলো অজস্র চিন্তার হাত থেকে বাঁচবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে

বাড়ির পথে এগোয়।

দূর থেকে একটা বেহালার সুর ভেসে আসছিল। এতক্ষণ গোপালের অন্যমনস্কতার ওপর দিয়ে আলতো ভাবে গড়িয়ে যাচ্ছিল সুরটা। একটা বাঁক নিতে প্রায় সামনাসামনি হয়ে গেল সুরের উৎসের।

একটা ন্যাড়া গাছের তলে বসে নিজের মনে বেহালা বাজাচ্ছে একটা লোক। গোপালের পায়ের শব্দে থামল লোকটা। মণিহীন চোখ দু'টো তুলে জিজ্ঞেস করল, এখন ক'টা বাজে বাবু?

অভ্যেস বশে ঘড়ি দেখতে যায় গোপাল। কিন্তু শূন্য কব্জির দিকে চোখ পড়ায় হঠাৎ থমকে যায়। কৃষ্ণার কথা মনে পড়ে ওর।

অন্ধ বাদকের দিকে ফিরে বলে, ঠিক বলতে পারছি না, ঘড়ি নেই। কেন, ভয় করছে?

তৃপ্ত হাসিতে ভরে যায় লোকটার মুখ। এ কি ভয়ের সুর বাবু?

ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সৌমেনের কথা মনে পড়ে গোপালের। সেই অনুষঙ্গে ইতু, মিলি। চিন্তাগুলো আবার জট পাকাতে শুরু করে। স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে আসে। মাথাটা শূন্য হয়ে আসতে থাকে। দ্রুত বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করে ও। তার পর অনেকক্ষণ হেঁটে শেষ পর্যন্ত পাড়ায় এসে পেঁছায়। একটা তাড়িত জন্তুর মত হন হন করে বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়ে। চেনা গলিটায় পড়ে দ্বিগুণ ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসে এবার শরীর। পাগুলো ভারী হয়ে আসে।

মিঠুদের বাড়ির সামনে একটা থমথমে ভীড়। চেনা লোকজন। থেমে পড়ে গোপাল। একটা বোবা আতঙ্কে মনটা কেঁপে ওঠে একবার। তার পর পা টেনে টেনে এগিয়ে যায় সেদিকে। ভীড় সরিয়ে সরিয়ে দরজার সামনে এসে পেঁছায়। এবং, সেখানেই দু'হাতে দরজার কপাট দু'টো ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে ও।

বিছানার ওপর অটুট আলিঙ্গনে পরস্পরকে জড়িয়ে তিনটি নিঃস্পন্দ দেহ। মাঝখানে মিঠু, দু'পাশে ওর মা, বাবা। মিঠুর বাবার হাতের মুঠে ছোট্ট একটা শিশি।

৷. মাথাটা ঘুরতে থাকে গোপালের। আবার অবচেতনায় তলিয়ে যেতে থাকে। বিস্ময় না, শোক না, সহানুভূতি না—অনুভূতিশূন্য দৃষ্টিতে মিঠুর সোহাগী মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে গোপাল। তার পর নিঃশব্দে পা টেনে টেনে ভীড় থেকে বেড়িয়ে আসে। সামান্য টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। নির্জন সিঁড়ি বেরে বেয়ে দোতলায় উঠে আসে।

বাবা ফেরেন নি। মা পূজোর ঘরে। ইতু কি ফেরে নি এখনও? ইতু কি ফিরবে না আর?

ইতুর জন্য মমতা বোধ করে ও। ছেলেবেলার সেই গভীর স্নেহ। বাস্তব জীবনে অনভ্যস্ত অসহায় বোনটিকে এই চরম দুর্যোগের দিনে ও রক্ষা করতে পারল না বলে নিজেকেই অপরাধী মনে হয়।

বেলিং ধরে ধরে ছাদে উঠে আসে। ইতুর ঘর অন্ধকার। দবজাটা আধা ভেজান।

দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকায় গোপাল। পাশের বাড়ির এক ফালি আলো এসে পড়েছে ঘরে। ইতু কী এক অস্বস্তিতে যেন ছটফট করছে বিছানায়।

ইতু ফিরেছে! উত্তেজনায় দরজাটা ঠেলে ভেতবে ঢোকে গোপাল। আবেগে চাপা চীৎকার করে ওঠে, ইতু!

ইতু চমকে ফিরে তাকায়। আস্তে উঠে বসে বিছানার ওপর! একটা দুর্বোধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওব দিকে। তীক্ষ্ণ তীব্র গভীর সন্ধানী দৃষ্টি। কী এক অজানা অস্থিরতায়, যন্ত্রণায় তিরতির করে কাঁপছে সে দৃষ্টি?

গোপাল দ্রুত পায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। সস্নেহে ইতুর মাথায় হাত রাখে।

বোকা মেয়ে!

ইতু হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে গোপালের বুকের ওপর। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গোপালকে। টাল সামলাতে না পেরে বিছানার ওপর বসে পড়ে

গোপাল। অনুতপ্ত বোনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। সেই শৈশবের গভীর আকর্ষণে ফিরে যায় যেন। উত্তাল সমুদ্র-ঝড়ের ভেতর যেন এত-ক্ষণে একটা ক্ষুদ্র আশ্রয়ের দ্বীপ পেয়েছে।

ইতু অস্থির ভাবে মাথা ঘষটাতে থাকে গোপালের বুকে। দৃঢ়তর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে গোপালকে। গোপাল ওকে ঝাঁকি দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে।

এই ইতু, এত ভেঙ্গে পড়ছিস কেন? মন শক্ত কর। এত—

গোপালের কথা শেষ হবার আগেই অপ্রত্যাশিত আবেগে ইতু আচমকা গোপালের ঠোঁট দু'টো কামড়ে ধরে। ওর উদ্‌ভ্রান্ত পিপাসার্ত ঠোঁট দু'টো গোপালের মুখময় অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে।

মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়ে গোপাল। পুরো চেতনা দিয়ে যেন উপলব্ধি করে উঠতে পারে না ইতুর এ অস্থিরতার স্বরূপ।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। তার পরই ও আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে, ই-তু!

দু'হাতে ছুঁড়ে সরিয়ে দেয় ও ইতুকে। একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় যেন আচমকা গভীর বিস্মৃতি থেকে উঠে আসে ইতু। স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে গোপালের দিকে তাকিয়ে। আস্তে আস্তে করুণ বেদনার্ত হয়ে আসে দৃষ্টি। ঠোঁট দু'টো থরথর করে কেঁপে ওঠে। তার পর, হঠাৎ ঝটকা মেরে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

গোপালও দ্রুত ছুটে আসে। কার্নিশের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে ইতু। প্রচণ্ড আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে গোপাল, ইতু শোন!

ইতু কার্ণিশের কাছে পৌঁছে গেছে। সমস্ত শক্তি সংহত করে ইতুকে ধরবার জন্য ছুটে যায় গোপাল। ইতু নিচে ঝাপিয়ে পড়ার মুহূর্তে ওকে জাপটে ধরে টেনে নিয়ে আসে। গোপালের হাতের ভেতরই মূর্ছিত হয়ে পড়ে ইতু।

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে তখন গোপাল। আস্তে ইতুর ওপর ঝুঁকে পড়ল ও। মুখের ওপর থেকে এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে

গভীর সহানুভূতিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তার পর সন্তর্পণে ওকে তুলে নিয়ে নিচে নেমে এল। নিজের ঘরে এনে শুইয়ে দিল ওকে।

ইতুর শিয়রে বসে অপলক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে গোপাল। আস্তে আস্তে ইতুর মুখের দর্পণে গোটা বিপর্যস্ত দিনটা ভেসে উঠতে থাকে। মানুষের সেই আতঙ্ক, অসহায়ত্ব, যন্ত্রণাগুলো। লোভ, রিরংসা, জিঘাংসাগুলো। সৃষ্টির আদিতে ফিরে যাওয়া মানুষের বীভৎস মুখগুলো।

মানুষের যুগব্যাপী সাধনালব্ধ সংস্কৃতি সভ্যতার তাহলে এই-ই আসল চেহারা? মুক্তি আকাঙ্খী মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার এইই ফলশ্রুতি? এতদিন তাহলে আমরা মিথ্যে স্বপ্ন দেখেছি? এই জন্মকে মিথ্যে গর্বে পরম প্রাপ্তি ভেবেছি? অমৃতের তৃপ্তি নিয়ে গরল পান করেছি?

অমৃতস্য পুত্রাঃ! অপরাজেয় জীবন! অথচ মানুষ কী ভীষণ অক্ষম। আজ সারাদিন কী অসহায় দৃষ্টি মেলে ঘনিষ্ঠতম প্রিয়জন, জীবনের তিল তিল মৃত্যু দেখতে হল।

পাশের বাড়ির রেডিওটা কি যেন ঘোষণা শুরু করে। গোপাল টলতে টলতে উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দেয়। মিথ্যে আশ্বাসে আর আগ্রহ নেই। বাইরের আদিম পৃথিবী প্রসঙ্গে আর কোন মোহ নেই। আকর্ষণ নেই।

ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছে। সমস্ত স্নায়ুগুলো বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

ইতুর শিয়রে এসে শুয়ে পড়ে গোপাল। আস্তে আস্তে গভীর আচ্ছন্নতায় তলিয়ে যেতে শুরু করে। অবলুপ্ত চেতনায় তলিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে ও শেষ প্রার্থনা জানিয়ে যায়, ঈশ্বর, যদি সত্যিই তুমি থাক, তাহলে এই অসহ্য যন্ত্রণার চেয়ে সেই অন্তিম মুহূর্তকে ত্বরান্বিত কর। সেই অনিবার্য অন্তিম ত্বরান্বিত হোক।



অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গে গোপালের। সমস্ত চেতনায় এখনও ক্লান্তি জড়ানো। ভাল করে চোখ মেলতে পারছে না। নিজের বাস্তব অস্তিত্বটাকেও যেন পুরো উপলব্ধি করতে পারছে না।

আস্তে আস্তে ভাল করে চোখ মেলে একসময়। চারপাশে চোখ বুলায়। সেই টেবিল, চেয়ার, আলনা। দেওয়ালের ক্যালেণ্ডার। জানলায় দূরের নীল আকাশ।

গতকালের তারিখটা কাটা নেই। তারিখটা কে কেটেছিল তাহলে? কৃষ্ণা? ইতু?

তাড়াতাড়ি উঠে বসে গোপাল। ইতু কোথায়?

বাইরে এসে মা'র ঘর দেখে। ইতু নেই। ছাদের সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে পুজোর ঘরের দিকে চোখ পড়ে। ভেতরে বিগ্রহের সামনে চোখ বুজে তন্ময় হয়ে বসে আছেন মা আর ইতু।

রেলিং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় গোপাল। চারধার নিস্তব্ধ। প্রশান্ত স্নিগ্ধ রোদ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। রাস্তায় লোক নেই। উন্মত্ততা নেই। নিঃশব্দ। নিস্পন্দ। যেন গত রাতে প্রচণ্ড একটা সমুদ্র-ঝড়ে

বিপর্যস্ত পৃথিবী নৈঃশব্দের একটা দ্বীপে এসে আশ্রয় পেয়েছে আজ সকালে।

শেষ সকাল! কালও রোজের নিয়মে সূর্য উঠবে। রাত্রে চাদ; অগুন্তি মায়াবী তারা। কিন্তু দেখবার কেউ থাকবে না। অনর্থক রোদ, নিরর্থক জ্যোৎস্না পৃথিবীর ধ্বংসস্তুপের ওপর অভিশপ্ত বাধ্যবাধকতায় ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু তাতে স্পন্দিত হবার মত একটি প্রাণও অবশিষ্ট থাকবেনা।

যেন দীর্ঘ দিন পর এমন মমতা নিয়ে দেখছে পৃথিবীকে। অভ্যস্ত আবাসের আকর্ষণ বোধ হয় বিদায় মুহূর্ত ছাড়া সঠিক উপলব্ধি করা যায় না।

অনেক দূর থেকে একটা রেডিও সংবাদ ভেসে আসছে। অবসন্ন গম্ভীর স্বর।

ঃ আকাশচারী বন্ধুদের কাছে আমাদের সর্বশেষ অনুরোধ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। জানি না আজই আমাদের জীবনের শেষ দিন কিনা। অবশ্য গোলটেবিল বৈঠকে রাষ্ট্র প্রতিনিধিরা এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁরা এখনও আশা করছেন শেষ মুহূর্তে আকাশচারী বন্ধুরা তাঁদের চেতনা ফিরে পাবেন। এই আত্মঘাতী পথ থেকে ফিরবেন। সমগ্র পৃথিবীর মানুষও এ মুহূর্তে সেই অন্তিম আশ্বাস নিয়েই প্রহর গুনছে। ঈশ্বর করুন যেন তাই হয়।

গোপালের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। আশ্বাস আর প্রার্থনা! এ ছাড়া অসহায় মানুষের হাতে আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই। শক্তির দম্ভে একদিন মানুষ যে দৈত্য সৃষ্টি করেছিল আজ সেই তার সব শক্তি নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছে। মস্তিষ্ক চর্চায় অমিত শক্তিশালী যে মানুষ নিয়তিকেও নিয়ন্ত্রণের গর্বে একদিন স্ফীত ছিল, আজ সে নিয়তির কাছে করুণ করুণাপ্রার্থী। কিন্তু কার দোষে? কার পাপে?

আস্তে আস্তে বাড়ির বাইরে আসে ও। শেষ বিদায়ের আগে প্রিয় পৃথিবীটাকে একবার শেষবারের মত দেখে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে। তুই

চোখ ভরে পরিচিত পৃথিবীকে একবার নতুন করে দেখে নেবে। তার পর, অন্তিম মুহূর্তে মা'র কাছে এসে শেষ আশ্রয় নেবার আগে, পৃথিবীকে ওর শেষ সম্ভাষণ জানিয়ে আসবে—হে উদাসীন পৃথিবী/আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে / তোমার নির্মম পদপ্রান্তে / আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।'

সমস্ত শহরের রূপ বদলে গেছে। থমথম করছে পথঘাট। কোন উদ্দামতা নেই, উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। একই আতঙ্কে গায়ে গায়ে মিশে জমাট বেধে আছে সব। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। নিস্তব্ধ। নির্বাক। শুধু মাঝে মাঝে অসহায় করুণ কান্নায় হাহাকার করে উঠছে মানুষ।

আজ আর মৃত্যুর ছায়া নয়, মৃত্যুর বিকট মুখবিকৃতির মুখোমুখি মানুষ। এ দু'দিন অবদমিত সমস্ত বৃত্তির চূড়ান্ত ব্যবহারে ক্লান্ত মানুষ, আজ অনুভূতির গভীরে আসন্ন অন্তিমের মর্মার্থ অনুভব করতে পেরেছে। বিমূঢ় আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে তাই। অস্তিত্ব অবশ হয়ে গেছে।

পথ আজ জনশূন্য। কোন বাধা নেই। বিরক্তি নেই। উত্তেজনা নেই। বহুদিন আগে একদিন গভীর রাত্রে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল গোপালের। সেই রাতটার কথা মনে পড়ে।

পার্ক জনশূন্য। দোলনাগুলো নিষ্কম্প। ঘাসের শীর্ষে অদমিত শিশিরগুলো চিকচিক করছে। গাছের ডালে ডালে চঞ্চল পাখিগুলো খুশীর জানানি দিচ্ছে।

পাখিরা, পশুরা,—মস্তিষ্কের সুযোগে একদিন যে সহযাত্রীদের মানুষ অনেক পিছে ফেলে আজের অজেয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল—আজ সেই অনুকম্পার পাখিরা, পশুরা, মানুষের চেয়ে অনেক সুখী। অনেক তৃপ্ত। মানুষের মত যন্ত্রণার আগুনে তিল তিল করে দগ্ধে মরছে না ওরা। মৃত্যু ওদের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিশ্চিন্ত সুখের সুযোগ দিয়ে আচমকা নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

অদ্ভুত ভাল লাগছে গোপালের। একটা অনাস্বাদিত প্রশান্তিতে মন ছেয়ে আছে। কোন গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নয়, সচেতন প্রচেষ্টা নয়,

ও নিজেও জানে না কেন, কিন্তু আজ নিজেকে অনেক নির্ভয় মনে হচ্ছে। মুক্ত মনে হচ্ছে। সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। সবকিছুতে ভালবাসার স্পর্শ পাচ্ছে।

জীবনের ওপর কোনদিনই কোন ক্ষোভ নেই ওর। কোন অভিযোগ নেই। বোধ হয় জীবনের ওপর দাবীটাই কম ছিল বলে। তবু আজ নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ছে মাঝে মাঝেঃ যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই / যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।

দূরাগত একটা সমুদ্র-শব্দের রেশ ভেসে আসছিল যেন কিছুক্ষণ থেকে। এতক্ষণ শব্দটা অন্যমনস্কতায় জড়িয়ে থাকায় ঠিক খেয়াল করে নি গোপাল। এবার কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। মনে পড়ে, গোল-টেবিল বৈঠকের জায়গাটা এখান থেকে দূরে নয়। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, একটা অজানা আকর্ষণেই সেদিকে এগোয় গোপাল।

তার পর সেই বিশাল জনসমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়ায়। চারদিকে থইথই করছে মানুষ। আতঙ্কে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। সতর্ক শক্তির প্রহরাধীনে ভেতরে সর্বশেষ বৈঠক চলছে। চরম গুরুত্ব-পূর্ণ কী একটি সিদ্ধান্ত নাকি গৃহীত হতে যাচ্ছে।

জনতার শীর্ষে পার্থকে চোখে পড়ে গোপালের। সঙ্গে পোড় খাওয়া অদম্য একদল শ্রমজীবি যুবক। দেশ বিদেশের সেই তরুণ প্রতিনিধিরা। দু'হাতে ব্যাঞ্জোটি ওপরে তুলে ধরে সেই নিগ্রো গায়কটি। এবং, সম্পূর্ণ নতুন এর পরিচয়ে পিনাকী চৌধুরী! চীৎকার করে এই জন সমুদ্রের দাবীর—জনতাকে পথ ছেড়ে দেওয়া হোক, পৃথিবীর সাধারণ মানুষের তরফ থেকে ওদের বলতে দেওয়া হোক—প্রতিনিধিত্ব করছে ওরা।

এই বিশাল জনসমুদ্রের ভেতর দাঁড়িয়ে, জীবনের সান্নিধ্যে, মানুষের উত্তাপে, গোপাল নিজের ভেতর একটা সম্যক পরিবর্তন অনুভব করে। রক্তে ঋজু প্রতিরোধের স্পৃহা সঞ্চারিত হতে থাকে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যে প্রতিরোধ-চেতনা মানুষের সহজাত বৃত্তি। আস্তে

ভীড় সরিয়ে সরিয়ে সামনের দিকে এগোয় গোপাল।

হঠাৎ লনের ওপার থেকে এ্যাম্‌প্লিফায়ার সরব হয়ে ওঠে। সমুদ্র গর্জন শান্ত হয়ে আসে। ধীর গম্ভীর স্বরে ঘোষণা শুরু হয়।

ঃ জনতাকে শান্ত হবার জন্য অনুরোধ জানান যাচ্ছে। ভেতরে এই গুরুত্বপূর্ণ সর্বরাষ্ট্রীয় অধিবেশনে যারা অংশ গ্রহণ করছেন তাঁরাও তাঁদের জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। জনতাকে তাঁদের প্রতিনিধিদের ওপর আস্থা রাখবার জন্য অনুরোধ জানান যাচ্ছে। -

চাপা গুঞ্জন শুরু হয় জনতার ভেতর। বোঝা যায়, সব প্রতিনিধি প্রসঙ্গে জনতা এ দাবী মানতে রাজী নয়। তাছাড়া এই অন্তিম মুহূর্তে চিরদিনের রাজনৈতিক ভাঁওতায় আর নিষ্ক্রিয় থাকতে প্রস্তুত নয় তারা। প্রতিনিধি মারফৎ নয়, সরাসরি পাইলটদের সঙ্গে একবার শেষ মুখোমুখি হতে চায় ওরা।

ভেতরে সতর্ক সশস্ত্র প্রহরী। রুদ্ধ লোহার গেটের ওপারে উদ্যত সজাগ সঙ্গীন।

পার্থরা আবার চীৎকার করে ওঠে, আমাদের পথ ছেড়ে দেওয়া হোক। সরাসরি বলতে দেওয়া হোক। আমরা জানি, কোন কোন রাষ্ট্র সুদূর প্রসারী ফলাফলের কথা চিন্তা করে জনসাধারণকে সরাসরি বলতে দিতে রাজী নয়। তাঁরাই আজ আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন? তাঁদের হাতে কেন আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেব? কোন বিশ্বাসে প্রতীক্ষা করব? অন্তত একবার, একবার আমাদের ওঁদের মুখোমুখি দাঁড়াতে দিন। শেষ চেষ্টা করে দেখতে দিন।

আবার নতুন ঘোষণা শুরু হল। এবার বৈঠকের প্রতিনিধি হিসেবে একজন গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করলেন।

ঃ বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আছে। আমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের কথা আপনাদের জানানোর দায়িত্ব নিয়ে আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। সমগ্র মানব জাতির দুর্ভাগ্য, পাইলট বন্ধুদের কাছে আমাদের সর্বশেষ অনুরোধ পর্যন্ত উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এত বড়

চ্যালেঞ্জের সামনে নিষ্ক্রিয় মৃত্যু বরণ অকল্পনীয়। সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা, সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিরা, শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওঁদের প্রতি কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। জনসাধারণের নিরাপত্তাই সর্বাগ্রে বিবেচিত বলে এই সিদ্ধান্তের বিবরণ আপনাদের জানানো কর্তব্য বলে মনে করছি আমরা। আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি, পাইলটদের ধ্বংস ছাড়া পৃথিবীর পরিত্রাণের অন্য কোন পথ নেই।

বক্তা থামলেন। রুদ্ধশ্বাস জনসমুদ্র নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছে। বক্তা গম্ভীর স্বরে আবার শুরু করলেন।

ঃ অবশ্য এর সম্ভাব্য বিপদ প্রসঙ্গেও আমরা সচেতন ছিলাম। নতুন আবিষ্কৃত যে মারণাস্ত্র ওঁদের সঙ্গে আছে তা এখনও পরীক্ষিত নয়। এমনও হতে পারে, ওঁদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সে অস্ত্র পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ওঁদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করবে। কিন্তু আজ, এ মুহূর্তে, কোন বিকল্প উপায় না থাকায় সে ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। অবশ্য প্রশ্ন উঠেছিল, যদি এমন হয় যে, ওঁদের ধ্বংসের ফলে অস্ত্রটি ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে যে দেশের ওপর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে শুধু সেই অঞ্চলের ওপরই প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকবে, সে ক্ষেত্রে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য হলেও, পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলকে আমরা উৎসর্গ করব। অস্বীকার করে লাভ নেই, পৃথিবীর ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, এবং পরস্পর বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ভেতর এই প্রশ্নে তীব্র মতভেদ সমস্যাটিকে জটিল করে তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটাধিক্যে স্থির করা হয়েছে, পাইলটদের ঘোষিত অন্তিম মুহূর্তের ঠিক পনের মিনিট আগে প্লেনটিকে ধ্বংস করা হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্লেনটি যে অঞ্চলের ওপর থাকবে, সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের কথা চিন্তা করে, তাদেরই আত্মোৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

আচমকা তীব্র উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠল পার্থরা।

পৃথিবীর একটি মানুষকেও নিহত হতে দেব না আমরা। হয় একসঙ্গে

মরব, নয় একসঙ্গে বাঁচব।

আমাদের শেষ চেষ্টা করতে দেওয়া হোক।

আমরা সরাসরি বলতে চাই।

জনতা উদ্দাম হয়ে ওঠে। দুর্বার দাবীর সমুদ্র-গর্জনে, জনতার চাপে, রুদ্ধ দরজার লোহার গরাদগুলো ঝনঝন করে কেঁপে ওঠে।

পথ ছাড়, আমাকে পথ ছেড়ে দাও, আমাকে বলতে দাও।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ তীব্র এক নারী কণ্ঠের চীৎকারে থমকে পেছন ফিরে তাকায় জনতা।

নবজাত একটি শিশুকে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরে পাগলের মত ছুটে আসছে এক তরুণী মা। আঁচল ধূলোয় লুটাচ্ছে। চুলগুলো এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে। উত্তেজনায় আবেগে ফেটে পড়ছে চোখ মুখ।

মুহূর্তে চিনতে পারে গোপাল। সুব্রতদার স্ত্রী। হাতের মুঠে তাঁর সদ্যজাত প্রথম সন্তান।

হতচকিত জনতা সরে সরে পথ করে দিচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে আসছে তরুণী মা। ছুটতে ছুটতে গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। তার পর ওপারের উদ্যত বেয়নেটের মুখে সদ্যজাত শিশুটিকে তুলে ধরে আকুলকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে, অন্তত এই শিশুর দিকে তাকিয়ে পথ ছেড়ে দাও। এ কি অন্যায করেছে? কার অপরাধে মরবে ও? ওগো, আমাকে একবার পথ ছেড়ে দাও। আমি নিজে কিছু বলব না। একবার, শুধু একবার এই শিশুর কণ্ঠস্বর আমি ওদের কানে পৌঁছে দিতে চাই।

এই নাটকীয় ঘটনায় হঠাৎ থমকে গিয়েছিল সবাই। দ্বিগুণ উত্তেজনায় এবার ফেটে পড়ল জনতা।

সংঘবদ্ধ মানুষের উত্তাপে গোপাল নতুন করে সঞ্জীবিত হচ্ছিল। এবার শিশুটির দিকে তাকিয়ে অক্ষুণ্ণ অপরাজেয় জীবনসত্তা ওকে উদ্দীপ্ত করে তোলে আবার। প্রতিরোধের একটা তীব্র জেদ ওকে ভীড় ঠেলে ঠেলে জনতার শীর্ষে এগিয়ে দেয়।

দুর্বার বেগে এবার গেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জনতা। ঝনঝন করে কেঁপে ওঠে লোহার গেট। সঙ্গে সঙ্গে মাইকে ঘোষণা শোনা যায়ঃ দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে। জনসাধারণের তরফ থেকে পাইলটদের কাছে সরাসরি শেষ অনুরোধ জানাতে দেওয়া হবে বলে অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জনসাধারণকে সংযত থাকার জন্য অনুরোধ জানান হচ্ছে।

দরজা খুলে দেওয়া হল। দৃপ্ত পদক্ষেপে জনতা এগিয়ে গেল অধিবেশন-প্রাসাদের দিকে। জনতার শীর্ষে পার্থরা।

বিরাট হলঘরের মাঝখানে বিরাটাকৃতি একটি টেবিল। টেবিলের ওপর রাশীকৃত এলোমেলো কাগজপত্র, ফাইলের স্তূপ। অসফল অধিবেশনের ফসল! সংবাদ আদান প্রদানের কয়েকটি যন্ত্র। টেবিলের এক কোণে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র প্রতিনিধিরা। শ্রান্ত, ক্লান্ত, আতঙ্কিত।

বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মত জনতায় ভরে গেল ঘরটা। উত্তেজিত, কিন্তু সংযত জনতা। সংহত একটা ঋজু শক্তির প্রতীক যেন। দৃঢ় ধীর পদক্ষেপে যন্ত্রের সামনে এসে দাঁড়াল পার্থরা। সমগ্র বিশ্বের তারুণ্যের প্রতিনিধিরা। তাদের পাশে শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে সেই মা।

পার্থ আস্তে মা'র হাত থেকে শিশুটিকে নিজের হাতে তুলে নিল। সন্তর্পণে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিল। তার পর গম্ভীর মন্ত্রোশ্চারণের মত বলতে শুরু করল।

আমাদের বৈমানিক বন্ধুগণ! আমার সবাঙ্গে একটি সদ্যজাত শিশুর উত্তাপ নিয়ে আমি আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কোন রাষ্ট্রের তরফ থেকে নয়। কোন বিশেষ শক্তি জোটের পক্ষ থেকে নয়। সমস্ত পৃথিবীর সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে। এই সদ্যজাত শিশুটির নিষ্পাপ মুখ আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য করছে, আপনাদের পথ আত্মহত্যার পথ।

সামান্য থামে পার্থ। অটুট নৈস্তব্ধে প্রতীক্ষা করছে জনতা। অন্তিম মুহূর্তের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে দেওয়াল ঘড়ির কাঁটাটা।

পার্থ শুরু করে আবার। যদি সত্যিই জীবনকে, শান্তিকে, নিরুদ্বেগ স্বপ্নের ভবিষ্যৎকে ভালবেসে থাকেন, তাহলে নেমে আস্থন। জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়ান। আমরাও সুন্দর শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য লড়ছি ; লড়ব ; মরব। তার পর, এ বিশ্বাসে আমরা অটল, একদিন না একদিন যুদ্ধোন্মাদদের হাত থেকে সেই আকাঙ্খিত চির শান্তির পৃথিবী আমরা ছিনিয়ে আনবই। আমাদের শেষ অনুরোধ সেই ভবিষ্যৎ থেকে আপনারা মানুষকে বঞ্চিত করবেন না।

প্রচণ্ড উত্তেজনা, উৎকণ্ঠায় পাথরের মত জমাট বেঁধে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে জনতা। আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকী। কিন্তু কোন জবাব নেই। কঙ্কালের হাতের মত ঘড়ির কাটা মিনিটের ঘর বেয়ে বেয়ে অন্তিম মুহূর্তের দিকে এগোচ্ছে। এক এক মিনিট যেন এক একটা যুগ।

টেবিলের যন্ত্রে পাইলটদের একজনের স্বর ভেসে উঠল।

ঃ জনসাধারণের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের সিদ্ধান্তে আমরা স্থির থাকতে চাই। এই উদ্‌ভ্রান্ত অস্ত্র প্রতিযোগিতার শেষ অধ্যায়ে পারমাণবিক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আপনারা রোধ করতে পারবেন না। সে শক্তি যদি আপনাদের থাকত তাহলে পরোক্ষে অর্থ দিয়ে, সামর্থ দিযে এই মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতায় শক্তি যোগাতে হত না আপনাদের। সেই পারমাণবিক ভয়াবহ মৃত্যু বা যন্ত্রণার চেয়ে এই যন্ত্রণাহীন বিলুপ্তি অনেক বেশী শান্তির হবে।

রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে নিঃশব্দে শুনছিল জনতা তার শেষ মৃত্যু পরোয়ানা। হঠাৎ পাগলের মত পার্থর কোল থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে চীৎকার করে উঠে মা, থা-মো! তোমাদের মৃত্যুর দাক্ষিণ্য থেকে আমাদের মুক্তি দাও।

তার পর হঠাৎ স্বর নামিয়ে, শিশুটিকে দু'হাতে যন্ত্রের সামনে তুলে ধরে আবেগে ভেঙ্গে পড়ে।

তোমরাও তো মায়েরই সন্তান। আমার এই সদ্যজাত শিশুটির দিকে একবার তাকাও। নিষ্পাপ, নির্বোধ, নিরপরাধ। এ কেন

মরবে ? একবার ভেবে দেখ, কাদের অপরাধে এদের হত্যায় তোমরা উদ্যত হয়েছ। আমাদের মেরে ফেল, কোন ক্ষোভ নেই। কিন্তু এদের বাঁচতে দাও! এদের ভবিষ্যৎ এদেরই বুঝে নিতে দাও। তোমাদের শৈশবের সেই মায়ের মুখ মনে করিয়ে দিয়ে, আমি মা, তোমাদের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তোমরা বিরত হও।

সমস্ত ঘর উত্তেজনায় থমথম করছে। নিঃসীম নৈঃশব্দের ভেতর শুধু ঘড়ির হৃদপিণ্ডের চঞ্চল শব্দটা শোনা যাচ্ছে। অন্তিম মুহূর্তের ছায়ায় পৌঁছে গেছে ঘড়ির কাঁটাটা।

টেবিলের যন্ত্রটা সরব হল।

: আমাদের একটু ভাবতে দিন।

উৎকণ্ঠায় সংহত জনতা যেন অন্তহীন প্রতীক্ষায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে।

পাইলটের গম্ভীর স্বর ভেসে ওঠে আবার।

: রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সামনে আসতে বলুন।

শ্রান্ত প্রতিনিধিরা চাপা অস্বস্তির সঙ্গে পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে আসেন।

: সদ্যজাত শিশুটির দিকে তাকিয়ে এবং জনসাধারণের অনুরোধে আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা পুনর্বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কয়েকটি সর্তে।

প্রথম সর্ত, এখন থেকে তিন ঘণ্টার ভেতর পারমাণবিক অস্ত্রসহ পৃথিবীর যেখানে যত মারণাস্ত্র আছে তা ধ্বংস করতে হবে।

দ্বিতীয় সর্ত, প্রতিটি রাষ্ট্রের পরিমিত শান্তি-প্রহরী বাদে সমস্ত সামরিক ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে হবে।

তৃতীয় এবং শেষ সর্ত, আমাদের হাতে যে মারণাস্ত্রটি আছে তা জনসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে তাদের নির্বাচিত একটি অছি পরিষদের জিম্বায় থাকবে। সে অছি পরিষদের সদস্যা থাকবেন বিশ্বের সর্বরাষ্ট্রীয় মায়েরা। ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্র যাতে আর যুদ্ধের দুঃস্বপ্ন না দেখতে

পারে তার রক্ষা-কবচ হিসেবে।

ভেবে দেখুন, আপনারা রাজী কিনা ?

চাপা উল্লাসে গুঞ্জন করে ওঠে জনতা। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের ভেতর স্বস্তি এবং অস্বস্তির মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কয়েকজন প্রতিনিধির মুখ খুশীতে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু কয়েকজন প্রতিনিধির মুখ পাংশু হয়ে আসে। কিন্তু জনতার উচ্ছ্বাসের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে যান তাঁরা। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সম্মিলিত সমর্থন ঘোষণা করতে হয়ঃ আমরা রাজী।

প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ে জনতা। যেন উত্তাল তরঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠেছে এতক্ষণের স্তব্ধ জীবন।

পাইলটদের সর্বশেষ ঘোষণা শোনা যায়।

ঃ আমরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। আমরা নামব।

বিজয়োল্লাসে চীৎকার করে ওঠে এতক্ষণের স্তব্ধ জনতা। রুদ্ধ আবেগ প্রকাশ-মুখ পেয়ে সমুদ্র গর্জনে মুখর হয়ে ওঠে। সেই উচ্ছ্বাসের তোড়ে রাষ্ট্র নেতাদের খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে জনতা আবার পথে নেমে আসে। আবহমান যুগ প্রবাহিত জীবনধারার অপ্রতিহত বেগে উদ্দাম জনস্রোত। সে স্রোতের শীর্ষে বলিষ্ঠ মুঠিতে উত্থিত বিজয় পতাকার মত সেই সদ্যজাত শিশুটি।

প্লেনটা নামছে। এয়ারপোর্ট থেকে নিরাপদ অবতরণের সংকেত পেয়ে ক্রমেই নিচে নেমে আসছে প্লেনটা।

আরো নিচে এসে চক্রাকারে একবার ঘুরে সোজা রান ওয়েতে নেমে এল।

ছোট্ট একটা ঝাঁকিতে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে কোনরকমে সামলে নিল গোপাল। সামান্য বিভ্রান্তের মত চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। কেমন যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে লাগছে সব।

পিছনের সিটের ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে স্মিত হেসে বললেন, আপনিই সুখী ব্যক্তি মশায়।

ইয়োর বুক প্লীজ্।

নারীকণ্ঠে ফিবে তাকায় গোপাল। পাশের সহযাত্রীনী, এতক্ষণের আরোপিত নাম যার কৃষ্ণা, ওর দিকে একটা বই এগিয়ে ধরেছে।

আপনার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।

বইটা হাত বাড়িয়ে নেয় গোপাল। বইটার নামের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। টেরর অফ্ এ্যাটম বোম।

আস্তে আস্তে ঘোরটা কেটে আসে এবার। কীটস্-এর সেই লাইনটা হঠাৎ মনে পড়ে। ডূ আই এ্যাওয়েক অর স্লিপ? আমি কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম, না, আচ্ছন্ন চেতনায় কল্পনার জাল বুনছিলাম?

সবাই নেমে যাচ্ছে। নিজের মনেই একটু হেসে উঠে দাঁড়ায় গোপাল। পোষাকের বিন্যাস হাত দিয়ে একবার ঠিকঠাক করে নেয়। তার পর সর্বশেষ যাত্রী হিসেবে প্লেন থেকে নেমে আসে।

নামতে নামতেই নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় আবার। আজ আর স্কোয়ার জার্ণালিস্ট নয়, রীতিমত স্কুপ-নিউজ শিকারী। যেমন করেই হোক, সাক্‌সেসফুল হয়ে ফিরতে হবে। এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

দৃপ্ত পদক্ষেপে রানওয়ে ধরে এগোতে থাকে গোপাল।